দরবারী

রমাপদ চৌধুরী

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
৭ই শ্রাবণ ১৩৬১

প্রথম সংস্করণ
২৫শে বৈশাখ ১৩৬১

প্রকাশক: মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ১৩
মুদ্রক: গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস লিঃ
৪৭ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ,
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট মুদ্রক: নিউ প্রাইমা প্রেস
বাঁধাই: ওরিয়েণ্ট বাইন্ডিং ওয়ার্কস
প্রচ্ছদশিল্পী: সমীর সরকার

দাম আড়াই টাকা

গল্প লেখার গল্প

গল্প আমি আদৌ লিখেছি কিনা আমার নিজের সন্দেহ আছে পুরোপুরি। যা লিখেছি সেগুলোকে অনেকেই হয়তো গল্প হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন, আর তাই—কবে, কেন, কোথায়, কি ভাবে আমি প্রথমে গল্প লিখতে সুরু করি এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

জীবনের কোন একটা বিশেষ মুহূর্ত থেকেই কি কেউ গল্প লিখতে সুরু করে? লেখার সুরু কি কাগজে কালির আঁচড় টানার দিন থেকে? তা তো নয়। লেখা-লেখা খেলার হাতেখড়ির অনেক আগেই কেউ হয়তো মনের কাগজে শব্দ সাজাতে সুরু করে, কেউ বা গল্প লেখার হাতেখড়িই চালিয়ে যায় বছরের পর বছর, সত্যিকার একটা কোন গল্প লেখার আগে।

ছোটবেলায গল্প শুনতে শুনতে প্রথম যেদিন বক্তা চুপ ক'রে যাওয়ায় আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তারপর?—সেদিনই মনের পাতায় প্রথম গল্প উঁকি দিয়েছিল। অর্থাৎ গল্প যে এখানে থামতে পারে না, এর পরেও কিছু আসবে, এই কল্পনাই গল্পের প্রথম প্রাণস্পদন। বক্তা যেদিন ভুল ক'বে বলেছিলেন, 'তারপর রাজকুমার বাঘটাকে গিলে ফেললো' সেদিন বললাম, যাঃ, তাই কখনো হয়? অর্থাৎ অবিশ্বাস্য, অবাস্তব। বক্তা ভুল শুধরে বললেন, মানে, বাঘটা রাজকুমারকে গিলে ফেললো। মন তবু সায় দিলে না। বক্তা বলতে বাধ্য হলেন শেষে, না, না, বাঘটা যেই রাজপুত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, অমনি একটা অজগর এসে বাঘটাকে গিলে ফেললে। আর আমার মন সে গল্প বিশ্বাস করলে, শিল্পজগতের বিশ্বাস্য আব অবিশ্বাস্যের পার্থক্য বুঝতে পেরে গল্প লেখার ভিৎ তৈরী হলো মনে।

কাগজে কলমে ধরে না রাখলেও কোন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বা কোন অসমাপ্ত গল্পের চারপাশে যেদিন থেকে পূর্ণাঙ্গ কোন কাহিনী বুনেছি, কারো আত্মহত্যার খবর পেয়ে যেদিন ভেবেছি, এমনও তো হতে পারে, কিংবা কোন কুড়িয়ে পাওয়া পয়সার পিছনে কল্পনা করেছি কোন হতভাগ্যের দারিদ্র্য বা খেয়ালী ননীগোপালের নবাবীপনা, সেদিন থেকেই গল্প লেখার সুরু।

আমার যখন বারো-চোদ্দ বছর বয়েস তখন আমার এক বন্ধুর মা'র কাছে আমি ছিলাম অত্যন্ত প্রিয়। তেমন হাসি হাসি সুন্দর মুখ, তেমন স্নেহ প্রীতি পবিত্রতায় উজ্জ্বল চোখ আমি খুব কম দেখেছি। সেই বয়সেই হঠাৎ একদিন শুনলাম, তিনি সারা অঙ্গে পেট্রোল ঢেলে আত্মহত্যা করেছেন। এমন আনন্দমুখর মুখে কি এমন ব্যথা লুকিয়েছিল ভাবতে ভাবতে একটি গল্প বুনে ফেলেছিলাম মনে মনে। আর বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভাত মুখুজ্যে, চারু বন্দ্যো-পড়া সেই অকালপক্ক বয়সে একটি দু'দিস্তে কাগজের খাতা শেষ করেছিলাম উপন্যাস লিখে।

নামটা আজো মনে আছে, 'চোরাবালি'। আরেকটা কথা মনে আছে, উপন্যাসটা পড়ে শুনিয়েছিলাম আমার এক মামীমাকে। তিনি হাপুস নয়নে কেঁদেই সারা। তারপর কি ভাবে যেন বাড়ীর সকলের কানে পৌঁছলো, 'কবি' 'লেখক' ইত্যাদি বলে ঠাট্টা সুরু করলো বন্ধুরাও, আর আমি উপন্যাসটা পুড়িয়ে ফেলে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

কবিতা গল্প উপন্যাস কোন কিছু যে আমি আবার কোনদিন লিখবো, ষোল বছর বয়সের আগে কোনদিন আর ভাবিনি।

বাবার চাকরীর দৌলতে রাঁচী-হাজারিবাগ, রায়পুর-বিলাসপুর, ওয়ালটেয়ার-বিশাখাপত্তন, গোয়া-গোলকুণ্ডা, অম্বর-উদয়পুর ইত্যাদি বহু জায়গার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছিল আমার। ১৯৩৯ সালে কোলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম যে বন্ধুটিকে পেলাম তার বই-পড়া ভুল ভাঙতে গিয়ে জানিয়ে ফেললাম আমার অভিজ্ঞতার কথা।

সে বললে, লিখিস না কেন, অত যখন জানিস?

বললাম, কি লিখবো?

কেন, গল্প?

হেসে বললাম, জানলেই কি লিখতে হয়, না লেখক মাত্রেই জানে। যে লিখতে জানে, তার অনেক কিছু না জানলেও চলে। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী যে কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ আছে বলে, যাকে খুশী গাড়ীতে তুলে নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ কি তা বলে গল্প আটকাতে পেরেছে?

বন্ধুটি হেসে বললে, না, না, লেখ তুই। তোর হবে।

আমি তখন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকি আর কলেজ করতে যাই ওয়াই-এম-সি-এ'র নীচের পাবলিক রেস্তরাঁয়। কিন্তু যেখানেই বসে একটু আড্ডা জমাবার চেষ্টা করি, অমনি বন্ধুটি হেসে হাজির।

—কি রে গল্প লিখেছিস?

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকই এই বন্ধু। আর বলা বাহুল্য যে, প্রাণতোষ নিজে লিখতো তখন এবং সম্পাদকের কাছে লেখা দিয়ে আসার জন্যে একটি সংগী খুঁজছিল। ওর কাছেই শুনলাম, ওর আরেক বন্ধু ইতিমধ্যেই চার-পাঁচটা উপন্যাস লিখে ট্রাংক বোঝাই করে রেখেছে—একসংগে ছাড়বে।

—নাম কি তার? জিগ্যেস করলাম।

—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আসল নাম গোকুল, লেখে কিন্তু ডাকনামে।

প্রাণতোষের কাছে স্বরাজের নাম প্রায়ই শুনতাম, আর ইতিমধ্যেই ওর সম্বন্ধে প্রবল ঔৎসুক্য জেগেছিল আমার।

কিন্তু স্বরাজ পড়তো বিদ্যাসাগরে, তাই দেখা হ'ত না।

হঠাৎ প্রাণতোষ বললে, কালই একটা গল্প চাই তোর, স্বরাজ তোকে লিখতে বলেছে।

এই অদেখা অচেনা লোকটি নির্ঘাৎ ভবিষ্যতের একজন জিনিয়স, ...নে ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমার। অতএব সে যখন বলেছে—

সেদিনই ক্লাশ পালিয়ে ওয়াই-এম-সি-এর পাবলিক রেস্তরাঁয় বসে চার পাতার একটা ছোট গল্প লিখে ফেললাম। সামনে বসেছিল আমার

অন্য এক অসাহিত্যিক বন্ধু—নাম জ্যোতিপ্রসাদ সেন। সে পড়ে বললে, চমৎকার। কিন্তু গল্পের নাম কি দেয়া যায়? বিশাখাপত্তনে থাকার সময় এ... তামিলতনয়াকে ভাল লেগেছিল, তাকে কেন্দ্র করেই গল্প। গল্পের খাতিরে শেষটা ট্র্যাজিক, আয়রনি অফ ফেট বলা চলে।

...রের ঘণ্টায় প্রাণতোষ এসে বললে, ঠিক আছে। নাম স্বরাজ দিয়ে দেবে। আর পরের সপ্তাহেই 'আজ-কাল' সাপ্তাহিকের একটি সংখ্যা এনে দেখালো প্রাণতোষ। গল্পের নাম—ট্র্যাজেডি, লেখকের নাম—রমাপদ চৌধুরী।

সেদিন থেকেই আমার গল্প লেখা সুরু। কারণ, পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য ঘটনাই তো ঘটে। তেমনি এক হৃদয়বিদারক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। 'ট্র্যাজেডি' গল্প এক বছরের মধ্যেই আমার জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিলো। না, কোন তামিলতনয়া নয়, একটি বাঙালী মেয়েকেই কেন্দ্র করে। আর সেই বেদনা মুছে ফেলবার জন্যে আবার লিখতে হলো। আরো অনেক গল্প। তারপর 'পিগম্যালিয়নের' মতই, যাকে কেন্দ্র করে গল্প লেখা তাকেই ভুলে গেলাম, ভালবেসে ফেললাম লেখাকে।

শুধু প্রেমেরই নয়, 'ট্র্যাজেডি' লেখার দিন থেকেই সাহিত্যের পথে, ট্র্যাজেডির পথে যাত্রা সুরু করেছি। এক এক সময় সেই পুরোনো গল্পটা পড়বার ইচ্ছে হয় বড়ো। ভাবি, যদি হারিয়ে না ফেলতাম সেটা! সে গল্পের কপি কি আপনাদের কারো কাছে নেই?

আজ মনে পড়ে, কত উদ্ভট তর্ক বিতর্ক করেছি সেদিন, কতবার 'লেখা' ফিরে এলেই প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট উড়িয়ে রাত জেগে কত নতুনতর অপাঠ্য গল্পই না লিখেছি, দুরু দুরু বক্ষে কখনো বা আনন্দবাজারের মন্মথবাবুর হাতে, কখনো বা যুগান্তরে বিনয় ঘোষের হাতে দিয়ে এসেছি, ডাকে পাঠিয়েছি পূর্বাশা আর চতুরঙ্গে। কখনো ছাপা হয়েছে, কখনো হয় নি, আর যখনই কোন গল্প ছাপা হয়েছে আনন্দে নিজেকে মনে হয়েছে অদ্বিতীয় এক দিগ্বিজয়ী।

এই আমার গল্প লেখার গল্প। কিন্তু এ গল্প আমার চেয়েও ভালো করে বলতে পারতো আরেকজন। যে নিজে কোনদিন কলম হাতে করে নি, কিন্তু পাবলিক রেস্তঁরার দিন থেকে আজ অবধি আমার প্রত্যেকটি গল্প পড়ে এসেছে, সমালোচনা করেছে, লেখা শুধরে দিয়েছে, উপদেশ দিয়েছে, গল্প ফিরে এলে আমার মতই আহত হয়েছে, আর ছাপা হলে আমার চেয়েও বেশি আনন্দিত হয়েছে। তার নাম, আপনাদের কাছে হয়তো, জানবার মতও নয়। কিন্তু আমার কাছে সে নাম ভোলবার নয়।

প্রথম সংস্করণে এ বইয়ের গল্পগুলি যেভাবে সাজানো ছিল বর্তমান সংস্করণে তার পরিবর্তন ঘটেছে— কোন কোন গল্পেরও।

দরবারী

বরকাকানার জংশন-স্টেশন তখন সদ্য সদ্য ত্রিবেণী হয়েছে। একটা লাইন গেছে ডাল্টনগঞ্জ ডেরি অন্ শোনের দিকে, আরেক দিকের রেলওয়ে ছোটামুরী টাটা হাওড়া। ইস্ট ইন্ডিয়ান আর বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের জয়েন্ট-স্টেশন বরকাকানা থেকে তিন নম্বর বেণী ঝুললো রায় লাপরা মহুয়ামিলনের দিকে। অন্য দুটোর ওপর কমবেশী দিল্লীর চোখ ছিল, নতুনটার খাস মালিকানাই নয়, পুরোদস্তুর ম্যানেজমেন্টও কোম্পানীর। এ আই আর সি এ'র নির্দেশনিয়ম মানছে কি না মানছে তা দেখবার লোকও ছিল না।

তাই লাপরার স্টেশন মাস্টার রজনীবাবুর অনুযোগের শেষ ছিল না, মনে মনে গজরাতেন শুধু, শোনাবার লোক পেলে বলতেন, এমন স্টেশনই ভাগ্যে জুটলো যে দিনরাত কেবল সবুজ বাতিই দেখাতে হয় ট্রেনগুলোকে, সিগন্যাল নেমেই আছে। থামার মধ্যে একটা আপ আর একখানা ডাউন সারা দিনে। রেলকে সবুজ বাতি দেখাই আমি, আর শালার রেল আমার ভবিষ্যতের দিকে তাকায় না, লালবাতি টাঙিয়ে সিগন্যাল তুলেই আছে। ট্র্যান্সফার বা প্রমোশনের লাইনক্লিয়ারটি দেবার নাম নেই।

যারা শুনতো তারা শুধু হেসেই খালাস। বড়ো জোর দু'একটা সান্ত্বনা জানিয়ে সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে হুইস্‌ল্ বাজিয়ে ল্যাজের কামরায় লাফিয়ে ওঠা। গার্ড, ব্লকের এল-বি-এস, আর নয়তো আর-এম-এসের সর্টার—এ ছাড়া জনমনিষ্যি ছিল না কাছে-পিঠে, যার সঙ্গে রয়ে বসে দু'চারটে সুখদুঃখের কথা বলতে পারেন রজনীবাবু। রয়ে বসে কথা অবশ্য ওদের সঙ্গেও চলতো না, নেহাৎ কোনদিন ট্রেন লেটে না এলে! কিংবা সামনে মালগাড়ি না পড়ে গেলে।

লাপরায় তখন দিনে দু'চারটে যাত্রী নামতো, দু'চারটে প্যাসেঞ্জার টিকিট কাটতো। তাও থার্ড ক্লাসের। স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে মুণ্ডা অস্পৃশ্যদের একটা ছোট্ট ডিহি। প্যাসেঞ্জার তো দূরের কথা, ছাপা টিকিটই ছিল না তখন।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন সেকেন্ড ক্লাশ কামরা থেকে নামলো এক পাগলা সাহেব। পাগলই মনে হয়েছিল রজনীবাবুর, কথাবার্তা শুনে। আর সাহেবের সঙ্গে ডেড়া কামরা থেকে নামলো এক হিন্দুস্থানী ছোকরা।

পাগলই মনে হোক, আর যাই মনে হোক, প্রথম দর্শনেই হৃৎকম্প হয়েছিল তাঁর। হঠাৎ এ কৌরব রাজত্বে পান্ডবের আগমন কেন? কোন রকমে মাথায় টুপিটা লাগিয়ে কালো কোটের বুকে পিতলের বোতাম আঁটতে আঁটতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন রজনীবাবু। একে সাহেব, তার ওপর রেলেরই কোন বড়ো অফিসার কি না কে জানে!

রজনীবাবু সেলাম করতেই সাহেব হলুদে দাঁত বের করে একমুখ হেসে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে আধো আধো স্বরে বলেছিল, স্টেশন মাস্টার টুম? কেয়া নাম?

রজনীবাবু নাম বলার পর তাঁর পিঠে প্যাট করে সাহেব বলেছিল, টুম হামারা ডোস্ট হোগা—ফ্রেন্ড, হাম আউর টুম ফ্রেন্ড।

—ইয়েস স্যার, সার্টেনলি স্যার, ভেরি লাকি স্যার। বিনয়ে গলে গিয়ে, আনন্দে উচ্ছল হয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে রজনীবাবু উত্তর দিয়েছিলেন।

আর সাহেব নিজের বুকে মোটা হাতের একটা ফাঁপালো আঙুল ঠুকে বলেছিল, হাম ম্যাকক্লাস্কি হায়, য়্যাম জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি। এ জাগা দেখনে আয়া হাম, ইধার রহেনে মাংটা। ওয়াণ্ট টু মেক এ নাইস লিট্‌ল হোম ফর মি! বহুৎ—সু সু বিউটিফুল প্লেস হায়। ফার্মিং করে গা, আবাদ করে গা।

রজনীবাবু ততক্ষণে নির্ভয় হয়েছেন, খুশী মনে উত্তর দিয়েছেন, ভেরি গুড স্যার, ভেরি গুড সিনারি, বিউটিফুল সয়েল স্যার।

বলেছেন বটে, কিন্তু মনে মনে হেসেছেন। লোকটা বদ্ধ উন্মাদ নাকি? এই পাথুরে জমিতে চাষ করবে? জায়গা খুঁজে পেলো না আর সারা ভারতবর্ষে? এই অজ সাঁওতালী গাঁ, বলে কিনা, বিউটিফুল প্লেস!

দোষ কি! রজনীবাবু নিজেও তো একদিন এই চোখেই দেখেছিলেন জায়গাটাকে। প্রথম যেদিন বদলি হয়ে এসেছিলেন মনে আছে তাঁর।

দিনদুপুরে হঠাৎ মাঝ রাতের অন্ধকার নেমে এসেছিল ট্রেনটা টানেলের ভেতর ঢুকতেই। গুম্ গুম্ গুম্ গুম্, কেমন একটা পৃথিবী গুমরে ওঠার শব্দ যেন। সমস্ত শরীর তাঁর নতুন এক অভিজ্ঞতায় শিউরে উঠেছিল। তারপর হঠাৎ আবার আলোয় ফিরে এসেছিল চোখ। দু'পাশে কাটা পাহাড়ের দেয়াল, দূরে দূরে ঘন অরণ্যের রহস্য, কুয়াশা জড়ানো ছোট ছোট অগুন্তি পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়, আর লাল মাটির দারিদ্র্য। রেল লাইনের পাশে কোথাও বালির ঢিবিতে রোদ-চিকচিক অভ্র, মাইলের পর মাইল নির্জনতার প্রান্তর; নিঃশব্দ বাতাসের গান। রজনীবাবুরও সেদিন রোমাঞ্চ জেগেছিল।

পাগলা সাহেবের কথা শুনে কিন্তু না হেসে পারলেন না উনি। মনে মনে বললেন, দুটো দিন সবুর কর মিঞা, পালাতে পথ পাবে না।

টোরিটি বাজারের ওয়াটসন থেকে বার্ডওয়ান রোডের মিসেস কার্ক পর্যন্ত সবাই বলেছিল, সিলি আইডিয়া। অতএব রজনীবাবু আর হাসবেন না কেন?

কিন্তু পাগলা সাহেব জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি সত্যিই একটা পাহাড়ের গায়ে বিঘে কয়েক জমি কিনে বেশ বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি তুলে ফেললে। রাঁচী থেকে যে রাজমিস্ত্রীর দলকে নিয়ে এসেছিল তাদের কাঠা কয়েক জায়গা দিতে চাইলে জোনাথন সাহেব, কিন্তু এই নির্জন পুরীতে স্বেচ্ছায়

কে আর দ্বীপান্তর ভোগ করতে চায়! তারা যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল। রইল শুধু জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি। আর রজনীবাবু।

ছোট স্টেশন। কাঁকর বিছানো লম্বা টুকরো প্লাটফর্ম। ট্রেনের পা-দানী থেকে সাবধানে লাফ দিয়ে নামতে হয়, এত নিচু লেভেল। প্রথম তৈরির সময় সেই যে বেড়া দেয়া হয়েছিল, মেরামত হয়নি আর তারপর। ওয়েটিংরুম টুমের বালাই নেই, স্রেফ একখানা ঘর, একজনই স্টেশন মাস্টার। আরেকজন কর্মচারী ছিল অবশ্য—কিষণলাল। কিন্তু সে যে কার কর্মচারী বোঝা দায়। সিগন্যাল পোস্টের সিঁড়িতে উঠে আলো জ্বালানো থেকে ট্রেনের সময় ঢং ঢং করে বার কয়েক ঘণ্টি বাজানো, 'পানিপাঁড়ে' ডাক শুনলে এগিয়ে গিয়ে উবু-হয়ে-বসা দেহাতী কোন যাত্রীর আঁজলায় জল ঢেলে দেয়া। ব্যস, তারপর সারাদিন স্টেশনের পিছনেই রজনীবাবুর কোয়ার্টারে মশলাবাঁটা থেকে শুরু করে 'পায়ের দাবানা' পর্যন্ত। কিষণলালের মা ছিলো রজনীবাবুর বাড়ির বাসন মাজার ঝি। মারা যাবার সময় সাত বছরের কিষণলালকে রজনীবাবুর হাতে তুলে না দিক, পায়ে ঠাঁই দেবার অনুরোধ জানিয়ে যায়। তখন থেকেই সে রজনীবাবুর সঙ্গী, বন্ধু, ভৃত্য, উপদেষ্টা।

স্টেশন ঘরে বসে টেলিগ্রাফের যন্ত্রণায় আঙুল এঁটে মাঝে মাঝে টরেটক্কা টরেটক্কা করা আর কিষণলালের সঙ্গে গল্প ফাঁদা। সেদিনও এমনি ভাবেই কথাবার্তা চলছিলো দুজনের, চলছিলো পাগলা সাহেব জোনাথন সম্বন্ধে। এমন সময় ম্যাকক্লাস্কি নিজেই এসে হাজির। সারা শরীর ভিজে গেছে, লালচে কপালে লেপটে আছে ব্রাকেটের মত বাঁকা এক গোছা চুল, আর পায়ের গোড়ালি, ট্রাউজারের পায়া কাদা লেগে নোংরা হয়ে গেছে।

ম্যাকক্লাস্কিকে দেখে রজনীবাবুর হুঁশ হ'ল বাইরে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ী জায়গায় বৃষ্টি যখন শুরু হয় আকাশ ভেঙে বান ডাকে যেন। আবার তখনই খটখটে রোদ্দুর। ঘর থেকে বেরুনোর পর মাঝপথেই বোধ হয় বৃষ্টি নেমেছে, ভাবলেন রজনীবাবু।

যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে থেকে সহাস্যে বললেন, এ কি হাল হয়েছে সাহেব? বর্ষাতি নিয়ে বেরোওনি?

—দিস ইজ রেন-বাথ। পানিমে আস্নান কিয়া। এক পাটি হলদে দাঁত বের করে হাসলে জোনাথন। তারপর একটা টুল টেনে নিয়ে বসলো।'

রজনীবাবু বললেন, বোসো সাহেব বোসো। জলটা থামুক, চা খাওয়াবো তোমাকে।

—টি? নো। চোখ টিপে ইশারা করে বললে, পিয়েগা আজ।

—বটে? একদিন মহুয়ার মদ গিলেই নেশা লেগে গেছে?

—নাহি নাহি রাজ্‌নীবাবু। বার বার মাথা নাড়লে জোনাথন। ...নট্‌ ওয়াইন। আই লাইক্‌ দ্যাট ভিলেজ। ও লোককা নাচ আউর গানা চার্মিং, আই লাইক্‌ দেয়ার ডান্স অ্যাণ্ড মিউজিক। ডুম ডুম ডুম ডুম...সারা শরীর দুলিয়ে কল্পনার ঢোলক বাজাতে শুরু করলো।

রজনীবাবু মনে মনে ভাবলেন, হায় রে। এ ব্যাটাও সাহেব। বৌ ছেলে নেই, তেপান্তরের মাঠে এসে বাড়ি করেছে, দিনরাত গিয়ে পড়ে থাকতে চায় মুণ্ডাদের আড্ডায়, মদ খেয়ে ধেই ধেই করে নাচতে লেগে যায় তাদের সঙ্গে। লজ্জা শরম, আত্মসম্মানজ্ঞান নেই এতটুকু, এ ব্যাটাও সাহেব!

বললেন, তুমি সাহেব মানুষ। তোমার কি ওদের সঙ্গে তাল দেওয়া উচিত?

—কাহে নেই? চটে গেল জোনাথন।—হাম ভি নেটিভ হো যায়গা। লিখেগা হাম, আ'ল রাইট বুকস্ অ্যাবাউট দেম। নাহি মিল্‌নেসে লিখেগা ক্যায়সে?

উত্তর না দিয়ে রজনীবাবু টরেটক্কা শুরু করলেন মর্সে। বই লিখবেন! লিখবে তো তুমি, পড়বে কে শুনি তোমার মত পাগলের লেখা? ভাবলেন রজনীবাবু, বলতে তবু সাহস হল না। এমনিতেই তো চটে গেছে!

খানিক চুপ করে থেকে কিষণলালকে বললেন, দেখ্ তো বৃষ্টিটা ধরলো কিনা, সাহেবের জন্যে একটু চা বানিয়ে নিয়ে আয়।

বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। পাহাড়ী জায়গার বৃষ্টি, ঝুপঝুপ করে যেমন আসে, চট্ করে তেমনি থেমেও যায়। কিষণলাল উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিয়ে আবার ফিরে এলো।

—দু পেয়ালা তো?

—হুঁ। খাতা লিখতে লিখতে রজনীবাবু উত্তর দিলেন।

কিষণলাল চলে যেতেই জোনাথন সরে এসে বসলো রজনীবাবুর পাশে।

—যাওগে, রাজ্‌নীবাবু?

রজনীবাবু মুখ তুলে ঘাড় নাড়লেন। —না। তুমিও যেওনা সাহেব।

—কাহে?

—ওরা কেউ কেউ রাগারাগি করছে। ওরা হল মুণ্ডা আর তুমি সাহেব। ওদের মেয়েদের সঙ্গে তুমি হাস্যাহাসি করো...

—বাট আ'ল ম্যারি হার। হাম তো সাদি করনে মাংথা।

—তুমি তো সাদি করতে চাও, কিন্তু শনিচারীর বাবা টাঙির এক কোপে মাথা উড়িয়ে দেবে এ-কথা শুনলে।

—ও নো নো রাজ্‌নীবাবু। হাসলে জোনাথন। —শোনিয়া টু লাভ্‌স্ মি।

ভালবাসা? প্রেম? রজনীবাবু কথা বাড়ালেন না আর। মুণ্ডা মেয়ে কিনা প্রেমে পড়বার লোক পেল না, ভালবাসলে পাগলা সাহেবকে! হতে পারে! টাকা ছড়ালে কি না হয়। কিন্তু এ লোকটার রুচি বলিহারি, শেষে একটা কালো কুচকুচে সাঁওতালনীকে?

হিসেবে কিন্তু ভুল হয়েছিল রজনীবাবুর। শোনিয়াকে সত্যিই একদিন বিয়ে করে বসলো জোনাথন, একেবারে আরণ্যক মতে। মুণ্ডা সর্দার প্রথমটা একটু আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিল। কিল্লীর মিল নেই, নাম গোত্র দূরের কথা একেবারে ভিন্‌দেশের ভিন্‌জাতের লোক, তার সঙ্গে গিতিওড়ার কুমারী মেয়ে শোনিয়ার বিয়ে! কেন, জোয়ানদের গিতি-ওড়ায়

যে আইবুড়ো ছেলেগুলো ঘুমের জন্যে ছট্ফট্ করে তাদের একজনকে কি বেছে নিতে পারলো না শোনিয়া? বনজঙ্গল সাফ করবার জন্যে যখন জারা জ্বালানো হয় তখন তো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেও পারতো মেয়েটা।

সিল্লি তামার বুণ্ডু বরণ্ড রাহে—এই পাঁচ পরগণার মান্কি কদম ছত্রীর আখড়ায় গিয়ে বিচার আনলে সর্দার। গিতিওড়ার ঘরে সারা গাঁয়ের কুমারী মেয়েদের সঙ্গে রাত কাটানো যার ধরম, সে যখন নিজের মান রাখে নাই, তখন করুক সে বিয়া। পট্টি পিড়ের মুণ্ডারা কেন কাজী করতে যাবে সাহেবের সঙ্গে।

সুতরাং বিয়েটা নির্বিঘ্নে হয়ে গেল মাণ্ডা পরবের হপ্তা কয়েক আগে। সারা ডিহির মাটি ভিজে গেল মহুয়ার মদে, তিন দিন মদে চুরচুর হয়ে রইলো পট্টির জোয়ান সাণ্ডিরা। শুধু কি সাণ্ডিরা? মেয়েরাও খোঁপায় পলাশ গুঁজে মাথায় ঘটি নিয়ে সারি নাচলে, নেশায় ঢললে। টাংরাটোলি আর মোরহাবাদি থেকে মুধা ডোম এসেছিল জন কয়েক, তাদেরও ঠোঁট ভিজলো হাঁড়িয়া খেয়ে, সারি ছোঁয়ার আপত্তিটুকুও জানালে না কেউ।

জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি বললে, আউর পিও। বখরা লে আও, সবকো গোস্ত রোটি খিলায় গা। মাণ্ডা পরবকা সব খরচা হাম দেয়গা।

রজনীবাবুকেও গিয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এলো। আর দেশে বিদেশে যেখানে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছিল সকলকে চিঠি লিখলে, হঠাৎ বিয়ে করে বসেছি, মিসেস ম্যাকক্লাস্কির সঙ্গে আলাপ করতে চাও তো নেক্সট্ ট্রেন ধরে লাপরায় চলে এসো।

চিঠি অনেকগুলোই ছেড়েছিল, কিন্তু এলো শুধু দু'পক্ষ। রাঁচীর ছোট গির্জার রেভারেণ্ড ব্রাউন আজানুলম্বা কালো আলখাল্লা গায়ে, একখানা রেক্সিন বাঁধাই পুরোনো বাইবেল হাতে, পুরু লেন্সের চশমা আঁটা চোখে, প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি থেকে নামলো। আর অন্য একটা কামরা থেকে নামলো আধা-বুড়ি মেম মিসেস ক্যাসল্, আঠারো বসন্তের ফ্লোরা, গুটি দুই হাফপ্যাণ্ট পরা বাচ্চা।

দু'পক্ষই এদিক ওদিক দেখে বিরক্ত হয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল।

—মিস্টার ম্যাকক্লাস্কির বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন? তারপর দুজনেই বুঝলো যে তারা নবাগত। সুতরাং স্টেশন ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রজনীবাবুকে সামনে পেয়ে বুড়ি মেম মিসেস ক্যাসল্ বললে, মিস্টার ম্যাকক্লাস্কি নিশ্চয় মোটর পাঠিয়েছেন আমার জন্যে?

'পাগলা সাহেব' 'পাগলা সাহেব' বলে বলে নামটাও ভুলে গিয়েছিলেন রজনীবাবু। প্রথমটা তাই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। খানিক পরেই বুঝতে পেরে কোনরকমে বললেন, না, গাড়ি তো পাঠায় নি।

—দেন? হাউ ফার ইজ ইট্...টু্য মাইলস্? চাপা রাগে বিস্ময় প্রকাশ করলে রেভারেণ্ড ব্রাউন।

মিসেস ক্যাসল্ আরো পরিষ্কার ভাষায় বললে, লোক পাঠাও, গাড়ি নিয়ে আসুক। 'কার' না পাঠালে এক্ক পা'ও হেঁটে যেতে পারবো না।

রজনীবাবু সায় দিলেন তার কথায়, কিষণলালকে বললেন খবর দিয়ে আসতে। আর মনে মনে হাসলেন। গাড়িই আসবে বটে! ফুরফুরে শহুরে রাস্তা পেয়েছো কিনা। তোমাদের ম্যাকক্লাস্কি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতন বিলিতী সাহেব নেই আর, তা তো জানো না।

জানতে অবশ্য দেরি হ'ল না। ঘণ্টাখানেক ধরে স্টেশনঘরে বসে ঘামলো ওরা। আঠারো বসন্তের মেয়েটা বুকের সবুজ পেখম ভিজিয়ে ফেল্‌লে ঘামে, মিনিটে মিনিটে হাতের ভ্যানিটি খুলে ক্ষুদে আয়নায় মুখ দেখলে, পাউডার লাগালে, ঠোঁট রাঙালে বারবার, অধৈর্য্য হয়ে পায়চারি করলে থেকে থেকে। বাচ্চা দুটো হৈ হুল্লোড় করলো কুয়োর পাশের পেয়ারা গাছটায় উঠে। তারপর এক সময় কিষণলাল ফিরে এসে বললো, সাহেব এসেছে গাড়ি নিয়ে।

রেভারেণ্ড ব্রাউন আর মিসেস ক্যাসল্ ছুটে বেরিয়ে এলো। জোনাথনের দিকে চোখ পড়লো তাদের। আর বিস্ময়ে ঘৃণায় ভুরু কুঁচকে মিসেস ক্যাসল্ বললে, অ্যফুল। রেভারেণ্ড ব্রাউন বললো, পরের ট্রেন কখন? আমি ফিরে যাবো এখনই।

কিন্তু ফিরবো বললেই তো ফেরা যায় না। ট্রেন সেই বিকেলে।

গরুর গাড়িটা হাঁকাতে হাঁকাতে ওদের সামনে এসে লাফিয়ে নামলো জোনাথন। খালি গা, লোমশ চওড়া বুক, গরমে লালচে হয়ে উঠেছে সারা শরীর, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গাড়ি হাঁকাবার পাঁচনটা পায়ে ঠুকতে ঠুকতে জোনাথন বললে, যেতে হয় বিকেলে যাবে, এখন তো চলো, গাড়ি এনেছি তোমাদের জন্যে। তা ছাড়া মিসেস ম্যাকক্লাস্কির সঙ্গে দেখা করবে না?

মিসেস ম্যাকক্লাস্কি যে ব্যারনকন্যাই হোক না কেন, আলাপের ইচ্ছে আর ওদের ছিল না। তবু ঠাসাঠাসি করে গরুর গাড়িতেই উঠতে হ'ল।

রেভারেণ্ড ব্রাউন দাঁতে দাঁত চেপে বললে, ন্যাস্টি অ্যাফেয়ার।

মিসেস ক্যাসল্ আবার মন্তব্য করলে, অ্যফুল।

আঠারো বসন্তের উদ্ভিন্নযৌবনা ফ্লোরা কৌতুকে আনন্দে বলে উঠল, হাউ নাইস!

বাচ্চা দুটো হেসে গড়ালো—সো ফানি। ইজ্‌ণ্ট ইট মামি?

ব্ল্যাঙ্ক টিকিটের খাতাটা খুঁজে বের করে রেখেছিলেন রজনীবাবু, পাড়ানি হিসেবের চার্টটাও। তাড়াতাড়িতে তখন হয়তো খুঁজে পাবেন না এই ভয়ে। বুড়ো বুড়িরা যে বিকেলের ট্রেনেই পালাবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না তাঁর। গরুর গাড়ি আর জোনাথনের খালি গা দেখেই যাদের চোখ কপালে উঠেছিল, খাটো কাপড়ের আধা-আবরণ কাল চামড়ার মিসেস ম্যাকক্লাস্কিকে দেখে তাদের যে কি অবস্থা হবে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু কোথায় তারা? বিকেলের ট্রেন ছেড়ে গেল, তবু ফিরলো না কেউ। সন্ধ্যারাতের কৌতুকবিস্ময়ের চাঁদ রজনীবাবুর মনে অনুসন্ধিৎসার

ভোর হয়ে দেখা দিলো। রাত কাটলো, সকাল হ'ল। তবু পাত্তা নেই ওদের। না পাদ্রী সাহেবের, না মিসেস ক্যাসলের। বাচ্চা দুটো 'সো ফানি' কালো মেয়েটার আঁচলের সঙ্গে লেপটে গেল নাকি? না মুণ্ডাদের ব্ল্যাক লেডীর ব্যবহারে মুগ্ধ হ'ল ওরা?

লেডী? নিজের মনেই হেসে ফেললেন রজনীবাবু। মনে পড়ে গেল, বহুদিন আগে কখন একবার রেলের এক ফিরিঙ্গি সাহেব ইংরেজী ভাষা শিখিয়েছিল তাঁকে। ট্রেনের কামরা দেখিয়ে বলেছিল, ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ক্লাসে মেয়েদের কামরায় লেখা থাকে 'লেডীজ', ডেরা কামরায় থাকে 'উইমেন', থার্ড ক্লাসে স্রেফ 'ফিমেল'!

আর বুড়োবুড়িকে আটকে রাখার কৃতিত্ব এই ফিমেলটার কিনা জানবার জন্যে সকালের এক গ্লাস চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন রজনীবাবু, গিয়ে হাজির হলেন পাগলা সাহেবের বাংলায়।

ফটকের সামনেই দেখা হ'ল। গোলাপের গোড়ায় পচা পুঁটির সার দিচ্ছিলো জোনাথন।

—কি ব্যাপার? বন্ধুরা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন রজনীবাবু।

চোখ টিপে হাসলো জোনাথন। —শো রহা হায়! স্লিপিং, বোথ অফ দেম।...কাম ইন, লেট আস হ্যাভ টি।

বলে এগিয়ে গেল সে, আর রজনীবাবু তাকে অনুসরণ করতে করতে দেখতে পেলেন ফ্লোরা আর বাচ্চা দুটো ওদিকে ফেন্সিংয়ে প্রজাপতি ধরার চেষ্টায় হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

বাইরের বারান্দায় বসে পাগলা সাহেব মুচকি হেসে একটা রীতিমত বিলিতী লেবেল মারা বোতল দেখালো।—তিন বোতল পিয়া, টু অফ দেম্। বলেই ছিপিটা খুললো, আর এক দমকা দুর্গন্ধ এসে রজনীবাবুকে বুঝিয়ে দিলো, পচাইটা নতুন মার্কার বিলিতী বলে চালিয়েছে ও।

স্টেশন ঘরে টরেটক্কা করতে করতে সে-কথা কিষণলালকে বললেন রজনীবাবু।—ও বুড়ো বুড়ি রস পেয়েছে, এখন থাকলো বোধ হয়।

থাকলো যে, তার প্রমাণও মিললো।

মুণ্ডা পট্টির সর্দার মাণ্ডা পরবের নিমন্ত্রণ জানাতে এসে বলে গেল, সাহেবের দলও নাকি যাবে পরব দেখতে।

তাই মাণ্ডার দিন বিকেলে একটা বাচ্চা এসে যখন বললে, পাগলা সাহেব সেলাম জানিয়েছে, চায়ের নেমন্তন্ন তাঁর বাড়িতে, রজনীবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, একটা কেলেঙ্কারী না বাধিয়ে বসে, বুঝলি কিষণলাল?

আর সেই ভয়েই যাবোনা যাবোনা করেও যেতে হল তাঁকে।

কিন্তু গিয়ে বুঝলেন ব্রাউন আর ক্যাস্‌ল্ তখনও দোমনা। চা পান সমাপ্ত হওয়ার পর জোনাথন বললে, এবার তা হ'লে যাওয়া যাক্।

কালো আলখাল্লার রেভারেণ্ড ব্রাউন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—না, কক্ষণো না। হিদেন ফেস্টিভ্যাল দেখতে যাবে একজন ট্রু ক্রিশ্চান? মিসেস ক্যাসল বললে, নেটিভদের গায়ের গন্ধে নাকে কার্চিফ দিতে হয়।

রূপবতী ফ্লোরা যৌবনদেহের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়েছে কিনা আড়চোখে

দেখে নিয়ে স্কার্টের ভাঁজ মোলায়েম করলে সুশুভ্র হাতের উল্টো পিঠটা ঘষে ঘষে। তারপর এক মুখ সমবেদনার হাসি ছড়িয়ে রেভারেণ্ড ব্রাউনের চোখে চোখ রাখলে।—ওদের কি দোষ, আহা বেচারীদের কেউ তো সিভিলাইজ করার চেষ্টা করে নি।

সুতরাং জোনাথনের সঙ্গে সবাই মাণ্ডা পরব দেখতে যেতে রাজী হ'ল। পিছনে রজনীবাবু ওদের দলকে অনুসরণ করলেন। আর তাঁর পাশে পাশে হাঁটলো শোনিয়া। আড়চোখে শোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রজনীবাবু যেন বুঝতে পারলেন, ফ্লোরার উপস্থিতিতে একদিকে যেমন শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ও, তেমনি ঈর্ষান্বিতও।

কিন্তু ওর মনের দুশ্চিন্তা শেষ অবধি চেপে রাখতে পারলে না শোনিয়া। বললে, উ মেয়েটা কে বটে?

রজনীবাবু হেসে বললেন, তোর সতীন হবে হয়তো!

শোনিয়া কথাটা বঝুতে পারলো না, ভাবলে কোন কৌতুককর কথা বুঝি, তাই খিলখিল করে হেসে উঠলো ও সারা দেহে হিল্লোল তুলে। তারপর পরবের মাঠে ভোক্তার ভিড় দেখে বললে, হুইযে, রামায়েৎ গোঁসাই বটে! আর যাস্‌না বাবুরা, আপনি উদের ইথান থিকে দেখতে বল।

সত্যিই তো, আর এগিয়ে গেলে হয়তো দাঙ্গা লেগে যাবে। তাড়াতাড়ি পিছন থেকে জোনাথনকে থামতে বললেন রজনীবাবু।

সকলেই দাঁড়িয়ে পড়লো সেখানে।

চারপাশের ডিহি থেকে পরবের দল এসে জমেছে মাণ্ডার মাঠে। দলের হাতে একটা করে বিচিত্র চিহ্ন আঁকা পতাকা। রজনীবাবুর মনে পড়লো, একবার দু'দলের পতাকায় একই চিহ্ন থাকায় কি খুনোখুনিটাই না হয়েছিল। সে কথা বুঝিয়ে দিলেন তিনি রেভারেণ্ড ব্রাউনকে।

তাঁর ভুল ইংরেজী আর হাস্যকর উচ্চারণ শুনে ফ্লোরা মুখ আড়াল করে হাসলে।

মাঠের এক কোণে মহাদেবের আস্থান। সেখান থেকে অজস্র পেরেক লাগানো একটা কাঠের পাটা ভক্তিভরে মাথায় করে নিয়ে এলো ভোক্তারা। শোনিয়া দু'হাত জোর করে বুকে ঠেকিয়ে মাটিতে প্রণাম করলে। বললে, ফারতী। অর্থাৎ পার্বতী।

মাঠের মাঝখান থেকে মহাদেবের আস্থান পর্যন্ত ভোক্তার দল সারবন্দী হয়ে মাথা হেঁট করে বসে পড়লো হঠাৎ। আর রামায়েৎ গোঁসাই মাটি না ছুঁয়ে ভোক্তাদের কাঁধে পা দিয়ে দিয়ে আস্থানে গিয়ে পৌঁছলো।

তা দেখে রেভারেণ্ড ব্রাউন বলে উঠলো, হরিব্‌ল্‌।

মিসেস ক্যাস্‌ল বললে, ইনহিউম্যান!

ফ্লোরা বললে, হাউ স্পোর্টিং।

বাচ্চা দুটো চোখ গোল গোল করে বললে, ইণ্ডিয়ান সার্কাস।

কিন্তু এর পরেও যে উত্তেজিত হওয়ার দৃশ্য ছিল, রেভারেণ্ড ব্রাউন তা জানতো না।

কান্ধাইয়া শেষ হয়ে ফুলকুদনা শুরু হ'তে রাত গভীর হয়ে এলো। অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাঠ কয়লার আগুন ধরানো হ'ল, চারপাশে

ভোক্তারা বসে কুলোর বাতাস দিয়ে গনগনে করে তুললো আগুন। তারপর গোঁসাই এগিয়ে এসে মন্ত্র পাঠ করলে। আর সদ্যস্নাত ভোক্তারা ভিজে কাপড়ে সারি বেঁধে দাঁড়ালো আগুনের পাশে। একজনের পর আরেকজন ধীরে ধীরে ঐ আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল তারা। রেভারেণ্ড ব্রাউন আর মিসেস ক্যাস্‌ল্‌ স্তম্ভিত, হতবাক্‌। ফ্লোরা শিউরে উঠে জোনাথনের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। ভয়ে চিৎকার করে উঠলো বাচ্চা দুটো।

ভোক্তাদের পালা শেষ হ'ল। এবার ভিজে কাপড়ে সোক্‌থাইন মেয়েরা হাঁটা শুরু করলো আগুনের ওপর দিয়ে। রেভারেণ্ড ব্রাউন বললে, আই মাস্ট সী। সত্যি আগুন কিনা, সত্যি ওদের পায়ে ফোস্কা পড়েছে কিনা।

সন্দেহ দূর হ'ল তাঁর। সত্যিই আগুন। সত্যিই কোন ফোস্কা পড়েনি তাদের পায়ে।

ফুলকুদনা শেষ হওয়ার পর মানকির সামনে নাচ গান শুরু হ'ল। উদ্দাম বেগে ঢোলক বেজে উঠলো, ককিয়ে উঠলো বাঁশের বাঁশি। মুখোশ নৃত্য শুরু হ'ল। কিন্তু সেদিকে মন রইলো না রেভারেণ্ড ব্রাউনের।

বাড়ি ফেরার পথে বারবার বললে, আই মাস্ট ব্রিং লাইট টু দেম। এইসব অশিক্ষিত হিদেনদের অন্ধকার থেকে আলোকে আনতে চাই আমি।

মাস কয়েকের মধ্যেই ছোট্ট একটা গির্জা মাথা তুললো লাপরায়। আর গির্জার বেদীতে দাঁড়িয়ে প্রথম সাম্‌স্‌ পাঠের দিন পাটনা থেকে মিসেস ক্যাস্‌ল্‌ আবার এলো ফ্লোরা এবং বাচ্চা দুটোকে নিয়ে। মিস্টার ক্যাস্‌ল্‌ হঠাৎ ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা যাওয়ায় সংসারে বৈরাগ্য এসেছে তার, তাই যেসাসের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করলে। রক্তমাংসের শরীরে যেসাস উপস্থিত হতে না পারায় রেভারেণ্ড ব্রাউনের পায়েই স্থান নিলো।

জোনাথন হেসে সে খবর জানালে রজনীবাবুকে। বললে, পায়ে নয়, বুকে। ব্রাউনের বুকে নিজেকে সমর্পণ করেছে মিসেস ক্যাস্‌ল্‌।

ব্যাপারটার গভীরতা রজনীবাবুও বুঝলেন, যখন মিসেস ক্যাস্‌ল্‌ এসে অনুরোধ জানালে, খানিকটা জমি দেখে দাও আমাকে। এখানেই জীবনের বাকী ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে চাই।

মুণ্ডাদের জন্যে একটা মিসনারী ইস্কুলও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এলো জনকয়েক অ্যাংলো মাস্টারনি।

তারপর এক একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এক একখানা বাংলো উঠতে শুরু হ'ল। ইনস্টিটিউট, রেস্ট হাউস, দোকানপাট। ক্রমশ লাপরার দেহাতী অঞ্চল একটা রীতিমত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কলোনী হয়ে গেল কয়েক বছরের মধ্যে। শুরু হ'ল একটা কলোনী অফিস। সারা জীবন চাকরি ক'রে বড়ো সাহেবরা অবসর জীবন কাটাবার শেষ বিশ্রাম গ'ড়ে তুললো লাপরার জমিতে।

শুধু মদের দোকানের লাইসেন্স নিয়ে এলো উত্তম সিং, ঠিকাদার বুধন তেওয়ারী তার বাড়ির পাশেই একটা মন্দির বানালে, লাপরা স্টেশনে আরেকজন সহকারী এ. এস. এম জুটলো রজনীবাবুর, কলোনী আপিসের

সেক্রেটারী এলেন অমিয় গুপ্ত, আর ডাক্তার হিমাংশু রায়। মুণ্ডা আর অ্যাংলোদের মাঝখানে এই একটাই গোষ্ঠী গড়ে উঠলো।

কিন্তু জোনাথন খুশী হ'ল কি! ওকে কেউ আর পাগল মনে করলো না, মনে যাই থাক মুণ্ডা মেয়ে মিসেস ম্যাকক্লাস্কিকে দেখে কেউ প্রকাশ্যে নাক বেঁকালো না। বড় ছেলে ম্যাক আর যুবতী মেয়ে ক্লারার দেশী নামকরণেও কেউ আপত্তি তুললো না। মেনে নিল। এমন কি এ উপ-নগরের পত্তনদার হিসেবে তার আসন রইলো সম্মানের, শ্রদ্ধার। কলোনীর প্রেসিডেণ্ট থেকে ব্যাপটিজমের শিশুর গড ফাদার হওয়ার জন্যে তার কাছেই যত অনুরোধ।

তবু জোনাথন বিমর্ষ মুখে একদিন বললে, হামারা মিশন বরবাদ হো গিয়া রাজ্‌নীবাবু।

—সে কি মিঃ ম্যাকক্লাস্কি! রজনীবাবুও সম্ভ্রম ক'রে কথা বলতে শুরু করেছেন, তাই বললেন, আপনার মিশনই তো ফুলফিলড্ হ'ল মিঃ ম্যাকক্লাস্কি। এত বড়ো একটা শহর গ'ড়ে তুললেন আপনি। একদিন আপনাকে গরুর গাড়ি চালাতে দেখে হাসতো ওরা, আজ রাস্তা-ঘাটে সাহেবরা গরুর গাড়িতে চড়ে যাতায়াত করছে, মাটি কোপাচ্ছে খালি গায়ে, চাষ করছে, এমন কি সাজগোজ করাই এতদিন যাদের কাজ ছিল সেই সব মিসিবাবা মেমসাহেবরাও ক্ষেতে গিয়ে বীজ বুনছে।

জোনাথন হেসে বললে, হামারা মিশন তো এ নাহি থা রাজনীবাবু। আই অ্যাডমায়ার দি মুণ্ডাজ সোস্যাল সিসটেম। হাম ভি মুণ্ডা হোনে মাংতাথা। ইতনা বড়া কিতাব লিখা হায়, আই হ্যাভ রিটন অ্যাবাউট দেম।

—কিন্তু মুণ্ডারা যে সব ক্রিশ্চান হয়ে গেল মিঃ ম্যাকক্লাস্কি।

জোনাথন আক্ষেপ করলে, ওহি তো বোলতা। আই হ্যাভ বিন ডিফিটেড। আউর হামারা কলোনী পিপ্‌ল্ ভি ইণ্ডিয়ান নাহি হুয়া। দে হ্যাভ জাস্ট ইমপোর্টেড এ ব্রিটিশ ভিলেজ হিয়ার ইন ইণ্ডিয়া।

রজনীবাবু সান্ত্বনা দিলেন।—তাতে কি মিঃ ম্যাকক্লাস্কি, মুণ্ডারা সিভিলাইজড্ হচ্ছে এ তো ভালো কথা।

—সিভিলাইজড্? ডক্টর রয় মে টেল ইউ। ডিজিজ, ইম্‌মর‍্যালিটি, ইনসেস্ট—এহি তো ক্যারেক্টার হায় কলোনী পিপ্‌লকা। দে আর ক্রিশ্চানস্ ওনলি ইন নেম—দিজ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানস্। এ লোক সিভিলাইজ করনে মাংতা মুণ্ডা লোগকো? মাথায় হাত দিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লো জোনাথন। —রেভারেণ্ড ব্রাউন সেজ আই হ্যাভ ইনসালটেড ক্রিশ্চানিটি।

কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বললে, অ্যাণ্ড মাই সান ইজ উইথ দোজ হোয়াইট-স্কিন বাগার্স। মুণ্ডা লোককো ভাগানে মাংতা ও।

রজনীবাবু বিস্মিত হলেন, সে কি মিঃ ম্যাকক্লাস্কি? ওর মা তো মুণ্ডা?

—সেজ হি হেটস্ হিজ মাদার।

চোখ কপালে উঠলো রজনীবাবুর। এমন কথা ভূভারতে কেউ কখনো শুনেছে নাকি? ছেলে মাকে ঘৃণা করে? এও কি সম্ভব? জোনাথনের

কথায় আহত বোধ করলেন রজনীবাবু। মনে হ'ল এ যেন তাঁর দেশের অপমান। ম্যাক তার মাকে ঘৃণার চোখে দেখে, মুণ্ডা মায়ের ছেলে ম্যাক? এতদিন রজনীবাবু নিজের গোষ্ঠীটাকে সকলের থেকে পৃথক করে দেখতেন, ভাবতেন। যেন মুণ্ডারা অন্য এক পৃথিবীর মানুষ, যেমন এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ভাবতেন অন্য জগতের। সব মেলামেশা, ভদ্রতা, আচার, আপ্যায়ন সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্র ছিল না তাঁর। কিন্তু আজ হঠাৎ সচেতন হলেন, কোন অলক্ষ্য মুহূর্তে থেকে নিজেকে মুণ্ডাদের আপন লোক ভাবতে শুরু করেছেন জেনে। মুণ্ডা মায়ের অপমান আজ যেন তাঁর নিজের মাকেও অপমান করা মনে হয়েছে।

ম্যাককে কাছে পেয়েই একদিন তাই মেজাজ দেখিয়ে ফেললেন।—খুব যে সাহেব হয়ে গেছো ছোকরা. তুমি নাকি............

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল ম্যাক। কথা খুঁজে পায়নি। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাথা নিচু করলে। রজনীবাবু স্পষ্ট বুঝতে পারলেন চোখ ছলছল করছে ছেলেটার।

বললেন, কি হয়েছে কি বলো তো?

এমন কিছুই নয়, কিংবা অনেক কিছুই। ও যেমন মুণ্ডাদের সঙ্গে মিশতো, আপনজন মনে করতো তাদের, তেমনি সাদা চামড়ার মানুষ-গুলোকেও বন্ধু ভেবেছে চিরকাল। ওর গায়ের রং ব্রাউন বলে কেউ কখনো তো আপত্তি জানায় নি। বরং যে কোন ফাংশনে ফেস্টিভ্যালে ওর সহযোগিতা কামনা করেছে সবাই। আর তারই ফাঁকে কখন কিভাবে মিস্টার হাগিন্সের মেয়ে ইভাকে ভালবেসে ফেলেছে ও। ওর আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে ধরা দিতে কুণ্ঠিত বোধ করেনি ইভা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জনে পাহাড়ী নদীর ধারে বসে এলোমেলো অনেক কথায় অনেক সময় কেটে গেছে, তবু হাসি মিলিয়ে যায়নি কোনদিন ইভার মুখ থেকে।

সেই ইভা হাগিন্স ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ওর প্রেম ফিরিয়ে দিয়েছে। সারা কলোনীর ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করে ও বাঁচতে পারবে না। তাছাড়া রেভারেণ্ড ব্রাউন এ বিয়েতে মত দেবে না।

—আমার মাথার ঠিক ছিল না সেদিন, রজনীবাবু। যা মুখে এসেছে মাকে বলে ফেলেছি সেদিন, মনে হয়েছে সব দোষ বুঝি তারই। মুণ্ডা-পট্টিতেও এ খবর নাকি রটে গেছে।

মুণ্ডাপল্লীতেও পেশীছেছে এ খবর? তাই কি জারার আগুন ঘিরে প্রতি-রাত্রে ওদের জল্পনাকল্পনা চলে? থেকে থেকে উদ্দাম আবেগে ঢোলক বেজে ওঠে ডুম ডুম ডুম ডুম, আর শিকারের চিৎকার ওঠে প্রতিদিন, সে কি এইজন্যেই? রজনীবাবুর হঠাৎ খেয়াল হ'ল। সত্যিই তো, মুণ্ডারা আজকাল আনাগোনা করে সঙ্গে তীরধনুক নিয়ে। কেন? কার ওপর রাগ তাদের? ম্যাক, না অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ওপর?

এতদিন নির্বিকার ছিলেন রজনীবাবু, চোখের সামনে লাপরা স্টেশনের স্টপেজ আধ মিনিট থেকে সতেরো মিনিট হয়েছে, গড়ে উঠেছে এত বড়ো একটা টাউন। কিন্তু এতদিনে সব বুঝি ভেঙে যায়। নষ্ট হয়ে যায় সব

কিছু। তিনিই তো পিটিশনের পর পিটিশন করে ট্রেন থামার সময় বাড়িয়েছেন। ওয়েটিং রুম করতে বাধ্য করিয়েছেন, আনিয়েছেন ইলেকট্রিকের আলো। সব নষ্ট হয়ে যাবে?

মুণ্ডা সর্দারের সঙ্গে দেখা করলেন রজনীবাবু সেই রাত্রেই। কিন্তু ফল হ'ল না। পুরুষদের গিতি-ওড়ায় গিয়ে দেখলেন, ঘুমের ঘর যে গিতি-ওড়া সেখানে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। তীরধনুক ছুঁড়ছে, তীরে কি করে বিষ লাগাতে হয় শেখাচ্ছে সর্দার। আর মদের গন্ধে ভরে গেছে সারা ঘর।

রজনীবাবু ডাকলেন, মানকি।

সর্দার ফিরে তাকালো, রক্তচক্ষু মেলে তাকালে রজনীবাবুর দিকে। তারপর এগিয়ে এসে বললে, তু মানা করিস না মাস্টারবাবু। ইস্টিশনে থাকবি আপুনি। উ সাদা চামদের হামরা কাঁইটা সাফ ক'রবো বটে। পাগলা সাহেবের মুখে থু দিয়েছে উনারা।

রজনীবাবু বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ছিঃ ছিঃ ওসব করিস না মান্‌কি। ওরা রাজার জাত, ওদের মারলে তোদেরই ক্ষতি হবে।

—হোলো। ঘাড় বাঁকালে সর্দার।—ক্ষেতি হোলো। শোনিয়ার বেটার মুখে থু দিয়েছে ওনারা। আমরা উদের কাঁইটা সাফ ক'রবো বটে। লছ্‌মী পূজার দিন মোরগ ব'লি দিয়ে উদের সাফ ক'রবো।

রজনীবাবু বার বার বোঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন।

কলোনীতেও তখন সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। বন্দুক ঠিক আছে কিনা, টোটার অভাব হবে কিনা দেখছে সবাই। জানালা দরজার কাচ সরিয়ে কাঠ লাগানো হচ্ছে ঘরে ঘরে। উত্তেজিত হয়ে উঠছে দু'পক্ষই।

রেভারেণ্ড ব্রাউনকে গিয়ে ধরলেন রজনীবাবু।—আপনি বাঁচাতে পারেন, আপনি বন্ধ করুন এসব হাঙ্গামা। মুণ্ডারাও ক্রিশ্চান, এরাও ক্রিশ্চান—দু'পক্ষকেই থামান আপনি।

হাসলে রেভারেণ্ড ব্রাউন।—দি মুণ্ডাজ আর ক্রিশ্চানস্ ওনলি ইন্ নেম। তাছাড়া কলোনী পিপ্‌ল্‌দের ওপর ওদের কমপ্লেণ্ট কি? ইভা হাগিন্স ম্যাককে বিয়ে করতে চায় না, এতে তাদের কি? আসলে ম্যাকক্লাস্কি ওদের এক্সাইট করছে।

—ইভা হাগিন্স চায়, কলোনী চায় না। বললেন রজনীবাবু।......কারণ ম্যাকের মা মুণ্ডা মেয়ে। এতে মুণ্ডাদের অপমান হয়েছে, বলছে তারা। আপনিই নাকি ওদের বুঝিয়েছেন, ক্রিশ্চান হলে সবাই সমান হবে। তবু কেন অপমান সহ্য করতে হয় তাদের, তবু কেন ম্যাককে বিয়ে করতে সাহস পায় না ইভা হাগিন্স?

—ক্রিশ্চান হলেই রাতারাতি তারা হোয়াইট্‌স হয়ে যাবে একথাও বলেছিলাম নাকি? বিদ্রূপের স্বরে বললে রেভারেণ্ড ব্রাউন।

রজনীবাবু বুঝলেন কাজ হবে না কিছু এভাবে তর্ক করে। স্টেশনে ফিরে এসে বরকাকানায় তার করলেন তিনি, মিলিটারি সাহায্য পাঠাবার জন্যে। থানা এখান থেকে অনেক দূরে, তাছাড়া একজন দারোগার কর্ম নয়, একথাও জানিয়ে দিলেন। কিন্তু পরের দিন সকালের ট্রেনে পুলিশ

ও মিলিটারির দল এসে পেঁছনোর আগেই সব গোলমাল মিটে গেল। খবর রটে গেল চতুর্দিকে।

গির্জার অলটারের সামনে, ভোরের প্রার্থনা জানাতে এসে রেভারেণ্ড ব্রাউন প্রথম আবিষ্কার করলো। ঠিক অলটারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দুটো শবদেহ। জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি আর মুণ্ডা মেয়ে শোনিয়া। আর অলটার থেকে গির্জার দরজা পর্যন্ত দুটো লম্বা রক্তের রেখা। ওরা দু'জনেই নাকি আত্মহত্যা করেছে। হয়তো কলোনীর সমস্ত ঝামেলা থামিয়ে দেবার জন্যেই—বললেন রেভারেণ্ড ব্রাউন।

পুলিশ তদন্ত করতে চাইলে। বললে, ডেড্ বডি মর্গে পাঠাতে হবে। সুইসাইড কেস যখন।

রেভারেণ্ড ব্রাউন হেসে বললেন, আইন শিখে এখানে এসো হে লাল পাগড়ি। প্রভু যীশুর সামনে এই গির্জার মধ্যে যারা শেষ নিশ্বাস ফেলেছে তাদের তদন্ত যেসাসই করবেন। তোমরা ফিরে যাও। বলেই বুকের উপর হাতটা ওপর থেকে নীচে, ডান থেকে বাঁ, ক্রস আঁকলেন বাতাসে।

তারপর বললেন, ম্যাকক্লাস্কি যত দোষই করে থাক, হিদেনদের সঙ্গে মেলামেশা করলেও তাকে আমি ট্রু ক্রিশ্চান বলেই জানতাম। কলোনীর সকলে তার ফিউনারেলে যেন যোগ দেয়।

সত্যিই ভিড় করে এলো সকলে। মুণ্ডাপল্লী থেকেও মেয়ে পুরুষ ছুটে এলো, পাগলা সাহেব মারা গেছে শুনে। নিঃশব্দ শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালে সকলে, রেভারেণ্ড ব্রাউন বজ্রগম্ভীর স্বরে বাইবেল পাঠ করলো। কফিন নামিয়ে দেয়া হ'ল কবরে, পাশাপাশি। জোনাথন ম্যাকক্লাস্কির পাশে শোনিয়া।

তারপর আবার শান্তি ফিরে এলো কলোনীর বাতাসে। রেভারেণ্ড ব্রাউন আর আরো পাঁচশো বাসিন্দে পিটিশন পাঠালে, লাপরার নাম বদলে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ করা হোক। অনুমতি এলো যথাসময়ে।

স্টেশনের বোর্ডে লাপরা নাম মুছে গেল, গোটা গোটা নতুন হরফ বসলো সেখানে। ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ। আর সেদিকে তাকিয়ে ম্যাক বললে, এদের এটুকু কর্তব্যজ্ঞান যে আছে তা দেখে আমি সত্যিই সুখী হলাম, রজনীবাবু, আ'এম রিয়েলি হ্যাপি।

চোখ ঝাপসা হয়ে এলো রজনীবাবুর। বললেন, জানো না ম্যাক, মিস্টার ম্যাকক্লাস্কির জীবনের সবচেয়ে বড়ো ডিফিট এইটেই। তিনি নিজে লাপরার মানুষ হতে চেয়েছিলেন, মুণ্ডা হতে চেয়েছিলেন। অথচ শেষ পর্যন্ত লাপরাই বদলে গেল।

কিন্তু গির্জার দরজা থেকে অলটার অবধি দুটো রক্তের রেখা পাশাপাশি কি করে আসতে পারে এ প্রশ্ন কারো মনেই উদয় হ'ল না।

শান্তির দূত যীশুর গরিমা প্রচারের জন্যেই তো যুগে যুগে হিংস্র ক্রুসেডারদের অভিযান। ঈশ্বরের পুত্র যেসাসের ক্ষমা আর অহিংসার ধর্মকে পবিত্র করে তুলতে রেভারেণ্ড ব্রাউনের হাত কতটুকুই বা লাল হ'ল। তার বদলে ঈশ্বর লাপরার মাটিকে আলো দেবেন অনেক বেশী।

আমেন।

তিতিরকান্নার মাঠ

অরুণিমা সান্যালের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। অনেক অনেক মিঠে বসন্তের মাঠ পার হয়ে এসে কোন এক আকস্মিকতার আলপথে আবার দেখা হয়ে যাবে অরুণিমার সঙ্গে।

খালারির লাইম হিল থেকে হঠাৎ হুঁশিয়ারী ঘণ্টার আর্তনাদ ভেসে আসবে, ডিনামাইট ফাটবে, সশব্দে খসে পড়বে পাথুরে চুনের চাঙড়। কিন্তু সে আওয়াজ কি কানে পেঁছিবে আমার?

গাঁঠে গাঁঠে ঠোকর খাওয়া বেতো বুড়োর মত বরকাকানার লোক্যালটা রোদজ্বলা আর রঙচটা শরীর নিয়ে ঠুঙঠুঙিয়ে এসে দাঁড়াবে মহুয়া-মিলনের প্ল্যাটফর্ম ঘেঁষে। কামরাগুলোর জানলায় উঁকি দেবে সাদা পাখনা পাখির মত একঝাঁক কনভেণ্টে-ছুটি-পাওয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। কিন্তু সেদিকে কি চোখ যাবে আমার?

চিউইংগাম আর চকোলেট খাওয়া মুখে বাচ্চা মেয়েগুলো জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করবে, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ আর ক'টা স্টেশন, ট্রেন কি ল্যেট চলেছে? টিংলিটুডাঙের ল্যাক ফরেস্ট থেকে চোরাই কাচ্চা-গালার মোট কাঁধে নিয়ে নোংরা দেহাতীদের ভিড় ডেড়া-কামরায় ঝামেলা বাধাবে খামোকা। কিন্তু আমার মন কি স্পর্শ করবে এসবের কিছু?

তবু বরকাকানার লোক্যাল ট্রেন এসে থামবে মহুয়ামিলনের স্টেশনে। দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর গায়ে মেখে, কুলিকামিন রেজা রোজমজুরদের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে। জান্‌কী ডাব্বার পাশে, রাধাকিষেণের মন্দির পার হয়ে টিলায় ঘেরা ঘরগুলোর পাশে এসে ট্রেন থামবে।

ডেরা ডিহি, গাঁও দেহাত? না, কিছু নয়। গ্রামের নাম গ্রাম নয়, মাঠ। জলো গাঁয়ের জংলী ভাষার নাম বাংলা করলে দাঁড়ায়—তিতিরকান্নার মাঠ। তিতিরকান্নার মাঠের ধারে মহুয়ামিলন স্টেশন।

টিকিট হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে স্টেশনে আসবো আমি, দেহাতীদের ভিড় ঠেলে ঠেলে ট্রেনের কামরা খুঁজবো। তারপর—ওর মুখের ওপর দিয়ে আমার চোখ পিছলে সরে যাবে, কিন্তু দু-চার মুহূর্ত পরেই আবার থমকে দাঁড়াবে মন। হয়তো দু-চার পা এগিয়ে গিয়েছি, কিন্তু—মন থেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে না হোক, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পায়ের গতিও থামবে। আর একবার ফিরে তাকাবো ওর মুখের দিকে, মনে হবে ও-মুখ যেন চেনা চেনা, অনেক চেনা মনে হবে আমার। মনে পড়বে।

নিজেরই অজান্তে কখন কম্পার্টমেণ্টের সামনে এসে দাঁড়াবো। চোখ মেলে তাকাবো অরুণিমার দিকে। নতুন কেনা হোল্ডঅল, আর লেবেল আঁটা স্যুটকেশ, কুকুর, ছড়ি, ফ্লাস্ক, বেতের টিফিন বক্স ইতিমধ্যেই প্ল্যাটফর্মের ধুলোয় সাজানো হয়ে গেছে, দেখতে পাবো। আর তার পাশেই সত্যিকারের পোশাকে সাজানো একটি নধরকান্তি পুরুষ চেহারাও চোখে পড়বে। দোহারা

শক্তসমর্থ শরীর। ভায়োলেট রঙের কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, গোলাপী লিনেনের হাওয়াই শার্ট, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পায়ে ক্রেপসোলের দামী জুতো, কাঁধে চামড়ার স্ট্র্যাপে ঝোলানো ক্যামেরা ইত্যাদি সবকিছুকে ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়বে শুধু দুটো ফাঁপালো আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট, চুরুটের ধোঁয়ার ফিতে। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরে যাবে ট্রেনের কামরার দিকে, কামরার পা-দানির দিকে। চোখ তুলে তাকাবো ফের, অরুণিমার চোখে চোখ রেখে। না-চেনা ভুরুর ভাঁজে দেখবো দুপুরের ক্লান্তকালিমা, ঈষৎ বিরক্তির আভা তার চোখের তারায়, কানে কপালে লুটিয়ে-পড়া উড়ু উড়ু শুকনো চুলে ট্রেন-জার্নির স্মৃতিচিহ্ন, গলার স্বেদসিক্ত মুক্তোর মালায় আর সবুজ শাড়ির ভাঙা ভাঁজের জড়তায় শ্রান্তির আভাষ, বিষণ্ণ মধুর। অরুণিমা। অরুণিমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্লাটফর্মে নামানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাবে, হাওয়াই শার্টের দিকে, তারপর বছর তিনেকের একটি ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেকে হাত ধরে নামিয়ে আনবে কামরার ভেতর থেকে, টুক করে বুকে তুলে নেবে ছেলেটাকে, সাবধান সাবধান পা ফেলে নেমে আসবে নীচে। আমার মনে তখন শুধু একটাই ইচ্ছে জাগবে, একটাই কামনা। চোখ তুলে কি তাকাবে না অরুণিমা, চিনবে না? কিন্তু ও যেন বড়ো বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সময় পাবে না পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে দেখবার। না, শেষ অবধি পারবে না অরুণিমা, চোখোচোখি হবে, ঠোঁট কাঁপিয়ে হেসে উঠবে ওর মুখ।

—পারলুম না। মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল মিঠে কণ্ঠের কাকলি শুনবো। —পারলুম না গম্ভীর হয়ে থাকতে।

--দেখেছ? চিনেছো তাহলে? আমি প্রশ্ন করবো।

চোখে চোখ মেলে অরুণিমা শুধু হাসবে, জবাব দেবে না প্রশ্নের।

তারপর সেই পোশাকে সাজানো পুরুষটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে অরুণিমা ঃ কোন কথায় নয়, উপাধিতে নয়, শুধুমাত্র ঠোঁট আর চোখের কৌতুকহাস্যে, লজ্জাগর্বের ইশারায়।

আমি বিস্মিত হবো নিশ্চয়ই, কিন্তু বিস্ময় চাপা দিতে হবে আমাকে।

—সুনীতদা, এই আমার সুনীতদা। আমার পরিচয় দেবে অরুণিমা।

---অত্যন্ত খুশী হলাম। গুরুগম্ভীর উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে একটা মাংসালো হাত এগিয়ে আসবে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকেও খুশী হতে হবে।

তারপর অরুণিমার কোলের ছেলেকে কোলে তুলে নেবো, বলবো দু-একটা অবান্তর প্রশংসার কথা, হয়তো বা খোকার মুখশ্রীতে মুগ্ধ হবো, উদ্বেগ দেখাবো অরুণিমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

—সত্যি, এত রোগা হয়ে গেছ! বলবো আমি।

—সেইজন্যেই তো আসা। এত জায়গা থাকতে এখানে এলাম কেন, যদি শরীরই ভালো থাকবে। সরল সহজ হাসি ভাসবে ওর কথায়।

ওর কথা! ওর কথা কাজ ভোলাবে, গন্তব্যের ঠিকানা ভুলবো আমি।

—কোথায় যাবে? অরুণিমা প্রশ্ন করবে, বলবে, না গেলেই কি নয়?

—মুখ বলবে, 'কাজ', কিন্তু মন আমার অন্য কথাই বলতে চাইবে।

লটবহর কুলির মাথায় তুলে ওরা তখন চলতে শুরু করবে। কর্ডুরয়ের

ট্রাউজার চলবে আগে আগে, আমরা পিছনে। তিন বছরের ছেলেটাই আমাদের মাঝখানে চীনের দেয়াল গেঁথে চলবে।

—এবার চলি আমি। ফিরতে চাইবো আমি, ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ শুনতে পাবো আর পরমুহূর্তেই খপ্‌ করে আমার হাত চেপে ধরবে অরুণিমা, অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাবে মুখের দিকে। —কতদিন, কত বছর পরে দেখা হ'ল বলো তো, আর আজই তোমার যত কাজ। অরুণিমার চোখে ব্যথার বিন্দু দেখবো।

উত্তর হারাবো আমি। চুপ করে থাকতে হবে।

ও বলবে, 'কত কথা, না-না, যাওয়া চলবে না তোমার। এই নতুন জায়গা, কত অসুবিধে হবে বলো তো, তুমি না থাকলে!'

—আমি আছি জেনে তো আসোনি অরুণিমা। হঠাৎ যদি এমনভাবে দেখা নাই হ'ত, অসুবিধে কমাবার জন্যে কাকে পেতে তখন?

কপালে ভুরু তুলবে অরুণিমা। বলবে, এত দূর থেকে এখানে শুধু ঝগড়া করতে আসিনি সুনীতদা।

চোখ ছলছল করবে অরুণিমার, আর আমি আশ্চর্য হবো এই ভেবে যে এমন সুযোগ বুঝে চোখে জল আনতে পারে মেয়েরা?

তবু যাওয়া হবে না আমার। অরুণিমার অনুনয় উপেক্ষা করার মত শক্তি আমি কোথায় পাবো।

টিংলিটুডাঙের লালাবাবুর বাড়িটা নাকি ওদের জন্যে নতুন করে কলি ফিরিয়ে রাখা হয়েছে, বলবে লালাবাবুর দারোয়ান। তিরিশ সালের ভাঙা ফোর্ডখানার দিকে ইশারা দেখিয়ে বলবে, লালাবাবুর চিঠি পেয়েই গাড়ি নিয়ে এসেছি।

জান্‌কী ডাব্বার পাশ দিয়ে গাড়ি চলবে, টাল খেয়ে খেয়ে, সুরকির রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা হলদে মহুয়া মাড়িয়ে, আমলকী পাতার ঝিকিমিকি ছায়ায়, পাগলা-মেম মেরী ওয়াটসনের বাংলোর বাগানের মাঝ দিয়ে, কুণ্টি-কড়ুয়া টিলা পাহাড়ী সড়ক ধরে। আঁকাবাঁকা রাস্তার ঝাঁকুনিতে অরুণিমা কখনো আমার দিকে ঢলে পড়বে, কখনো হাওয়াই শার্টের দিকে।

অতখানি পথ, এতটা সময়, তবু একটাও কথা শুনবো না হাওয়াই শার্টের, হাসি দেখবো না ফিকে সানগ্লাসের চোখে, যতক্ষণ না লালাবাবুর কুঠিতে এসে গাড়ি পৌঁছয়।

মোটামুটি সব গোছগাছ হয়ে যাওয়ার পর বাইরের বারান্দায় এসে ডেক চেয়ারে শরীর ঢেলে দেবে ফাঁপালো মানুষটা, চুরুটের বাক্স থেকে একটা চুরুট বের করে ধরাবে, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়বে ধীরে ধীরে, তারপর প্রশ্ন করবে, কোথায় থাকা হয় আপনার?

উত্তর দেবো। তারপর বহুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবো দুজনে, কথা খুঁজে পাবো না।

কর্ডুরয়ের ট্রাউজারই নিঃশব্দতা ভাঙবে শেষকালে, দারোয়ানকে বলবে, কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়েছো? স্নান করতে গেছেন মেমসাহেব?

আমি উঠে দাঁড়াবো, চলি মিস্টার গুপ্ত। এখানেই তো আছি, আবার আসবো।

শুধু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাবে হাওয়াই শার্ট, আর পরমুহূর্তেই বেতের টিফিন বক্স থেকে ইংরেজী ছবির কাগজ বের করে মন ফেরাবে।

আমি চলে আসবো। চলে আসতে হবে আমাকে। আর সারা পথ হাঁটতে হাঁটতে ভাববো, অরুণিমা কি ভাববে, স্নান-প্রসাধন সেরে অরুণিমা যখন বেরিয়ে আসবে, তখন কি সুন্দরই না দেখাবে অরুণিমাকে! অনেক বেশী সুন্দর মনে হবে। ঠিক সেই হারানো দিনের অসহ্য রূপ নিয়ে কি ও বেরিয়ে আসবে? আর বেরিয়ে এসে যখন দেখবে সুনীতদা চলে গেছে, একটাও কথা না জানিয়ে, তখন......

তখন ওর চোখে কিসের ভাষা ফুটবে, ওর মনের বুকে কতখানি দোলা লাগবে, কতটা বিস্ময় জাগবে ওর চোখে, ভাবতে ভাবতে পথ ছোট হয়ে যাবে আমার, সময় পিছলে যাবে।

তারপর কোন একদিন গুপ্ত সাহেবের মেজাজ ভাল থাকবে না, শরীর বিদ্রোহী, অথচ অরুণিমা আমলকীর বন পার হয়ে সাপের বুকের মত সরু আর আঁকাবাঁকা চুনাক্কা নদীর ধারে বসে সন্ধ্যার ছায়া ছায়া ফিকে জোছনার মেঘের দিকে তাকিয়ে আনমনে দাঁতে ঘাস কাটতে চাইবে।

চোখের ইশারায় বিরক্তি প্রকাশ পাবে ওদের দুজনেরই, আর গুপ্তর মনের চারপাশে মনোমালিন্যের কুয়াশা রেখে অরুণিমা বেরিয়ে পড়বে খোকাকে সঙ্গে নিয়ে।

বাধা দেবার চেষ্টা করবো আমি, বলবো, থাক না অরুণিমা, ওঁর শরীর যখন ভালো নেই, তাছাড়া ওঁকে একা রেখে......

কথা শেষ হবে না, অরুণিমার চোখের দৃষ্টি আমার মুখে হাত চেপে ধরবে। বলবে, চলো তুমি, তোমাকে ভাবতে হবে না অতশত।

খোকার হাত ধরে এগিয়ে যাবে ও, নিশ্চুপ, কথা নেই কথা নেই শান্ত নিস্তব্ধতায় পাশাপাশি হেঁটে এসে বসবো আমরা চুনাক্কার জলসিঁড়ির পাশে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবো।

তারপর এক সময় শুনতে পাবো অরুণিমার দীর্ঘশ্বাস। অরুণিমা বলবে, আশ্চর্য! মানুষের মন কখন যে কি ভাবে!

—কেন? কে কি ভাবলো আবার?

হেসে উঠবে অরুণিমা, সশব্দে।—ও কি ভাবছে জানো! ভাবছে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্বাভাবিক নয়। পুরুষ মানুষের মনে কত যে সন্দেহ।

আমাকে হাসতে হবে। ব্যথার হাসি। ভাববো, সত্যিই যদি অরুণিমার সঙ্গে আমার কোন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতো! সুযোগ তো এসেছিল, সময়ও। আর আমার মন জুড়ে সেদিন অরুণিমার মুখই তো ভাসতো শুধু। তবু আশ্চর্য মেয়েদের মন!

আমার কথা শুনে খিল খিল করে কৌতুকে বিদ্রূপে অরুণিমার যে মুখ হেসে উঠেছিল সেদিন, সেই মুখ আবার লজ্জার ভার নামিয়ে দেবে চোখের পাতায়। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে আরেকজনকে। অসীমেন্দুর কথা মনে পড়বে। নিজেই নিজের দীর্ঘশ্বাসে চমকে উঠবো এক সময়। বলবো, এমন কেন হ'ল অরুণিমা?

চোখ ফেরাবে ও, বুঝবে কি বলতে চাই। ধীরে ধীরে মাথা নামাবে, দু হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে একটা ঘাসের শিষ্ ছিঁড়ে নেবে অরুণিমা। হঠাৎ যেন অনেক চেষ্টার পর উত্তর বেরুবেঃ বিশ্বাস করো সুনীতদা, আমার ভুল নয়, আমার দোষ নয়।

—কিন্তু অসীম তো তোমার জন্যেই তার সমস্ত জীবন নষ্ট করলো, তার অপরাধটা তুমি কোথায় দেখলে।

মুখ দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারবো পুরোনো দিনের কথায় চোখ ছলছল করে উঠেছে ওর। ভেজা গলায় ও বলবে, থাক্ সুনীতদা, ওসব কথা।

থাক বললেই কি রাখা যায়। চাবি হাতে পেয়েও কি বিস্ময়ের ঘর না খুলে থাকা যায়।

ঠিক এমনি এক সন্দেহ এর আগেও হয়েছিল, এর আগেও একবার অসীমেন্দুর বাড়ি খুঁজে বের করেছি। কলেজে পড়ি তখন, সব আসনেই আমরা তখন পাশাপাশি। হোস্টেলে একই ঘরের দুটো সীট। আমি আর অসীমেন্দু। কলেজে ঢুকে প্রথম একটা মাস কেন জানি ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতাম, ওর চালচলন হাবভাব কোন কিছুই যেন পছন্দ হত না। তারপর কেমন করে যেন কাছাকাছি এসে গেলাম, একই হোস্টেলে পাশাপাশি সীট নিলাম, নিবিড় হয়ে গেল পরিচয়। চমৎকার স্বাস্থ্যবান চেহারা ছিল অসীমেন্দুর, আর খেলাধুলোয় নাম করেছিল সেই বয়সেই। ব্যস, পরিচয়ের মধ্যে ঐটুকুই। পোশাক-পরিচ্ছদে একেবারে উন্মাদ বলেই ধারণা হ'ত। ওর শার্টের কলার কোনদিন আফাটা দেখিনি, রঙবেরঙের পায়জামার কোথাও না কোথাও ছেঁড়া বেরুবেই। আর তিন সপ্তাহ যদি পোশাক বদলাতে ভোলে তো তিন মাস ভুলে থাকবে ও চুল কাটার কথা। কখনো মনে হত ইচ্ছাকৃত, কখনো বা সন্দেহ হত দারিদ্র্যের আঘাতেই ওর এমন দশা। ওর বাড়ির চেহারাটাও তাই মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলাম, আর একটা অত্যন্ত অভাবের সংসার চোখে ভেসে উঠতো অসীমেন্দুর কথা ভাবলেই। সন্দেহের ভিত দৃঢ় হত অসীমেন্দুর তরফ থেকে বাড়ির কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায়।

এই অসীমেন্দু কলেজের পরীক্ষা শেষ হয়ে যেতেই বেডিং বাক্স বাঁধতে বাঁধতে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বললে, আসিস মাঝে মাঝে।

—সে কি, এখানেই বাড়ি তোর? নিশ্চয়, যাবো তো নিশ্চয়ই। উত্তর দিয়েছিলাম। গিয়েছিলামও।

রাস্তার নাম দেখে প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিলাম, আবার ভেবেছিলাম, বড়ো রাস্তায় কি ছোট রোজগারের মানুষ থাকে না !

কিন্তু নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে যে বিরাট বাগানওয়ালা বড়ো ফটকের বাড়িটা পাওয়া গেল, তার ভেতর ঢুকতে সাহস হল না। ভাবলাম, পয়লা এপ্রিল তো অনেক দূরে। অসীমেন্দু কি আমাকে বোকা বানাবার জন্যেই এ ঠিকানা দিয়েছে?

হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা ভারী হাতের স্পর্শে চমকে উঠেছিলাম। —কি রে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? চল্। হকি স্টিক দোলাতে দোলাতে ফিরছিল অসীমেন্দু, গেটের বাইরে আমাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে।

তারপর যে ঐশ্বর্য, যে পরিবেশ, সংসারের যে পরিচয় পেলাম, তা আমার কল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দিল।

বছর কয়েক পরে আবার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে যেতে হল সেই অসীমেন্দুর কাছে। ওর চিঠিটা পকেট থেকে বের করে গলিটার নামটা মিলিয়ে নিলাম। ভাবলাম, কাণা গলির ভেতরও কি ঐশ্বর্যের প্রাসাদ থাকতে পারে না? না। নোংরা গলি, বাড়িটার বয়েসও শতাব্দী কয়েকের কম নয়। সামনের রোয়াকে আশি বছরের বুড়োর দাঁতের মত কয়েকটা ভাঙা ইঁট ঝুলছে। দেয়ালে শ্যাওলা, সবুজ রঙ করা কাঠের কপাট পচে গেছে এক যুগ আগেই। কপাটের ওপরেই আলকাতরায় লেখা বাড়ির নম্বর।

কপাট ভেজানো ছিল, তবু কড়া নাড়লাম।

—কে? দরজা খোলা আছে।

মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে ভাবলাম ভেতরে ঢুকবো কিনা। এ বাড়ি নিশ্চয়ই অসীমেন্দুর নয়, ধারণা হল আমার। অমন ঈর্ষার ঐশ্বর্য থেকে নেমে আসতে হবে কেন অসীমেন্দুকে!

—কে? এবার এলো মেয়েলী কণ্ঠের প্রশ্ন। হাল্কা পায়ে কে যেন এগিয়ে এলো, রঙিন এক টুকরো শাড়ির বিদ্যুৎ উঁকি দিল কপাটের আড়ালে। তারপর দরজা খুলে দিলো সে, আর পরমুহূর্তেইঃ

কে? আরে, সুনীতদা, তুমি? এসো ভেতরে এসো সুনীতদা। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? তখন থেকে কে কে করছি, সাড়া দিচ্ছো না যে! হাসিতে উচ্ছল হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অরুণিমা।

কতটুকুই বা পথ, দেখাবারই বা কি আছে। ছোট্ট একখানা ঘর, সামনে এক ফালি বারান্দা। এক কোণে ইঁট সুরকি, ভাঙা কাচ, অকেজো লোহার শিক, তারের জাল সব স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। বারান্দার এক পাশে একটা মোড়ার ওপর বসে টেনিস-র‍্যাকেটে স্ট্রিং আঁটছিল অসীমেন্দু।

র‍্যাকেটটা দূরে সরিয়ে রেখে একটা সস্তা সিগারেট ধরালে। —আয়। কবে এলি?

বললাম।

—মহুয়ামিলনেই আছো? অরুণিমা প্রশ্ন করলে।

ঘাড় নাড়লাম।

অসীমেন্দুকে বললাম, খেলার নেশা তোর এখনো আছে তা হ'লে!

ও হাসলো।—কেন, গাটিং করাবার পয়সা নেই বলে বলছিস?

—না, না। বয়সের কথা, এত বয়সেও......

—খেলার আবার বয়েস আছে নাকি? অরুণিমার হাসি-চোখে হাসি রাখলো অসীমেন্দু।—কোষ্ঠীতে আছে এবছর আমার যশপ্রাপ্তিযোগ, নির্ঘাত বেঙ্গলস্ নাম্বার ওয়ান হচ্ছি এবার।

বললাম, হলে খুশী হবো। কিন্তু কি খবর বলতো, হঠাৎ এদ্দিন বাদে এমন জরুরী ডাক?

অরুণিমা বাধা দিলো।—ওমা তাই নাকি। আমি ভাবলাম এদ্দিন বাদে বোধ হয় আমাদের কথা মনে পড়েছে। কৈ, সুনীতদাকে আসতে লিখেছো, বলোনি তো আমাকে?

অসীমেন্দু হেসে বললে,—সব কথা বলার সময় কৈ অরুণি?

অরুণিমা কপট অভিমান দেখালে। তারপরঃ বোসো, গল্প করো তোমরা, আমি বাড়ি থেকে চা করে আনি। বলেই কপাট খুলে বেরিয়ে গেল।

বললাম, কি ব্যাপার বলতো, কেমন যেন রহস্য রহস্য ঠেকছে। বিয়েটা হয়ে গেছে? অরুণিমা কি এখানেই থাকে?

অসীমেন্দু নিভিয়ে রাখা সিগারেটটা আবার ধরালে। বললে, না এখনো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বিয়ে করবো জিদ্ ধরাতেই এই হাল—ত্যাজ্যপুত্তুর।

জিজ্ঞেস করলাম, আর ওর বাড়ি থেকে?

—হ্যাঁ, আপত্তি তো আছেই। আচ্ছা, বড়োলোকের ছেলে না হ'লে বোধহয় ত্যাজ্যপুত্র হয় না, কি বলিস? হো-হো করে হাসলে অসীমেন্দু।

বললাম, অনেকটা সত্যি। গরিবের ছেলেরা এমনিই ত্যাজ্য হয়ে থাকে। তারপর প্রশ্ন করলাম, অরুণিমা কি কাছেই থাকে নাকি?

—হ্যাঁ, দুটো বাড়ি পরেই। ঐ তো জুটিয়ে দিয়েছে ঘরটা। মান্থলি রেণ্ট থার্টি চীপ্‌স্। তারপর তোর কি খবর বল।

বললাম। মহুয়ামিলন, চুনের কারখানা, অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারি।

—আর পারছি না। দীর্ঘশ্বাস ফেললে অসীমেন্দু। বললে, অরুণিকে বাদ দিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ বল্?

—বাদ দিতে বলছে কে?

অসীমেন্দুর মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়লো।—খেলাটা আমার নেশা তাই ছাড়তে পারি না। তাও চাঁদাটা ওর কাছে হাত পেতে নিতে হয়।

বললাম, খেলোয়াড়রা তো চেষ্টা করলেই চাকরি পায়, নে না একটা জোগাড় করে। তা হ'লেই তো সব সমস্যা মিটে যায়।

চুপ করে রইলো ও। উত্তর দিলো না। সিগারেটের শেষটুকু চায়ের পেয়ালায় ফেলে দিয়ে আবার র‍্যাকেটে স্ট্রিং টানতে শুরু করলো। অনেকক্ষণ কোন কথা বললো না।

তারপর হঠাৎ যেন ব্যর্থতায় ভেঙে পড়লো ও।—লেখাপড়াটাও যদি করতাম তখন। চেষ্টা কি কম করেছি সুনীত, কিন্তু সবাই সার্টিফিকেট দেখতে চায়।

মনে পড়লো। সত্যিই, ছেলে তো খারাপ ছিলো না অসীমেন্দু, কিন্তু ওর সারা মন জুড়ে যে তখন শুধু অরুণিমা। শুধু কি ওর? আমারও মনে তখন অরুণিমার নাম গানের কলি হয়ে বাজছে বারবার। অরুণিমা নেশা ধরাতো আমার মনে, ওর কাছে অরুণিমা ছিল জীবন।

এই তো ভালবাসা, একেই তো প্রেম বলে। অরুণিমার জন্যে সমস্ত

ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে অসীমেন্দু, বঞ্চিত হয়েছে তার উত্তরাধিকার থেকে, বেছে নিয়েছে দারিদ্র্যের পথ, হতাশার পথ। তবু ওদের ভালবাসায় ভাঙন ধরেনি, বরং নতুন জীবন পেয়েছে।

আর আমি? ভুলেই গিয়েছি অরুণিমাকে। হয়তো!

অরুণিমা! আমাদের হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মেয়ে অরুণিমা সান্যাল!

চতুর্দিকে হোস্টেলের চোদ্দটা ওয়ার্ড, মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা সবুজ মাঠ। খেলাধুলোয় প্রতিটি অপরাহ্ন মুখর হয়ে উঠতো। খেলতো আর ক'জন, কিন্তু দেখতো সকলেই। দোতলা আর তেতলার বারান্দার রেলিং খালি থাকতো না, দু'শো নব্বই জন বোর্ডারের অধিকাংশই এসে জড়ো হতো বিকেল না হতেই। আরও একজন, হোস্টেলের পশ্চিম পাখনায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রফেসার সান্যালের মেয়ে অরুণিমাও এসে দাঁড়াতো দোতলার বারান্দায়। দুশো নব্বই জন বোর্ডারের নিঃসঙ্গ জ্বালায় একমাত্র শিশিরবৃষ্টি।

আমি আর অসীমেন্দু যে কোন একটা ছুতো পেলেই গিয়ে দেখা করতাম অরুণিমার সঙ্গে। যেমন করে হোক্, দুটো কথা বলতে, বলাতে। হাসাতে চাইতাম ওকে, ওর হাসি দেখবার জন্যে।

কোনদিন হয়তো ছুঁচসুতো চাইতে গেছি আমি, অসীমেন্দু পরের দিনই গিয়েছেঃ সার্টের বোতামটা লাগাতে পারছি না, লাগিয়ে দেবে অরুণিমা? বয়স অরুণিমার তখন কমই, আমাদের অপারদর্শিতায় হেসে লুটিয়ে পড়তো ও। প্রফেসর সান্যালের কাছে টেনে নিয়ে যেত আমাদের।

—তোমার ছাত্তরদের কাণ্ড দেখো বাপী, শার্টের হাতায় কোটের বোতাম লাগিয়েছে।

ওতো আর বুঝতো না, সবই আমাদের ইচ্ছাকৃত। এমনি করে আলাপ গড়ে উঠেছিল, অরুণিমাকে একটার পর একটা কাজ করে দেয়ার সুযোগ দিয়ে আর অরুণিমার ছোট্ট ভাইটিকে আদর করে। তখন আমরা দু'জন দু'জনের বন্ধু। তারপর নিজেদেরই অজ্ঞাতে কখন থেকে যেন আবার পরস্পরকে ঈর্ষা করতে শুরু করলাম। খেলা খেলা ভাব কখন যেন জীবনের মেখলা হয়ে দেখা দিলো। আমরা পরস্পরকে এড়িয়ে অরুণিমার সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলাম। আমার যখন একখানা পোস্টকার্ডের জরুরী দরকার পড়তো, অসীমেন্দুর তখন কিছুতেই টিংচার আইওডিনের দরকার হ'ত না। অসীমেন্দু যখন কলেজ স্ট্রীটে কেনা আমের ঝুড়িটা বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে বলে প্রফেসর সান্যালকে দিতে যেত, আমার পোকায় কাটা সার্জের শার্টে রিপু করার কথা কিছুতেই মনে পড়তো না সে সময়। এমনি করে একজন আরেকজনকে এড়িয়ে অরুণিমার মনের প্রবেশপথ খুঁজে চলেছিল। আর, কেন, কেমন করে জানি না, আমরা দু'জনেই নিজের নিজের মনে ভাবতাম, অরুণিমার প্রেমের ছোঁয়া পেয়েছি আমি, প্রীতির ছোঁয়া পেয়েছে অন্যজন। অথচ হাবভাব চলনে বলনে এতটুকু পার্থক্য আছে বলে মনে হ'ত না।

ভাবতাম, এর চেয়ে মিষ্টি করে চোখের তারা নাচিয়ে কি অরুণিমা

হাসতে পারে, এমন গানের মত গলায় সুরের মত কণ্ঠস্বরে আরো বেশী আন্তরিকতা ঢেলে কি অরুণিমা কথা কয় অসীমেন্দুর সঙ্গে? ওর কাছেও কি এমন কারণে অকারণে শরীর নাচায় অরুণিমা? ঠিক, এতখানি সারল্যের ভান করে কি অসীমেন্দুরও হাত চেপে ধরে ও, অসীমেন্দু যখন ফুটবল ম্যাচের রীলে শুনতে শুনতে কাগজের গ্রাফে বল্‌টা কখন কোথায় দেখিয়ে দেয়, তখনও কি অরুণিমা এমনিভাবেই চেয়ারের কাঁধ ডিঙিয়ে অসীমেন্দুর কাঁধে নরম শরীরের ভর দেয়?

এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে হতে ক্রমশ ধৈর্য হারালাম আমি। একদিন, কি বলেছিলাম মনে নেই, কেমন করে বলেছিলাম ভাবতেও লজ্জা হয় আজ। পাগলের মত হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ওর সামনে, আচমকা ওকে কাছে টেনে নিয়ে অনর্গল উচ্ছ্বাসে কত কি বলেছিলাম। অনেক অনেক রাতা-জাগা স্বপ্নের শানানো বানানো কথা নয়, স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের কথা। প্রেম। ভালবাসা যেন!

আর, আর অরুণিমা সে কথা শুনে খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়েছিল। বলেছিল, পাগল হয়ে গেছ নাকি সুনীতদা? যাও মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল ঢেলে এসো।

ওর প্রত্যাখ্যান, ওর বাঁকা হাসির বিদ্রূপ হয়তো সহ্য হতো, কিন্তু, কিন্তু অসীমেন্দুর কানেও আমার লজ্জার খবর, আমার পরাজয়ের কাহিনী ও যখন পৌঁছে দিল তখন আর ক্ষমা করতে পারলাম না।

ঠাস ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম অরুণিমার গালে। চোখের জলে আক্রোশের অভিশাপ ঢেলে বলেছিলামঃ এতদিন যে নাটুকেপনা করে এসেছো তাতেই খুশী হওনি, আমার দুর্বলতায় নিজে হেসেই সন্তুষ্ট হওনি, সকলের চোখে আমাকে হাস্যাস্পদ করে তুলতে চেয়েছো। কিন্তু মনে রেখো অরুণিমা, এর প্রতিশোধ একদিন আমি নেবই, তোমার অবস্থা দেখেও একদিন প্রাণ খুলে হাসবো আমি।

ঠিক এই কথাই হয়তো নয়, কিন্তু এই ধরনেরই কথা, আরো অভদ্র শব্দের মারফত ওকে শুনিয়েছিলাম সেদিন। আর মনে মনে ভেবেছিলাম, মেয়েরা কত হৃদয়হীন, কত নৃশংস; ওরা যে-প্রেমিককে ভালবাসে তাকেই 'হিরো' ভাবে, আর যে-প্রেমিক ভালবাসা পায় না, ওদের চোখে সেই হয় সার্কাসের ক্লাউন। অথচ, দু'জনেই তো সমান ভালবাসে, দু'জনের প্রেমই তো সমান নিখাদ!

আশ্চর্য! সময় সব কিছুই ধুয়ে মুছে দিতে পারে। স্লেটে লেখা নামের মত সব স্মৃতি, সব অভিমান সময়ের জলে মুছে গেল একদিন। অসীমেন্দুকে বললাম, ভুল করেছিলাম, মাফ করিস তুই। অরুণিমাকে বললাম, দোষ তোমার নয়, অপরাধ আমার নির্বুদ্ধিতার। শুধু কি তাই? নতুন কেনা ক্যামেরায় ওদের দু'জনের একটি ছবি তুলে দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলাম।

সেই অরুণিমা আর অসীমেন্দুর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। এক বছর বাদে বিস্মৃতির সুতোয় সুর বেজেছিল নতুন করে।

তারপর, যাবার দিন অসীমেন্দু চুপি চুপি বললে, অরুণিকে বলিস না যেন, তোকে আমার এই বিপদের সময় ডেকেছি কেন!

—কেন ডেকেছিস তা তো বুঝলাম না এখনো। বললাম আমি।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও আমার কথা শুনে। বললে, লাইম ফ্যাক্টরীর অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার তুই। তোর এখন কত প্রতিপত্তি, একটা ব্যবস্থা তুই করে দে সুনীত।

জবাব দিতে পারলাম না আমি, চুপ করে রইলাম।

অসীমেন্দু বললে, যে কোন একটা চাকরি, তুই চেষ্টা করলেই হবে, আমি ঠিক জানি। আমাকে শুধু এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে দে সুনীত। আমি আর অরুণি, যেমন করে হোক্ চালিয়ে নেব, শুধু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের উপহাস থেকে আমাকে বাঁচা তুই।

উপহাস! অদ্ভুত শোনালো কথাটা। প্রেমের ব্যর্থতাই তা হলে সবচেয়ে বড়ো লজ্জা নয়? এর চেয়েও বড়ো লজ্জা, বড়ো দুঃখ আছে? অর্থাভাব কি তা হ'লে আরো গভীর বিদ্রূপ!

বললাম, ভাবিস না তুই। আমি আছি, আমি এখনো তোর বন্ধু!

আশ্বস্ত বোধ করলো যেন অসীমেন্দু, আমার কথায়। একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাসে সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে বললে, অরুণিমার জন্যে আমি সব কিছু হারিয়েছি, হারাতে রাজি আছি। কিন্তু অরুণিমার কাছে আমি যেন হেরে না যাই।

অরুণিমা আর অসীমেন্দু যখন ট্রেনে তুলে দিতে এলো, তখনও আশ্বাস দিয়েছিলাম অসীমেন্দুকে।

আর হাসতে হাসতে বলেছিলাম, আবার দেখা হবে অরুণিমা।

তিক্ত ব্যথিত মুখে অরুণিমা বলেছিল, কে জানে সুনীতদা। হয়তো দেখা নাও হতে পারে আর।

তবু, আমার মন বলেছিল, দেখা হবে, আবার দেখা হবে অরুণিমার সঙ্গে।

লাপরার লাইম হিল্-এ সেদিনও খবরদারি ঘণ্টি বেজে উঠবে, বরকাকানার লোক্যাল এসে দাঁড়াবে মহুয়ামিলন স্টেশনে। জান্কী ডাব্বাকে পাশ কাটিয়ে, রাধাকিষেণের মন্দির পার হয়ে, সুরকির রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা হলদে মহুয়া মাড়িয়ে, আমলকী পাতার ঝিকিমিকি ছায়ায়, পাগলা-মেম মেরী ওয়াটসনের বাংলোর বাগানের মাঝ দিয়ে, কুণ্টিকড়ুয়া টিলা পাহাড়ী সড়ক ধরে টিংলিটুডাং ল্যাক ফরেস্টের ইজারাদার লালাবাবুর নতুন করে কলি ফেরানো বাড়িতে এসে উঠবে অরুণিমা, আর অরুণিমার হাওয়াই শার্ট, কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, ক্রেপ সোলের জুতো, চোখে মোটা ফ্রেমের সানগ্লাস পরা ফাঁপালো চেহারার আয়েশী স্বামী।

তারপর একদিন অরুণিমার তিন বছরের ফুটফুটে ছোট্ট খোকাকে কোলে নিয়ে শান্ত বিকেলের ছায়া-থম্-থম্ তিতিরকান্নার মাঠ পার হয়ে চুনাক্কা নদীর জলসিঁড়ির ধারে এসে বসবো আমরা, আমি আর অরুণিমা।

পাশাপাশি চুপ করে বসে থাকবো দু'জনে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলবো না আমরা।

কিন্তু সে অসহ্য নীরবতা ভাঙবার জন্যে আমাকে এক সময় বলতেই হবে, এমন কেন হ'ল অরুণিমা।

—থাক্ সুনীতদা ওসব কথা। অরুণিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে।

থাক্ বললেই কি রাখা যায়? আমি বলবো, তোমাকে সুখী দেখতে চেয়েছিলাম অরুণিমা!

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠবে ও, বলবে, আমি অসুখী এমন ধারণা কেন তোমার? বরং অসুখী হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছি আমি।

চমকে চোখ ফেরাবো ওর দিকে, ভাববো, অরুণিমার এ হাসি কি সত্যি না কাপট্যের প্রলেপ!

—অসীমেন্দুর অনুরোধ নয়, তোমাকে সুখী দেখবার জন্যেই বড়ো সাহেবকে বলে ওর চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আর অসীমও চাকরি নিয়েছিল নিজের সুখের জন্যে নয়, তোমাকে সুখী করবার জন্যে, অরুণিমা। তুমি জানো না, ও তোমাকে কত ভালবাসতো!

—জানি। ঠোঁট কাঁপিয়ে হাসবে অরুণিমা।

—তুমি হাসছো অরুণিমা, কিন্তু—অদূরের লাইম হিল্টার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি বলবো, ঐ পাহাড়টার দিকে যতবার তাকাই ততবারই অসীমেন্দুর জন্য দুঃখ হয় আমার।

চমকে চোখ তুলে পাহাড়টার দিকে তাকাবে অরুণিমা, আর আমি ওর চোখের কোণে সহজ সহানুভূতি খুঁজবো।

বলবো, তোমার কি ধারণা ও অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে?

—অ্যাকসিডেণ্ট নয়? বিস্ময়ের কণ্ঠে ও প্রশ্ন করবে।—তুমি তো বলেছিলে অ্যাকসিডেণ্ট। অ্যাকসিডেণ্ট নয়?

—না অরুণিমা। ফ্যাক্টরীর খাতায় আর পুলিস রেকর্ডে যাই লেখা থাক, আমি জানি অসীমেন্দু অ্যাকসিডেণ্টে মারা যায়নি।

—তবে? এবার যেন অরুণিমার চোখের কোণ চক্‌চক্ করে উঠবে শেষ বিকেলের রক্তিম আলোয়।

যে কথা কোনদিন কাউকে জানাবো না ভেবেছিলাম, যে কথা অরুণিমার কানে কোনদিন পৌঁছতে দেব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে গোপন রহস্যের চাবি খুলে দিতে বাধ্য হবো আমি।

বলবো, চাকরিতে যোগ দিয়েই কত স্বপ্ন যে ও দেখতে শুরু করেছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা দু'জনে মিলে ওর বাসা সাজাতাম। তোমার পছন্দ মত আসবাব তৈরি করিয়ে ঘর সাজাতো ও, বিছানার চাদর, জানালার পর্দা সব কিছুর রঙ বাছতো তোমার পছন্দ মতো। সামনের বাগানে ফুলের চারা বসিয়েছিল, যে ফুল তুমি খোঁপায় পরতে ভালবাসতে।

আমার প্রত্যেকটি কথা ও শুনবে সজাগ কান পেতে, অথচ চেয়ে থাকবে অন্যদিকে অন্যমনস্কতার ভান করে। তারপর এক সময় আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আঁচলে মুখ মুছবে। কিন্তু মুখ তো নয়, চোখের ওপরই সে আঁচল থমকে দাঁড়াবে অনেকক্ষণ।

ওকে মন হাল্কা করার একটু সময় দিয়ে আমি বলবো, তারপর চিঠিতে জানিয়েছিলো ও তোমাকে, লিখেছিলো; কবে আসছো, ফুলের চারায় জল দেবার ভার কবে থেকে তোমার ওপর পড়বে। লিখেছিলোঃ সুনীতকে তুমি ভুল বুঝেছিলে অরুণি, সুনীতই আমাদের নতুন জীবনের প্রথম ঘর বেঁধে দিলো।

এ কথায় অরুণি চোখ তুলবে না, দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ লুকোবে।

আমি বলবো, তারপর হঠাৎ একদিন ও চলে গেল, তোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে। বলে গেল, সানাই বাজাবার ব্যবস্থা করে রাখ। মা ওর হাতে টাকা দিয়ে বললেন, বেনারসী শাড়ি কিনে বৌমাকে পরিয়ে নিয়ে এসো অসীম, তোমার মা যেমন করে বরণ করে ঘরে তুলতো তাকে, আমিও তাকে তেমনি করেই ঘরে আনবো।

আমার কথা অসহ্য মনে হবে অরুণিমার, কান্নায় হঠাৎ ভেঙে পড়বে ও, বলবে, থাক্, সুনীতদা ওসব কথা, আমি শুনতে চাই না।

—কিন্তু আমি যে শুনতে চাই। আমি বলবো। জিজ্ঞেস করবো, সাতদিন পরে স্টেশনে আনতে গেলাম যেদিন, সেদিন অসীমেন্দু একা একা ফিরে এলো কেন, এত আশা করেও তোমাকে কেন খুঁজে পেলাম না ওর পাশে, একথা আমি শুনতে চাই অরুণিমা।

অরুণিমা বলবে, হ্যাঁ, আমারই দোষ, সমস্ত অপরাধ আমার, কিন্তু ক্ষমা করো সুনীতদা, যা গেছে তা যাক্, সে কথা আর শুনিয়ো না আমাকে।

তবু না শুনিয়ে থাকতে পারবো না আমি। বলবো, শুধু কি আমি? মা কতবার প্রশ্ন করেছিলো, কতবার জানতে চেয়েছিলো, কিন্তু কোনদিন একটা কথাও বলেনি অসীমেন্দু। তারপর তোমার সেই পরিচিত হাতের ঠিকানা লেখা চিঠি এলো, সে চিঠি সেই প্রথম এবং শেষ চিঠি যা অসীমেন্দু আমাকে কোনদিন দেখায়নি, পড়তে দেয়নি।

আমি আশা করবো, এর পরই হয়তো অরুণিমা সত্যিকার ইতিহাসটুকু জানবার জন্যে আগ্রহ দেখাবে, ব্যাকুল হয়ে উঠবে অসীমেন্দুর কথা শোনবার জন্যে। কিন্তু কোন ঔৎসুক্যই ফুটবে না ওর মুখে চোখে, কোন ব্যাকুল বিষণ্ণতা চোখে পড়বে না আমার। ঘৃণায় আক্রোশে সমস্ত শরীর জ্বলে উঠবে আমার, আর একটা কথাও বলবো না আমি। কিন্তু, মনে পড়বে, মনে পড়বে অসীমেন্দুকে।

ডিনামাইট ফাটিয়ে চুনের চাঙড় খসাবার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে সাবধানী ঘণ্টি বেজে ওঠে, বেজে উঠেছিল। আর এ ঘণ্টি যে কোন জংলী দেহাতীও চেনে। তা ছাড়া, অসীমেন্দুর তো সেদিন ডিউটি ছিল অন্য সার্কেলে। থ্রি ফর্টির সার্কেলে সেদিন সে সময়ে যাওয়ার তো কোন প্রয়োজনই ছিল না অসীমেন্দুর! তবু, কারখানার খাতায় লেখা হয়েছিল অ্যাকসিডেণ্ট। পুলিশের রেকর্ডেও। কিন্তু সাব-ইন্সপেক্টর পাণ্ডে বলে গিয়েছিল, অ্যাকসিডেণ্ট নয় সুনীতবাবু, সুইসাইড। অর্ণিমা সানিয়েল বলে জানপয়ছান কেউ আছে আপনার? তার লেখা চিঠি ছিলো ওভার-সিয়ারবাবুর পকেটে।

কিন্তু সে-কথা বলবো না আমি অরুণিমাকে। বলতে ইচ্ছে হবে না

আমার। জীবনে যে সবকিছুই পেয়েছিল, সবকিছুই যে হারিয়েছিল এই সামান্য একটি মেয়েকে ভালবেসে, তার কাছ থেকে মৃত্যুর পরে কি দু' ফোঁটা অশ্রুর বেশী কিছু পাওনা নেই তার? আশ্চর্য মেয়েদের মন! মনে হবে, অদ্ভুত মেয়ে এই অরুণিমা!

শুকনো গলায় আমি বলবো, চলো অরুণিমা, ফেরা যাক্, সন্ধ্যে হয়ে এলো।

অরুণিমা তবু উঠবে না, তারপর হঠাৎ ও আমার হাত চেপে ধরবে। বলবে, জানি সুনীতদা জানি. অ্যাকসিডেণ্ট নয়, আত্মহত্যা করেছিল ও। সশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়বে ও।

তিন বছরের ফুটফুটে খোকাও কেঁদে উঠবে ওর মায়ের কান্না দেখে। খোকাকে বুকে চেপে ধরে অরুণিমা শুধু কাঁদবে আর কাঁদবে।

অরুণিমার কান্না থামাবার জন্যে খোকা চুপ করবে, খিল্ খিল্ করে হেসে উঠবে, বলবে, মা পাখি, মা পাখি। উড়ন্ত পাখির ঝাঁকের দিকে আঙুল দেখাবে খোকা আর তাকে বুকের কাছে আরো চেপে ধরবে অরুণিমা।

তারপর সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ধীরে ধীরে টিংলিটুডাঙের পথ ধরবো আমরা, আর অনেকক্ষণ নিশ্চুপ পাশাপাশি হেঁটে আসার পর অরুণিমা ফিস্ ফিস্ করে বলবে. মেয়েরা যাকে প্রত্যাখ্যান করে তারই দয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে বড়ো লজ্জা যে তাদের নেই সুনীতদা।

আর আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠবে সেই মুহূর্তে। মনে হবে, আত্ম-হত্যা নয়, অ্যাকসিডেণ্ট নয়, অসীমেন্দুকে হত্যা করেছি, হত্যা করেছি আমি।

স্তব্ধ নিঃশব্দ আমলকীর বনের ছায়ায় সন্ধ্যার বাঁকা চাঁদের বিষণ্ণ উঁকি ঝুঁকি চোখে পড়বে না আমার. অদূরের লাইম হিল্ অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে, মহুয়া শাখার কোন পাখির পাখা ঝটপটানি কানে আসবে না। যতদূর দৃষ্টি যাবে. শুধু তিতিরকান্নার মাঠ কান্নায় থম থম করবে। মনে হবে, দিনের সশব্দ ব্যস্ততায়, মুখর কলকাকলির পৃথিবীতে বুনো তিতিরের কান্না চাপা পড়ে থাকে, কিন্তু স্বামীর উজ্জ্বল সোহাগের আড়ালে, ফুটফুটে একটি ছোট্ট শিশুর হাসি-আদরের নীচে, আনন্দ আর উদ্দাম প্রগলভতার অন্তরে একটি ব্যর্থ পরাজিত তিতির শুধুই কাঁদছে, সারাদিন সারারাত নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে।

মনে পড়বে অরুণিমার কথা।—এখানে এলাম কেন, যদি শরীরই ভালো থাকবে সুনীতদা।

এই আনন্দের অভিনয়. খুশিয়াল আলোক-কণিকা ক্রমশ মিলিয়ে যাবে ওর মুখ থেকে, ক্লান্ত পাণ্ডুর ঘামে ভেজা একটি সুন্দর রোগশীর্ণ শরীর ক্রমশ বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাবে, বিছানার সাদা চাদরের রিক্ততায় একদিন অরুণিমার শীর্ণ রোগজীর্ণ দেহ ঢাকা পড়বে, অসীমেন্দুর বসানো সেই ফুলের চারায় দোপাটী আর রজনীগন্ধা ফুটবে, সেই ফুল এনে অরুণিমাকে নতুন করে সাজিয়ে দেব আমি, আর হাওয়াই শার্টের, কর্ডুরয়ের ট্রাউজারের, মোটা ফ্রেমের চশমা-চোখের মনের খাতায় লেখা হবেঃ অসুখঃ টি বি।

কিন্তু, আমি জানবো, মৃত্যু নয়, আত্মনিঃশেষ।

বা বু ই

ওপোর্টোর সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা পোর্ট গোয়া।

এদিকে কাম-বে, ওদিকে মান্নার উপসাগর। উত্তরে কঙ্কণ আর দক্ষিণের মালাবার কোস্ট লাইন এসে মিশেছে এখানে। পশ্চিমের ঢেউ এসে পড়ে জাহাজঘাটায়, সিগন্যাল টাওয়ারের সার্চলাইটের জ্যোছনায় এক হয়ে মিশে যায় আরব সমুদ্রের ফেনিল শুভ্রতা।

গোয়ার এই বন্দরে এসে নোঙর ফেলতে হ'ল অক্ষয়কে।

বনের মধ্যে শিকারী আর গ্রামের বুকে বনচর—উভয়েরই দুঃসাহসের তুলনা নেই। স্বদেশ থেকে সুদূরে এসে ভিন্-সমাজ আর ভিন্-রুচি গোয়ানিজদের মধ্যে যেদিন বাসা বাঁধলে অক্ষয়, সেদিন ওর মনের চারপাশেও ঘিরেছিলো এমনি এক দুর্জয় নির্ভয়তার বর্ম।

শিশুবোধ ভূগোল আর মানচিত্রের দৌলতে ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নামে যে দীর্ঘ ঋজু রেখাটির সঙ্গে পরিচয় ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ, যার সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল অস্পষ্ট, তারই মাঝে সাগরচুম্বী বন্দরের কন্দরে এসে হাজির হ'ল সে। উপার্জনের আশায় বাঁধলে সান্ত্বনার নীড়। আত্মীয় আর বন্ধুর অভাব বোধ করলে না। শান্তি আর স্বস্তি তো মিলেছে! মিলেছে দু'শো টাকা মাইনের নিশ্চয়তা। কোলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেও যা তার বরাতে জুটতো না কোনদিন।

—ঢের ভালো। কপালে খয়েরের টিপ আঁকতে আঁকতে নীলিমা বললে, কোলকাতার এঁদো গলির চেয়ে এ ঢের ভালো।

বেণীর বাঁধন থেকে চুলগুলোকে মুক্তি দিয়ে মাথায় চিরুণি টানতে টানতে অণি বললে, ভালো না আরো কিছু! যাই বল্, এর চেয়ে তোর শ্বশুরবাড়ির বাসুন্দি গাঁ অনেক ভালো লাগে আমার।

শিবু মন্তব্য করে, মাসিমার শুধু বাসুন্দি আর বাসুন্দি। আমার কিন্তু সমুদ্দুর দেখতে—

—ছ নম্বরের কোয়ার্টার শুধু চারজন পেয়েছে, তার মধ্যে আমি একজন। আত্মগর্বের উচ্ছ্বাস অক্ষয়ের কথায়।

এবং কথাটাও মিথ্যে নয়। পোর্ট ব্যারাকের ওপাশে বাবু লাইনের এক প্রান্তে মাঝারি সাইজের একটি ছোট বাংলো পেয়েছে অক্ষয়। কাঠের জাফরি দিয়ে ঘিরেছে সামনের ছোট বারান্দাটা, বাঁশের বাতা দিয়ে বাগান। পড়শির মুর্গী এসে না জ্বালাতন করে, পুঁইশাকের কচি ডগায় না শুয়োরে মুখ দেয়।

পরিচ্ছন্ন পাড়াটাকে নোংরা করেছে বাসিন্দারাই। একটু যদি চেষ্টা করে, একটু চোখ রাখে তো ঝকঝকে হয়ে উঠবে। সারি বেঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লাল কাঁকরের রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে একই টাইপের কোয়ার্টার। ইঁটের উলঙ্গ দেয়াল, পয়েন্টিংয়ের নির্ভুল ছক আর টালির

ছাদ। পথের দু'পাশে কণ্টকী লতার ঘননিবিষ্ট রেখা একজোড়া, দূর দিগন্তে মিশে গেছে। সমান্তরাল রেল লাইনের মত। মসীলিপ্ত জামিয়ারের মত শুধু এখানে ওখানে জমা হয় জঞ্জাল। কপির পাতা, পেঁয়াজের খোসা, মাছের আঁশ। গৃহবরাহের উৎপাতে ছত্রাকার হতে সময় লাগে না।

অণি মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বলে, ভদ্রলোকে এ পাড়ায় থাকতে পারে না।

অক্ষয় পরমাত্মীয়ার প্রতি কটাক্ষ করে বলে, পাশের বাড়ির একটি সুদর্শন চেহারার বাঙালী ভদ্রলোক থাকলে অণিমা দেবীর চোখে এইটেই হত ভদ্রপাড়া, নয় কি?

কপট বিতৃষ্ণায় ঠোঁট ওল্টায় অণি।—মাগো!......বাঙালীই হোক আর কাঙালীই হোক, এখানে যে বাস করে তাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

নীলিমা মৃদু হেসে বলেঃ যাই বলিস, বাসাটা মন্দ নয়, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেই হবে।

অতএব, ঘর সাজানোর চেষ্টা চলে।

কাগজকলম নিয়ে হিসেব কষে অক্ষয়। দু'খানা ডবল-বেড পালঙ্ক—মেহগনি কাঠ, এখানে জলের দরে পাওয়া যায়। গোটা কয়েক কেদারা, অণিমার জন্যে একটা বুককেস আর শিবুর পড়ার টেবিল।

টাকার অঙ্কটা ফেঁপে ওঠে। যাক, এখনকার মত শাল-সেগুনের পুরনো আসবাবেই চলবে। একটু দেখেশুনে সাজিয়ে নিলেই হবে।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে অণি আর নীলা দু'জনে দাঁড়ায় দু কোণে। হাত দু'খানা পিছনে রেখে তন্ন তন্ন করে দেখে ঘরের প্রতিটি সামগ্রী। সৌন্দর্যের অপঘাত হয়েছে কিনা কোথাও।

না। বাইরের দিকের জানালাটায় রঙিন পর্দা দেওয়া চলবে না। বাড়িতে মেয়েছেলে আছে বোঝা যাবে। সাদা পর্দাই ওখানে থাকবে। দু'বোন চোখোচোখি করে হাসে।

না। তেপায়াটার ওপর ফুলদানিটা রাখা চলবে না, পেয়ালা পীরিচের জায়গা থাকে না। অক্ষয়ও সায় দেয়।

আপিস থেকে ফিরে অক্ষয় দেখে জানালায় এসেছে গোলাপী পর্দা, টিপয়ে ফুলদানি।

বলে, তোমাদের কি রোজ এগুলো অদল-বদল করতে ভালো লাগে?

নীলিমা হেসে বলে, সময় কাটাতে হবে তো।

সময় আপনি কেটে চলে। দিনের পর দিন। সংসারের কাজ আর স্বপ্ন-সৃজনের মধ্যে দিয়ে ওদের দিনগুলো কেটে যায়। মিশনারী ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে শিবু, তাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে পায় অফুরন্ত বিশ্রাম। মাদ্রাজী পরিবারের সঙ্গে গল্পগুঞ্জনে করে অবসন্ন অবসর যাপন। সরস্বতী আর মাদুরামী দেশ আর দেহাতের কথা কয়ে নির্জন দুপুরকে করে আনে ছোটো। গোয়ানিজ মেয়েরাও আসে। লিজা, মারিয়া, আনা। বৈকালিক ভ্রমণের সময়, পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে যাবার সময় শুভসংবাদ দিয়ে যায়, নিয়ে যায়।

বিদেশে এসে সকল সঙ্কীর্ণতা ভুলে গেছে নীলিমা। তামিলতনয়া

আর ক্রিশ্চান গোয়াবাসিনী উভয়ের কেউই অস্পৃশ্য নয় আর। নিজেকে এতদিনে সুখী বোধ করছে নীলিমা। বর্তমানের বৈশিষ্ট্য আর ভবিষ্যতের ভরসা ওর চোখে। দৃষ্টির দূরত্বে রঙিন রামধনুকের বর্ণাভা। একটি ছোট শিশু—সবল আর সুস্থ। ক্রোড়ত্যাগী শিবুর পরিবর্তে আরেকটি সন্তানের কামনা উঁকি মারে নীলিমার মনে। জানালার পর্দা সরিয়ে নিঃসীম আকাশের কোলে শঙ্খচিলের চংক্রমণ দেখে সে।। চিন্তার চোখে উদাস তৃপ্তি।

অণিমাও সুখসুপ্ত। স্বপ্ননীল খুশি-খেয়ালের মধ্যে ওরও দিন কাটে। শ্রমশ্রান্ত কমনীয়তা আঁকে লুপ্তলাবণ্যের রেখা, ওর বাঁকা ভুরুর প্রান্তে। ক্রমশ যেন সজীব হয়ে ওঠে। শুধু হঠাৎ হয়তো কোনদিন হাতের উল আর কাঁটা থেকে মন ছুটে যায় অনেক দূরে, মুক্ত বাতায়ন ফেলে ছুটে যায় অনেক পিছনে। ব্যাথানম্র স্মৃতির নিপীড়নে হয়তো বা কখনো সজল হয়ে আসে চোখ। দূর শহর কোলকাতার একটি অন্ধ গলির ভেতর ওর ব্যর্থবেদনা গুমরে মরে।

তিনটি বছর ধরে ওরা পরস্পর চোখের ভাষায় অনেক অনেক দিনান্ত আর দ্বিপ্রহর কাটিয়ে এসেছে নির্বাক আলাপে। ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ইঙ্গিতে আর অনুভবে। দীর্ঘ তিনটি বছরের ফাঁকে একটি মুহূর্তেও পায়নি নিকটবিশ্রম্ভের দুঃসাহস। স্বল্পধারা স্রোতের মত তা মাঝপথেই শুকিয়ে গেছে। কিন্তু বাতাসে এখনো তার স্মৃতিটুকু বাষ্প হয়ে দুলতে থাকে, ক্ষণে ক্ষণে বুকফাটা বৈরাগ্যের সূর্যালোকে আকাশে দেখা দেয় রঙ্ ঝলমল অভিরাগের মরীচিকা।

অক্ষয় সত্যিকারের পুরুষ। বর্তমানকে শু জেনেছে সত্য বলে, ভবিষ্যৎ ওর কাছে প্রয়োজনীয়। অতীতকে তাই অক্ষয় ছেঁটে ফেলতে পেরেছে। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে ওর আশি টাকা মাইনের আহত গৌরব। সাফল্যের ফসল তাই নতুন মানুষ করে গড়ে তুলছে ওকে। তবু কখনো-সখনো হয়তো বাসুন্দি গ্রামের নির্জন নদীর তটে আপন পদধ্বনি শুনতে পায়, শৃঙ্গারনটীর দূর নূপুর-নিক্কণের মত বেজে ওঠে কর্ণবতীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের চূর্ণ শব্দ। গ্রন্থি বেঁধে বেঁধে পিছনের ইতিহাস খুঁজে বের করার সময় পায় না।

নতুন বন্ধুর আগমন ঘটে।

কোলাস। গোয়ার বন্দর আপিসে ওরা সহকর্মী। অক্ষয় আর কোলাস। অটলায়তন দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সামর্থ্যের প্রকাশ প্রতিটি অঙ্গে। গলায় লাল রেশমের স্কার্ফ। গোলাপী কামিজের আস্তিন গোটানো থাকে সর্বদা। জাতে গোয়ানিজ, আচারে মাদ্রাজী, মণিবন্ধে কালো ফিতেয় বাধাঁ একটা রুপোর ক্রস—কিন্তু কথায়-বার্তায় ওর ইসলামের প্রভাব।

বলে, আমার বায়েলের সঙ্গে তোমার বাড়ির মেয়েদের আলাপ করিয়ে দাও।

—একদিন নিয়ে এলেই তো পারো তাকে।

—আচ্ছা, আনবো একদিন। তোমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেবো। দেখবে, তোমাদের বাংলাদেশেও এমন চমৎকার মেয়ে হয় না।

অক্ষয় হেসে বলে, রোজই তো বলো নিয়ে আসবে, নিয়ে এলেই তো প্যারো।

কোলাস কৌতুকের হাসি হেসে বলে, আসতে চায় না। নতুন কোথাও আসতে ইজ্জতে বাধে ওর। কিন্তু, যাই বলো, এমন চমৎকার ব্যবহার, এমন সুন্দর চেহারা মেয়েদের বড়ো একটা থাকে না।

--তা, আপিসের কি খবর বলো।

বিবি থেকে বন্দরে নিয়ে আসতে চায় অক্ষয়। লোকটা বৌ বলতে অজ্ঞান। শুরু করলে আর শেষ করতে চায় না।

অক্ষয়ের কথা শুনেই বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালের সঙ্গে দেখা হ'লো, বললে—

—কালে কে?

হো হো করে হেসে উঠলো কোলাস। —কালেকে চেনো না। লীডার, আমাদের এখানকার পোর্টের বড়ো অফিসার, আর সেই সঙ্গে লেবার ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। চলো, চলো, এখনি আলাপ করিয়ে দেব। অক্ষয়ের হাত ধরে টেনে তুললে সে।

অনন্যোপায় হয়ে কোলাসের সঙ্গে বেরুতে হ'ল অক্ষয়কে। লোকটার এই এক দোষ, রয়ে বসে কাজ করতে জানে না।

বাঁশের ফটকটা বন্ধ করে দিয়ে অক্ষয় জিজ্ঞেস করলে, কালে কি বললে বলছিলে?

—ও হ্যাঁ, ধর্মঘট হতে পারে।

—কেন?

—খোদা জানে।

জানে সে সবই, কিন্তু এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। হাজার হোক, নতুন লোক অক্ষয়। কখন কোন্ দিকে ঢলবে বলা যায় না। গত স্ট্রাইকের পর জয়েন করেছে। ওর মধ্যে ইস্পাত আছে কি না, সে পরীক্ষা তো হয়নি এখনো!

অক্ষয় বললে, চলো কোলাস, একটু ঘুরে আসি। আরো দু'পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

--সে কি! এতদিন হয়ে গেল এখনো আলাপ হয়নি?

—না। তোমাদের ভাষাটাই যে এখনো রপ্ত করতে পারিনি ভালো করে।

—কালে, মুর্তি—এরা তো সব হিন্দুস্থানীতে কথা বলে, আর তা ছাড়া আমার মত হিন্দীও অনেকেই জানে।

—বেশ তো। চলো কালে সাহেবের সঙ্গেই আলাপ করে আসি আজ।

—চলো।

দু'জনে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে শুরু করলো লাল কাঁকরের সড়ক ধরে।

পর্তুগীজদের এই ছোট্ট উপনিবেশটির মাঝে আরও ছোট এই পোর্ট-কলোনী। গুডস্ ট্রেনের মত লম্বা একটানা বাড়ির সারি দু'পাশে। প্রত্যেকটি কোয়ার্টারের সামনে হাত কয়েকের ছোট বাগিচা। উদ্যান নয়,

কীচেন-গার্ডেন। ধনে, শুষনি, পুঁই। রাঙা আলু আর পেঁয়াজের কলি। সব বাড়িতেই দুচারটে বে-আইনি তামাকের গাছ। কাঁচা তামাক চিবিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ এদিকে।

অক্ষয় প্রশ্ন করে, এত তামাক খাও কেন বলোতো তোমরা?

কোলাস সশব্দে হেসে ওঠে,—দোস্ত, একটা কথা মনে রাখবে। আজও বন্দরে যাদের ঝাণ্ডা উড়ছে, তিনশো বছর আগে তারাই প্রথম আমাদের দেশকে তামাক খেতে শিখিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে কালের কোয়ার্টারের সামনে পেঁাছে গেছে ওরা। ডাক শুনেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো কালে। অক্ষয়কে লক্ষ্য না করেই বলতে শুরু করলে, দেখে নিও, এবার দেখে নিও, তোমাদের ঐ ডা এলভাসের ভুঁড়ি না ফাটিয়ে ছাড়বো না।

কপালে রক্তচন্দনের তিলক, কানে মাকড়ি, দেহে বিদেশী পরিচ্ছদ। ঢিলে ট্রাউজারটা টেনে কোমরে তোলবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে কালে বললে, ইণ্ডিয়া ফ্রি হয়ে গেল, আর গোয়া থাকবে পর্তুগীজদের অধীনে? আজ পোর্ট-বিল্ডিংসে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ওড়াবো আমরা। গোয়ার পিপল ক্ষেপে গেছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের আপিস চড়াও করবে তারা।

অক্ষয় হেসে বললে, দেখে তো মনে হচ্ছে পিপলের চেয়ে আপনিই ক্ষেপেছেন বেশী।

অপরিচিত স্বর শুনে চমকে উঠলো কালে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে কোলাসের দিকে।

—ইনি মিস্টার এ কে বোস। বাঙালী। পোর্টের হাওয়া অপিসের ছোটবাবু। কোলাস পরিচয় দিলে।

—বেংগল? বেংগলের লোক আপনি? প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালে কালে। বললে, বাঙালীদের আমি পুজো করি মনে মনে। এমন মানুষ হয় না, এমন আরেকটা প্রভিন্স নেই সারা ইণ্ডিয়ায়।

অক্ষয় বললে, বড়ো বেশী প্রশংসা করছেন আপনি।

—মোটেই না। কালে উত্তর দিলে,—দে মেক্ দি গ্রেটেস্ট পেট্রিয়টস অ্যাণ্ড দি ফিটেস্ট ট্রেটরস। দুদিকেই আপনারা চরম। যাক্, কদ্দিন এসেছেন এখানে? এতদিন দেখি নি তো।

—ছিলাম ইসাবেলা রোডের একটা মেসে। সম্প্রতি বাসা পেয়েছি এ পাড়ায়, ফ্যামিলি নিয়ে এসেছি।

—বেশ করেছেন। আসুন, বসবেন আসুন।

হাত ধ'রে অক্ষয়কে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল কালে।

বললে, মাঠ্যা খাবেন, মাঠ্যা? আমার নিজের গরু আছে, বাড়িতে বানাই।

শীত পড়ার আগেই সোয়েটারটা শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু কিছুতেই যেন কাজে মন লাগে না অণিমার। জানালার পর্দা সরিয়ে

আনমনা তাকিয়ে থাকে। ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে ঝকঝকে মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বড়ো ব্যর্থ আর অসহায় মনে হয় নিজেকে। হাতদুটোয় যেন কোন শক্তি নেই।

অতীত জীবনের দিনগুলি ছায়াছবির মত ভেসে যায়। বাঙালীর ঘরের বাপ-মা হারা মেয়ে হয়েও তৃপ্তির আশ্রয় পেয়েছিল অণিমা। দিদির সযত্ন স্নেহে মানুষ হতে পেরেছে সে। আর—। শহর কোলকাতার সেই অন্ধ গলির অন্ধকারে এক টুকরো ভাঙা চাঁদের আলো।

শূন্যতার শোকেই বোধ হয় সাহস জুটেছিলো সুরজিতের বুকে। বিচ্ছেদের শেষ সায়াহ্নে সেই খুচরো আলাপ। প্রথম প্রহসন। বিদায়-পূর্বের শেষ সাক্ষাৎ।

অণিমা গিয়েছিলো সুরজিতের মা আর বোনের সঙ্গে দেখা করে আসতে। সিঁড়ির পথে হল কথালাপ।

মুহূর্ত কয়েক নিশ্চুপ দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর, সুরজিতের প্রশ্নের রেশ রোমাঞ্চ জাগালো তার মনে।

—ভুলে যাবে না তো?

উত্তর দিতে পারেনি অণিমা। শুধু, লজ্জাতুর আনত দৃষ্টি প্রকাশ করেছিলো তার অন্তরের কথা। না। হোক না নির্বাক, হোক না স্পর্শবিহীন, তবু এই দীর্ঘ দিনেরই চোখের পরিচয়ই কি তুচ্ছ! না, ভুলতে সে পারবে না। ভুলবে না কোনদিন।

কিন্তু।

দীর্ঘ তিনটি বছর যদি স্তব্ধতার মধ্যেই কেটে গেল, কি প্রয়োজন ছিলো শেষদিনের ঐ ছোট কথার দাঁড় টেনে স্নিগ্ধস্রোতের বুকে উন্মাদনার তরঙ্গে বোল ফুটিয়ে তোলার? স্তব্ধ বাতাসকে কেন মুখর করে তোলা?

নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে অতীত রোমন্থন করতে থাকে অণিমা। হঠাৎ কখন অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে ওঠে।

হাতের কাজে মন দেয় আবার।

—ডা এলভাস লোকটার ওপর এরা এত চটা কেন বলো তো?

নীলিমা আর অণি দুজনেই ফিরে তাকায় অক্ষয়ের কথায়। ডিটেকটিভ বইটার ভেতর আঙুল গুঁজে রেখে অক্ষয় একটু চিন্তিত ভাবেই বলে, লোকটাকে আমার তো বেশ ভালোই লাগে!

নীলিমা কৌতুকের হাসি হেসে বলে, তা আর লাগবে না। স্টেশন থেকে নিজে গাড়ি করে নিয়ে আসে, দু'দুবার নেমতন্ন করে রূপসী মেয়ের হাতে কোকো খাওয়ায়, সে লোককে ভালো লাগবে না?

অণিমা ওকোণ থেকে ফোড়ন কাটে, দেখিস দিদি, কপালে শেষকালে না ঐ খ্রীস্টান সতীন জোটে।

ওদের এ নিরর্থক রসিকতা কিন্তু অক্ষয়ের সহ্য হয় না। না, কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যেই কি এলভাসকে পছন্দ হয় তার? তা নয়। শান্তি চায় অক্ষয়, স্বস্তি চায়। তার যাযাবরের জীবনে ডেরা মিলেছে। কোন্ ছোট বয়সে গ্রাম ছেড়েছে অক্ষয়। তারপর, ক্রমাগত চলেছে ঘর-ভাঙা আর

ঘর-গড়ার কাজ। দুদণ্ড নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সময় পায় নি। ঘানির বলদের মত গলার ঘণ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গে আঘাত এসেছে, চলতে হয়েছে তাকে নতুন করে। ক্লান্ত পথচারীর মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে, শুধু মাঝে মাঝে দেখেছে ক্ষণিকের পান্থশালা।

বিশ্রাম চায় অক্ষয়। চায় সকল বিঘ্ন আর ব্যাঘাত থেকে দূরে সরে থাকতে।

প্রথম দিকের একটা দিনের কথা মনে পড়ে যায়।

মিটিরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের টেবিলে মাথা রেখে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলো অক্ষয়। ভাবছিলো, ভাবছিলো অনেক কিছু। ঘরের কথা, দূর জন্মভূমির কথা। নীলিমা, শিবু, মা আর পিসীমা। আর অণি। ইসাবেলা রোডের ক্লেদাক্ত ঘরের বিজন মনের বাসনা, না-নিদ্ নিশীথের একাকিত্বের অভিশাপ।

মচ্‌মচ্ করে জুতোর শব্দ এলো ওর কানে।

মাথা তুললে না। হয়তো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, হয়তো আর কেউ।

ওর পিছনে কে যেন দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষা করছে। পরক্ষণেই, হঠাৎ অনুভব করলে ওর পিঠের ওপর একখানা সহানুভূতির কোমল স্পর্শ।

ফিরে তাকালো অক্ষয়। ডা এলভাস! ডা এলভাস স্বয়ং। সসম্মানে উঠে দাঁড়াতে গেল ও।

—বসো তুমি বসো।

ডা এলভাস পাশের টুলটা টেনে নিয়ে বসলো, কি ভাবছিলে এতো?

অক্ষয় জবাব দিতে পারলে না।

ডা এলভাস মৃদু হেসে বললে, তুমি না পুরুষ মানুষ? ইয়ং ম্যান তুমি, এ ডন্।

অক্ষয় চুপ করে রইলো। মাথা হেঁট করে। যেন তথাগতের বাণী শুনছে কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ডা এলভাস আবার বললে, আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।......আমার মেয়ের নাম রেখেছি টেগাস, কেন জানো? পর্তুগালে টেগাস নদীর ধারে আমার বাড়ি, সেখানেই ওর জন্ম। এখনো আমার মা বাবা স্ত্রী এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েরা পড়ে আছে সেখানে। সব ছেড়ে এতগুলো সমুদ্র পার হয়ে এসেছি।

ডা এলভাসের কথায় যেন একটা আন্তরিকতার করুণ সুর বেজে উঠলো। চমকে চোখ তুলে তাকালে অক্ষয়। বন্দরপতির সুগঠিত দীর্ঘ দেহের দৃঢ়তা আর কাঠিন্য ছাপিয়ে আর একটা দিক নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে হয়তো বা ব্যগ্র। ডা এলভাসের সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়লো অক্ষয়ের বিস্মিত মনের জিজ্ঞাসা।

নিজেকে সামলে নিয়ে ডা এলভাস বললে, ভুলে যেও না, তুমি একজন ডন্। মনের চেয়ে মান বড়ো তোমার কাছে।

সেদিনের সেই ঘটনাটি বড়ো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজ অক্ষয়ের চোখে। দূরস্মৃতির দুঃসহ শোক ছাড়াও আরও কি যেন ছিল ডা এলভাসের কথায়।

কিন্তু।

কালের কথাগুলিও বড়ো বেশী তীব্র।—সারা ইণ্ডিয়া ফ্রি হয়ে গেল, আর আমাদের গোয়া থাকবে পর্তুগীজদের অধীনে? হৃদয়াবেগের হাওয়াই নয়, যুক্তির জাঁকও কম নেই কালের খেদোক্তিতে।

বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে কালিকটরাজ সমরিনের ভুল। দীর্ঘ চারশো বছর আগে কালিকটের অক্ষমতায় ভিত গেড়েছিল লিসবনের লোলুপতা। রাঙা প্রবাল আর রক্তবস্ত্রের লোভে হাত বাড়িয়েছিল ভারতবর্ষ, বিদেশী দস্যু লবঙ্গ আর মরিচ, দারুচিনি আর এলাচের সঙ্গে সঙ্গে চাইলে সাম্রাজ্যের অধিকার। তারপর? তারপর শতবর্ষের ইতিহাস নতুন ধারায় গড়ে উঠলো। জম্বুদ্বীপের কঙ্কাল বেয়ে শবুকগতিতে আনাগোনা করলো হাজারো বিদেশী, রুধিরপায়ী কীটের দল। গোয়ার গরিমায় তৃপ্ত হল লিসবনের লালসা।

তাই কোচিনের কবর স্মরণ করে গির্জার প্রাঙ্গণে ফুলের তোড়া জমা হয় আজও। ২০শে মে তারিখে গোয়ার বন্দরে ওড়ে পর্টুগালের ঝাণ্ডা। পর্তুকেজাকো বাঁওটো। হয়তো ওপোর্টোর সমুদ্রসৈকতেও।

মন ভালো নেই আজ অক্ষয়ের। অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছে। বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে বিভিন্ন চিন্তায়। ভোরের দিকে ঘুমের ফাঁকে দেখেছে বিশ্রী এক স্বপ্ন।

জাফরির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো অক্ষয়। সুঠাম-দেহ একটি গোয়ানিজ ফুলওয়ালী চলেছে ফুল ফেরি করে, এই ভোর সকালে। কেয়াফুলের সুরভিচ্ছটায় মনটা খুশী হয়ে উঠলো।

ডাকলে ফুলওয়ালীকে। প্রীতিনম্র চোখে এগিয়ে এলো সে। স্পষ্ট করে তাকিয়ে দেখলে অক্ষয়। সক্ষম দেহলতার প্রতিটি অঙ্গে পুষ্টতার চিহ্ন। মোমের পুতুলের মত মসৃণ মাধুর্য। পিঠের ওপর এক ঝাঁক নরম চুলের রাশ। অনাবৃত কাঁধ আর অসমতল বক্ষে চিকচিক করছে লালপুঁতির মটরমালা। লাল রেশমের রক্তবস্ত্রের আবরণ উন্নত পয়োধরে। নিম্নাঙ্গে নানাবর্ণের ফুল আর পাখি আর লতাপাতা আঁকা পীতাভ নিচোল। সমুদ্রের মত নীল চোখে, প্রভাত-উচ্ছ্বাসী মুখে ঝিনুকের মত ঝকঝকে কৌতুকের হাসি।

দূরের পাহাড় থেকে উঠছে ভোরের সূর্য। বৃহৎ সূর্যের পীতচক্রের পটভূমিতে গোয়ানিজ ফুলওয়ালীটিকে মনে হল হঠাৎ যেন উঠে এসেছে অন্ধকার ভেদ করে, কোন এক অজানা দেশের অপ্সরী।

এক ঝাঁক রজনীগন্ধা আর দুগোছা কেয়াফুল কিনলো অক্ষয়। নীলিমা আর অণির কেশবিলাসের জন্য।

সুপটু নটীর মত হেসে হেসে তালে তালে পা ফেলে চলে গেল মেয়েটি।

বাঁধভাঙা স্রোতের নির্ঝরনিক্কণ ভেসে এলো বাতাসের পুষ্প সৌরভে—ফুল চাই, ফুল!

মনটা খুশিতে ভরে গেল।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো অক্ষয়। রাস্তার মাঝে।

পাহাড়ের পিঠে পাহাড়। শৃঙ্গশীর্ষে স্বচ্ছ কুয়াশার ওড়না, ঘনবনের শ্যামলিমা ভেদ করে আলোর চমক। নাতিপ্রস্থ একটি পাহাড়ী রাস্তা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে দূরের দিগন্তে, দিক্‌চক্রবালের অন্তরে মিশে গেছে। এখানে ওখানে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি বাড়ি। লাল মাটির উপত্যকায় সবুজ ফসল। এদিকে ভাটিয়ারী সঙ্গীতের সহ-যোগী সঙ্গতধ্বনির মত তালে তালে ফেটে পড়ছে নিকট সমুদ্রের তরঙ্গ তীব্রতা।

পোর্ট কলোনী থেকে বেরিয়ে এসে সহরের সড়কে নামলো অক্ষয়। সী-বীচের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। জাহাজঘাটাকে দূরে রেখে, সিগন্যাল টাওয়ারকে অনেক দূরে ফেলে।

ক্রমবর্ধিষ্ণু সাগর-গর্জনে নতুন এক উন্মাদনা জাগলো অক্ষয়ের রক্তে, নতুন বাতাসের স্বাদ পেলো।

জুতো হাতে নিয়ে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে জলের দিকে এগিয়ে চললো অক্ষয়।

দীর্ঘ একটা ছায়াশরীর দাঁড়িয়ে আছে তীরের কাছে। দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল অক্ষয়। হ্যাঁ, কোলাসই তো!

—কি খবর?

—ভোরের সূর্যোদয় দেখতে এসেছি।

—হ্যাঁ। দেখবার মত দৃশ্য নিঃসন্দেহে।

দু'জনে পা ছড়িয়ে বসলে পাশাপাশি। নির্বাক চেয়ে রইলো। উভয়ের কারোরই মুখে কথা নেই।

বালিতটের ওপর আছড়ে পড়ছে আরবসাগরের ঢেউ। তট আর তরঙ্গের সংঘর্ষে ফুলের মত ফেটে পড়ছে নীল সমুদ্রের ফেনিল জল-রাশি। অশান্ত বাতাসে কি যেন গুমরে মরে।

মাঝে মাঝে দু'একটা ঢেউ এগিয়ে আসে। ফাটা ফেনায় পা ভিজে যায় ওদের।

—আমার নাম এন্‌তনিউ। এন্‌তনিউ আরকজু কোলাস।

অক্ষয় হেসে বলে, তা তো জানি।

—হ্যাঁ, আজ তুমি জানো আর জানে আমার বায়লান। এর পর সারা গোয়ার লোক জানবে।

—কেন কি হ'ল? অক্ষয় প্রশ্ন করলে।

হঠাৎ ফিরে তাকালো কোলাস। অনুসন্ধিৎসু চোখে লক্ষ্য করলো অক্ষয়কে। তারপর বললে, তোমরা বাঙালীরা ভাবো, এক তোমরাই দেশ স্বাধীন করতে জানো। আমি দেখাবো, গোয়ানিজরা শুধু কুজনেরের জাত নয়, তারা রান্না ছাড়াও কাজ জানে।

বড়ো সাহেবের পিঠ-চাপড়ানির ভাষায় অক্ষয় বললে, নিশ্চয়। আমরাও মানুষ, তোমরাও মানুষ।

কোলাস খুশী হয়ে উঠলো। মৃদু হেসে বললে, আমার বায়লানের মত

মেয়ে তুমি পাবে না। সে কি বলে জানো?

—কি?

—বলে, দেশের জন্যে আমি যদি মারা যাই, তাহলেও সে চোখের জল ফেলবে না।

—হুঁ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো অক্ষয়।

'সারা ইণ্ডিয়া আজ ফ্রি।—কালের কথাটা কানে বাজলো আবার। হঠাৎ একটা অপ্রকাশ্য আনন্দের আহ্বান অনুভব করলে অক্ষয়। বুক ভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিলো।

গতক্লম শ্রমিকের মত দূরের জাহাজঘাটায় ঠেস দিয়ে ক্লান্তি দূর করছে এস এস শিবসমুদ্রম্। সুউচ্চ নিশানা-সৌধে লিসবনের জয়তিলক। পর্তুগীজ পতাকা উড়ছে সিগন্যাল টাওয়ারের ওপর।

হঠাৎ আহত বোধ করল অক্ষয়। সহস্র মানুষের ধৈর্য আর ত্যাগের রুধিরে কেনা স্বাধীনতার গরিমা মাটিতে মিশে গেল। অক্ষম আর নিঃসহায় মনে হল নিজেকে। সারা ভারতের মানচিত্রখানা শতছিদ্র কুম্ভের রূপ নিলো। বাইরের অজগর আবেষ্টনই নয়, নয় শুধু স্বজাতিসৃষ্ট অভিশাপের আশ্লেষ। অসংখ্য অন্তরের ক্ষত চোখে পড়লো অক্ষয়ের—পণ্ডিচেরী, কারিকল, ইউনান আর গোয়া, মাহী, দমন, দিউ। আরও। গঙ্গার পাড়ে চটকলের চিমনিতে ধোঁয়া কালো-কালো। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের মশলার বেসাতি। আসামের চা-বাগান, দাক্ষিণাত্যের কোকো আর কফির নেশা।

আর একবার ফিরে তাকালো সে।

আকাশে অস্বস্তির সূর্য। তপ্ত সূর্যকে আড়ালে রেখে হাল্কা হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে কইমা ক্যাডিজ, করোনা আর হুয়েলভার আধিপত্য।

—ধর্মঘট চালিয়ে যাবো আমরা।

দৃঢ়তার দম্ভ কোলাসের কথায়।

অক্ষয় বলল, কিন্তু শুধু শুধু পোর্ট-আপিসে স্ট্রাইক চালিয়ে কি লাভ হবে?

গলার লাল স্কার্ফটা ঠিক করতে করতে কোলাস বললে, সমুদ্রের নীচে রূপোর কৌটোয় লুকোনো থাকে রাক্ষসের প্রাণ, এ গল্প শুনেছো? পর্তুগীজ ইণ্ডিয়ার প্রাণও তেমনি এই পোর্ট।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো কোলাস।

বলল, গোয়ার পোর্ট খোঁড়া করে দাও, পর্টুগীজ ইণ্ডিয়ারও টেংরি ভেঙে যাবে।

সিটি অ্যাডমিনস্ট্রেটরের ঘরে মজলিস বসেছে। কোকোর টেবিলে নিমন্ত্রণ জুটেছে অনেকের। কালে, কোলাস, নয়লি। শাসন-সচিবের উপদেশকমণ্ডলীর নির্বাচিত কয়েকজনও এসেছে।—রামস্, মিস্ লুইসা, নারায়াণা। আর অক্ষয়।

গোল টেবিলটা ঘিরে বসেছে সকলে। অ্যাডমিনস্ট্রেটরের মেয়ে আনা,

আর ডা এলভাস্‌তনয়া টেগাস এসেছে সুবেশ সৌন্দর্য আর প্রসাধনের প্রাচুর্য নিয়ে। অনেক অনেক চেনা অচেনা মহিলার ভিড়। লীনা, লালিতা, রোমোলা। নামের মাধুর্য যেন সবুজ বাংলার বাতাস ডেকে আনে।

কিন্তু। সেদিকে কান নেই অক্ষয়ের। মনের নেই অবকাশ। ও ভাবছে আজকের এই সম্মেলনের গুরুত্ব কতখানি। নিষ্কর্ম নীতিযুদ্ধের তৃতীয় দিন আজ। বন্দরের কেরানি আর কর্মীরাই নয়, দুশো কুলিও যোগ দিয়েছে, সাড়া দিয়েছে।

এস এস শিবসমুদ্রম্‌ আজও বন্দর ছেড়ে যেতে পারেনি। দরিয়ার দুরন্তপনা যেন হঠাৎ থমকে থেমে গেছে ইউনিয়নের লীডার কালের অংগুলি নির্দেশে। মাল বোঝাই করবার লোক মেলেনি। লোক জোটেনি মাল নামাবার। খবর এসেছে, যাত্রীবাহী জাহাজ "অবগৎ এলিজা" ভিড়েছে বোম্বাইয়ের কূলে। নোঙর তোলার নিষেধ পৌঁছে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরে। মাঝ সমুদ্রের তিনখানা জাহাজ আসবার দিন এগিয়ে আসছে। তাই। তাই বিচলিত হয়ে উঠেছে কর্তৃপক্ষ। ডা এলভাস চিন্তিত, আগাস্তিনো দুশ্চিন্তায় মগ্ন। না। তার চেয়েও বেশী উৎকণ্ঠা বাণিজ্যপতিদের। মূলচাঁদ, কাজিসাহেব, রতনলাল। চোখে ঘুম নেই এদের। হাউইয়ের মত ছুটোছুটি করছে কয়েকখানা মোটর। কোলাপুরের নম্বর-মারা।

কিন্তু এ সবই আজকের এই জৌলুসের নীচে চাপা পড়ে গেছে। পৃথিবী ভুলে গেছে সকলে।

চারদিকের দেয়ালে রংবাহার লীনেন কাগজ। সিলিংয়ের চারকোণে দুলছে নরম আর রঙীন জ্যোৎস্না। জানালার উড়ন্ত পর্দার ওপারে ছোট আকাশ। কুয়াশার মত নিঃঝুম অন্ধকার ভেঙে পড়ছে সার্চলাইটের আলোয়। বাইরের বাগানে কৃত্রিম ঝর্ণা থেকে জল ঝরে পড়ছে অবিরত, মিহি আর মিঠে অপূর্ব এক সংগীতের রেশ আসছে ভেসে। পেয়ালা পিরিচের টুকরো টুকরো ভাঙা আওয়াজ। এদিকে কোকোর কাপে বাষ্পায়িত কুণ্ডলী আনছে নেশার আমেজ। তন্দ্রাতুর তারুণ্য। রাঙা আপেলের টুকরো আর—আঙুরের মত কোমল হাতে—দ্রাক্ষা বিতরণ করছে ডোনা টেগাস আর ডোনা আনা। পেস্ট্রির পাত্র ঘুরিয়ে নিয়ে যায়।

নেশার ঘোরে কেটে চলে মুহূর্তগুলো। গোয়ার বন্দরকে যেন ভুলে গেছে সকলে। বার্সিলোনার দ্রাক্ষা-উৎসবের উল্লাস, না, লিসবনের ললিতলাস্যের লহরী?

—গোয়া, পোর্ট গোয়া।

অগাস্তিনোর গম্ভীর কণ্ঠনির্ঘোষে চমকে উঠলো সকলে।

গোয়ার অ্যাডমিনস্ট্রেটর অগাস্তিনো ফ্রানসিসকো র‍্যামোজ। জ্ঞানবৃদ্ধের নির্বাক দৃষ্টিতে এতক্ষণ লক্ষ্য রেখেছিলেন অতিথিদের দিকে। এবার বাঙ্ময় হতে হল। পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে বললেন, কত দীর্ঘ একটা ইতিহাস রয়েছে বন্দরের পিছনে, কত বড়ো একটা ট্র্যাডিশন। সাড়ে চারশো বছর আগে ভারতবর্ষের মাটিতে পা ফেলেছিলেন

একজন বিদেশী বন্ধু। ভাস্কো ডা গামা। ২০শে মে তারিখে তাই আজও তাঁর প্রথম পদার্পণের দিনটিকে উজ্জ্বল করে রাখবার জন্যই পোর্টে প্রাসাদে তোলা হয় পতাকা—গোয়ার মানুষকে অপমান করবার জন্য নয়।

অক্ষয় ঠিক করে এসেছিলো শেষ অবধি ও চুপ করে থাকবে। গোয়ানিজ আর পর্তুগীজদের বিরোধের মাঝে ও তৃতীয় পক্ষ। নিরপেক্ষ। এই ধারণা নিয়েই এসেছিলো অক্ষয়। তবু, কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করলো, নিজেকে মিশিয়ে ফেললো ওদের সঙ্গে।

তাই অগাস্তিনোকে বাধা দিয়ে বললে, পতাকা যদি তুলতেই হয় তো তোলা হোক্ এদেশের পতাকা, পর্টুগালের নয়।

কোলাস ঘাড় নেড়ে সমর্থন করল—দেশাচো বাঁওটো।

পাশের কেদারায় ছিলো ডা এলভাস। কোলাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, সামান্য একটা পতাকা নিয়ে বিবাদ করে কি ফল হবে? নেহাৎ সরকারের গোলাম আমরা, তা না হলে আপত্তি করতাম না।

অগাস্তিনো সহাস্যে বললে, তা ছাড়া গোয়ার সব কিছুই তো তোমাদের হাতে। পাঁচ বছরের একটা চেংড়াও জানে সমুদ্রে যে জাহাজগুলো ভেসে আসে আর ভেসে যায়, তা চালায় এই গোয়ানিজ তারতির দল।

মিস লুইসা মৃদু হেসে নরম স্বরে বলে, কি চান আপনারা তাই বলুন? বেতন বৃদ্ধি? ইলেক্শন? কম খাটুনি?

অধৈর্য হয়ে ওঠে সকলে।

সমস্বরে চীৎকার করে, সুটকায়।

কোলাস বলে, সুটকায়।

কালে সমর্থন করে, সুটকায়।

—সুটকায়—প্রতিধ্বনি তুললে মূর্তি আর নয়লি।

অক্ষয়ও উঠে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা—ফ্রিডম্।

বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। রাতের রাস্তায় ভিড় করে কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললো। এ পথে আপোষ নেই। আপোষ চাই না।

সকলকে বিদায় দিয়ে কালে আর অক্ষয় বাসার পথ ধরলো। কোলাস চলে গেল তার ডেরার দিকে।

বোশেখী মেঘের মত কালো অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীর বুকে। ঘন হয়ে। রাতের আকাশে দু'চারটে চিকচিকে তারা। আর ঝাপসা চাঁদ। নিঃশব্দতার মাঝে শুধু সমুদ্রের গম্ভীর নিনাদ।

দূরের পাহাড়ে আগুনের হল্কা। অক্ষয়ের চোখ গেল সেদিকে। বহ্নিশিখার ফুলঝুরি দুলে দুলে উঠছে আকাশের দিকে। দূরের বনে আগুন লেগেছে।

এমন প্রায়ই হয়। হয়তো আপনা থেকেই জ্বলে উঠেছে। হয়তো বা কাঠকয়লা চালান দেবার সময় এসেছে। কালের কিন্তু ওদিকে লক্ষ্য নেই। পাশাপাশি হেঁটে চলেছে ওরা।

কালে হঠাৎ বলল, ভয় হয় কোলাসকে। শেষ তক না বিট্রে করে বসে। কুলিকামিনদের ওপর ওর ইনফ্লুয়েন্স কম নয়।

অক্ষয় বললে, সে ভয় নেই। লোকটা অত্যন্ত সিনসিয়র। তাছাড়া ওর স্ত্রীও একজন ট্রু পেট্রিয়ট।

—স্ত্রী? চমকে উঠলো কালে—কার স্ত্রী?

—কেন, কোলাসের স্ত্রী। শুনেছি তার মত মেয়ে নাকি বড়ো একটা হয় না। খুব ভালো, কোলাসের ভাষায়, খোদামাফিক। আর এই স্ত্রী নাকি কোলাসকে বলেছে যে, দেশের জন্যে কোলাস যদি মৃত্যু বরণ করে, তাহ'লেও নাকি সে চোখের জল ফেলবে না।

হো হো করে হেসে উঠলো কালে।

বললে, এ পাগলামি তা হ'লে যায়নি ওর?

—বুঝলাম না কথাটা।

—দেখোনি ওর স্ত্রীকে? ফুল বিক্রী করে যায় আমাদের পাড়ায়। সে তো এখন তোমাদের নারায়াণার সঙ্গে......যাক্ গে সে কথা। নমস্তে, চললাম আমি।

বাকি পথটা একাই হেঁটে আসতে হ'ল অক্ষয়কে।

বয়স্থা বারাঙ্গনার প্রসাধিত রূপের মত নতুন মডেলের ঝকঝকে একখানা স্টুডিবেকর স্খলিত তারার বেগে চোখ ঝলসে দিয়ে গেল কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে। অক্ষয়ের মনে পড়লো এই মোটরটিরই পুচ্ছে আর পুরোভাগে দেখেছিলো সে কোলাপুরের নম্বর। মূলচাঁদের গাড়ি।

একটু পরেই ডাক এলো। কালের বাড়িতে। গিয়ে দেখা পেলো সকলের। কোলাসও এসে জুটেছে।

মূলচাঁদ বলল, বাবুজী, স্ট্রাইক মিটিয়ে নিতে হবে আপনাদের।

—কক্ষণো না। কোলাস চিৎকার করল।

—মাথা গরম করবেন না, শুনুন। আমিও এদেশের লোক, গোয়ার স্বাধীনতা আমিও চাই। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন টাকার।

কেউ কোন বাধা দিল না মূলচাঁদের কথায়।

মূলচাঁদ আবার শুরু করল।—এস এস ফার্নাণ্ডিজ এসে পৌঁছবে দু'একদিনের মধ্যেই। জাহাজ ভর্তি হয়ে আসছে আমার লক্ষ লক্ষ টাকার মাল। হুইস্কি, জিন, শ্যাম্পেন—আমার তিন লাখ টাকার মদ তেরো লাখ টাকায় বিক্রী হবে, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে ডেলিভারী পেয়ে যাই।

—আপনার প্রফিট কষে আমাদের আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে নাকি শেঠজী? কালে হেসে ওঠে।

—না। মূলচাঁদ গম্ভীর হয়ে বলে, —না, তা বলি না আমি। কিন্তু বিদেশী সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে রূপেয়ার দরকার। লাখ লাখ রূপেয়া লেবার ফাণ্ডে দান করবো আমি, সাত দিনের মধ্যে স্ট্রাইক মিটিয়ে নিলে। এস এস ফার্নাণ্ডিজ থেকে মাল খালাস করে দিয়ে আবার স্ট্রাইক করুন আপনারা। আমি আপনাদের পিছনে থাকবো।

—সেল্‌ফিশ্। শুধু একটা কথাই বেরুলো অক্ষয়ের মুখ থেকে। বিদ্রূপের হাসি হাসলে কালে আর কোলাস।

অপমানে রাগে উঠে দাঁড়ালো মূলচাঁদ।

বললে, মাথা পিছু দশটা করে টাকা দিলে কালই দেখবে দু'শো কুলিই কাজে জয়েন করেছে।

রাগে দপ দপ করে পা ফেলে স্থূল দেহটা টেনে তুললো গাড়িতে। দ্রুতবেগে অদৃশ্য হল সেটা চোখের সামনে থেকে।

অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে কালে বললে, ডা এলভাস সার্কুলার পাঠিয়েছে। কাল আপিসে হাজুরে না দিলে চাকরি যাবে।

তিনজনেই সমস্বরে আবার হেসে উঠলো।

পাশের ঘরের জানালার আধখানা কপাট খুলে গেছে হাল্কা বাতাসে। রাস্তার লাইটপোস্ট থেকে এক ফালি স্তব্ধ আলো এসে পড়েছে অণির মুখের ওপর। পাঁচ বছরের শিবুকে কোলে জড়িয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রার আমেজ অনুভব করছে।

এ-ঘরেও নীলিমার চোখে ঘুমের ঘনিষ্ঠতা।

খাটের এক কোণে চুপ করে বসে রইলো অক্ষয়।

আশ্চর্য।

পরম বিশ্রামে এরা ঘুমিয়ে আছে। নির্ভাবনায়। এতটুকু চিন্তা নেই, আশাভঙ্গের বেদনা ছাপ ফেলেনি মুখে চোখে।

অনেক টুকরো-টুকরো দৃশ্য চোখে পড়ছে অক্ষয়ের। কিন্তু গ্রন্থি বেঁধে বেঁধে এগিয়ে এসেও নাটকের শেষ অংকটা খুঁজে পাচ্ছে না।

নিজের দীর্ঘশ্বাসে নিজেই চমকে উঠলো সে।

নীলিমার দিকে ফিরে তাকালো। নিদ্রিতা নীলিমার লাবণ্যে মালিন্য নেই, ক্লান্তি নেই।

সে রাত্রির একটা দুর্বোধ্য দৃশ্য মনে পড়লো অক্ষয়ের। লাল কাঁকরের রাস্তায় পথমর্মরের ধ্বনি ফুটিয়ে ছুটে গিয়েছিল স্টুডিবেকার গাড়িখানা।

নীলিমার অন্তর্বাসহীন তনুদেহ ঘিরেছে কালো পাড় সাদা শাড়ি-খানা। আঁচলের ঈষৎ আবরণ চিবুকের ওপর। অধরে ওষ্ঠে মৃদুহাস্য। বালিশের ওধারে লুটিয়ে পড়েছে দীর্ঘ কালো কেশের কৌতুক। নীলিমার নরম চুলের রাশে হাত রেখে অনেকক্ষণ কাটাল অক্ষয়। কোমল আর ঠাণ্ডা চুলের স্পর্শে কেমন যেন নিঃসহায় মনে হল নিজেকে।

সেই রাতেই আরও কি যেন দেখেছিলো অক্ষয়। দূর কলোনীর কোলে শ্রমিক বস্তিতে একটি একটি করে আলোর কণিকা জমা হতে দেখেছিল। বহু মানুষের জনতার চাপা স্বরে কানপাতার অভিপ্রায়েই যেন সাগরপারের চঞ্চল হাওয়াও হঠাৎ নিস্তরঙ্গ নিশ্চুপ হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

শিয়রের জানালাটা ঠেলে খুলে দিলো অক্ষয়। এক দমকা ঠাণ্ডা বাতাস আর এক ফালি জ্যোৎস্না এসে ঢুকলো ঘরে।

ওঘরে ঘুমের ঘোরে অণিমার ঠোঁটে ফুটেছে কৌতুক-স্বপ্নের হাসি।

সুগম্ভীর ডমরুবাদ্যের মত সাগরগর্জন ভেসে আসছে। আর কাছের গাছে কোন এক নিশাচর দম্পতির পাখা ঝটপটানি। নির্জীব পাহারাদারের

মত নিশ্চল লাইটপোস্টের নীচে ক্ষীণনম্র নিশীথালোক।

দুর্ভাগ্যানিপীড়িতের ঠিকুজীর মত ডা এলভাসের সার্কুলারখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কালের প্রখর দৃষ্টিতে অটল দৃঢ়তা। ফাইট দেম য়্যাট্ এনি কস্ট্। কালের গম্ভীর কণ্ঠস্বরটা আবার নতুন করে শুনতে পেলো অক্ষয়।

জবাবটা লিখে দিন বাবুজী! ডা এলভাসের পত্রবাহক বলেছিলো। আর অক্ষয় চেয়েছিলো স্বার্থের অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেতে। ওর শিক্ষিত জীবন শুধু একটি কথাই নির্ভুল লেখবার মত জ্ঞান দিয়েছিলো। একটি কথা। না।

বিস্মৃত স্বপ্নের মত মন থেকে সবই যেন মুছে যাচ্ছে।

ভোর হয়ে আসছে এদিকে। পূবের পাহাড়ে শ্যামল বনান্তে রাঙা আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। বিক্ষিপ্ত বিহঙ্গের কলকাকলী শোনা যায়।

ধীরে ধীরে নীলিমার গায়ে হাত রাখলো অক্ষয়।

—সময় হয়ে এসেছে।

পিছন হেঁটে ফিরে চললো অক্ষয়। হাজারো নগর আর নদী আর গ্রাম পিছনে ফেলে।

চোখের সামনে সুবিস্তৃত সবুজ মাঠ। বাত্যাবিধ্বস্ত ফসলভরা মাঠ আর ময়দান ভেঙে নুয়ে পড়েছে। বিনয়ে ঢলে পড়েছে আকাশের গায়ে।

জলে কাদায় টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে গরুর গাড়িটা। আহত কুকুরের মত ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে। দিঘীটার পাড় ঘেঁষে।

একঠ্যাঙা ঘোড়ার মত একপাশে হেলে পড়েছে পাড়ের তালগাছটা। ঝড়ের ঘায়ে ঝরাপাতার জঞ্জাল জমেছে এখানে ওখানে।

—ওখানে পড়ে রয়েছে ওটা কি রে ছিদাম? অণিমা প্রশ্ন করলে।

—ও আজ্ঞেন বাবুয়ের বাঁসা।

—এঃ, বাচ্ছা দুটো একেবারে থেৎলে গেছে—নীলিমা বললো।

—হুঁ বৌমা। । বড্ড ঝড়-বৃষ্টি গেছে কিনা।

অক্ষয় কিন্তু কোন সাড়াই দেয় না। দূর দিগন্তের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ও। ঝড়তুফানের পরে যেন আবার নতুন করে পৃথিবী জেগে উঠছে, প্রথম সৃষ্টির দিনের মত নতুন সূর্যোদয় পূবের আকাশে। তবু, অক্ষয় কি যেন খুঁজছে। শেষ দৃশ্যটা খুঁজে পাচ্ছে না ও। চোখে তাই উদাস দৃষ্টি। প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে সাগরচুম্বী বন্দরের কন্দর থেকে।

ওপোর্টোর সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা পোর্ট গোয়া। এদিকে কাম্বে, ওদিকে মান্নার উপসাগর। উড়ন্ত পাখির পক্ষ-বিলাসের মত উত্তরে কঙ্কণ আর দক্ষিণে মালাবার কোস্ট্ লাইনের ঢেউ কেঁপে কেঁপে সরে যাচ্ছে। পশ্চিমের ঢেউ-ফেনিল শুভ্রতা ফেটে পড়ছে জাহাজঘাটার প্রাঙ্গণে।

পোর্ট আপিসের প্রাচীরে প্রতিধ্বনি তুলছে সাতটার বাঁশী।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কদমে কদমে হেঁটে চলেছে সকলে। ভিন্-সমাজ আর ভিন-রুচি গোয়ানিজ পুরুষ আর মেয়ে মজুরদের জনতা এগিয়ে

চলেছে। তালে তালে। পোর্ট ডকের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। উচ্চ-নীচ প্রতিটি কর্মী আর কর্মচারী হেঁটে চলেছে। একজনকে শুধু খুঁজে পাচ্ছে না অক্ষয়। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়েও একজনের দেখা মিলছে না। স্বার্থতুষ্ট জনতা সকল আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কাজে যোগ দিতে চলেছে। নেই শুধু কালে। ডকের উঁচু পাঁচিল অবধি সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অক্ষয়। প্রলম্বিধর পদধ্বনি বেজে চলেছে।

কিন্তু।

না, কালে নেই।

হঠাৎ একটা কাকুতি-ভরা কাকলিতে চমকে উঠলো অক্ষয়। তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনে চেয়ে দেখলে, দুটো খড়কুটো ঠোঁটে চেপে একটা বাবুই পাখি উড়ে গেল। নতুন একটা গাছের সন্ধানে।

অক্ষয়ের মনের চোখে হঠাৎ ধরা পড়লো পাঁচিলের ওপাশটা। কোকোর টেবিলে কে কে যেন বসে রয়েছে। র্যামোজ, ডা এলভাস, মূলচাঁদ। লক্ষ টাকার দ্রাক্ষারসের বেসাতি যার। আর—আর কালে।

খুনী বৌ

পাড়ায় নিভাদির নামই হয়ে গিয়েছিল খুনী বৌ। সামনাসামনি ওঁকে 'নিভাদি' বললেও আড়ালে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় আমিও অনেক সময় 'খুনী বৌ' বলে ফেলতাম।

এ নামকরণ হয়েছিল সেই প্রথম দিন থেকে যেদিন খবরটা প্রথম দেখলাম খবরের কাগজে। যেদিন সন্ধ্যের সময় নিভাদি এসে উঠলেন মধু স্যাকরা লেনের একতলাটায়।

মধু স্যাকরা লেনে তখন বেশ অন্ধকার নেমেছে। আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে অবিরত। দোতলার বারান্দায় নির্জন গলিটার দিকে তাকিয়ে-ছিলাম একদৃষ্টে। গলির মোড়ে শুধু একটা বাছুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। আর অন্ধকার গলিটার বাঁকে বাঁকে লাঠিতে থুৎনি রেখে পাহারাদার সিপাই যেমন দাঁড়িয়ে ঘুমোয় তেমনিভাবে মাথায় আলোর পাগড়ি বেঁধে গোটা পাঁচেক গ্যাসপোস্ট দূরে দূরে দাঁড়িয়ে ঢুলছিল। রাস্তায় জমা হাঁটুজল পার হয়ে ঠুন ঠুন করতে করতে এগিয়ে গেল একটা রিক্সা।

বৃষ্টিতে ভেজা পীচের রাস্তাটা গ্যাসের আলোয় চকচক করছিল। তার ওপর আরো এক ছটা আলো এসে পড়লো। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ফাঁসুড়ে জজের জানালায় আলো জ্বলছে। রাস্তাটার মতই জজ সাহেবের চকচকে টাকটা চোখে পড়লো। একরাশ বই আর খাতাপত্তরের ওপর ঝুঁকে পড়লো তাঁর মাথা।

ঘটনাক্রমেই বলতে হবে, হঠাৎ শুনলাম, খুনী রতনচাঁদের বিচার হবে ঐ পড়শী জজ-সাহেবের আদালতে, উকীল মোক্তাররা যার নাম দিয়েছে জল্লাদ, আর অগুন্তি ফাঁসির হুকুম দেবার জন্যে পাড়ার ছেলেরা যার নামকরণ করেছিল ফাঁসুড়ে জজ। এই জজ-সাহেবের টাকের ওপর চোখ রেখে ভাবছিলাম রতনচাঁদের কথা।

এমন সময় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে গলিতে ঢুকলো একটা ফিটন। জিরজিরে ঘোড়া আর নড়বড়ে গাড়িটা জল ঠেলে ঠেলে এগিয়ে এলো, এসে থামলো রতনচাঁদের একতলাটার সামনে। চারপাশ তার ঢাকা, ভেতরে আরোহী কেউ আছে কি নেই বোঝা দায়।

গাড়ি থামিয়ে কোচোয়ানটা নামল এক লাফে, সরিয়ে দিলো তেরপলের ঢাকাঢুকি। পরক্ষণেই বুড়োগোছের এক ভদ্রলোক নেমে কপাটের তালা খুললেন। ফিরে এসে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন ফিটনের আর সঙ্গে সঙ্গে কোলে একটি বাচ্চা ছেলে নিয়ে যিনি নামলেন তিনিই নিভাদি। অল্প ঘোমটার আড়ালে ফর্সা এক টুকরো মুখ, শ্বেতশঙ্খের মত মসৃণ সাদা দুখানি হাতে সরু সরু কয়েক গাছা চুড়ি। এইটুকুই, আর কিছু না।

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন নিভাদি, জিনিসপত্তর হাতে নিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকও চোখের আড়ালে চলে গেলেন, কপাট বন্ধ হল।

মনে রহস্য পুষে রাত কাটলো। আর ভোরবেলাতেই জবাব পেলাম তার। মুখ-হাত ধুয়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম রতনচাঁদের একতলার জানালায় দাঁড়িয়ে নিভাদি।

দেখলাম উদাস দৃষ্টি মেলে জানালার গরাদে গাল চেপে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন নিভাদি। চোখ তাঁর ফাঁসুড়ে জজের জানালায়। বিকেলে আপিস থেকে ফেরবার সময়েও অজান্তে চোখ গেল সেদিকে। দেখলাম, ছেলেটা হাঁটু জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, অথচ খেয়াল নেই নিভাদির! গায়ে আধময়লা একখানা শাড়ি, চুলে চিরুনি পড়েনি, মুখে কেমন একটা বিষাদের ছায়া।

একদৃষ্টে ফাঁসুড়ে জজের জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন নিভাদি, আমাকে লক্ষ্য করেন নি। এগিয়ে গিয়ে বললাম, এলেন নিভাদি?

মনে হ'লো যেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে রাখলেন, চোখে চোখ ফেলতে পারলেন না। শুধু মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

কথা খুঁজে না পেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। নিভাদি কপাট খুলে শান্ত গলায় বললেন, এসো।

গিয়ে বসলাম ঘরে, আর বসার পর কেবলই ইচ্ছে হ'ল উঠে পড়তে। কি বলবো, কিভাবে বলবো, কিছুই খুঁজে পেলাম না। চটির শব্দ তুলে ঘরে ঢুকলেন নিভাদির বাবা, আমার দিকে চোখ পড়তেই অস্তস্তিতে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজলেন, তারপর ধীরে ধীরে এসে বসলেন বেতের মোড়াটার ওপর। বললেন, কি যে করবো, কি যে করা যায়?

বুঝলাম দুশ্চিন্তায় কাঁপছেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলাম, ভালো উকীলের ব্যবস্থা করেছেন তো?

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন উনি।—ভালো উকীল! যে জজের আদালতে মামলা পড়েছে!

বললাম, উকীলকে বলুন না, অন্য কারও কোর্টে বদলে নিতে।

কথাটা শুনে চকিতে একবার নিভাদির মুখের দিকে তাকালেন উনি, তারপর আবার মাথা নিচু করে রইলেন। খানিক পরে যেমন চটি চটচট করতে করতে এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন আবার পাশের ঘরে। আর নিভাদি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, বিশ্বাস হয় তোমার? ও এমন জঘন্য কাজ করতে পারে?

সান্ত্বনা দেবার জন্যেই হয়তো বললাম, কক্ষনো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিভাদি বললেন, তোমাদের ঐ ফাঁসুড়ে জজের কোর্টে নাকি কেউ কখনো খালাস পায় নি?

মন না রাজী হলেও মুখে হাসি টেনে বললাম, মিছে কথা।

এতক্ষণে একটু ম্লান হাসলেন নিভাদি, তাই বলো। যদ্দিন না ভাই ও খালাস হয়ে আসছে ঘুমোতে পারছি না রাত্তিরে, সারা গায়ে কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করছে। ডাক্তার বলছে খুব ভয় পেলে নাকি এমন হয়।

বললাম, হ্যাঁ বেশি নার্ভাস হলে জ্বর হয় অনেক সময়।

নিভাদি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—নিজের কথা তো ভাবছিনে ভাই।
নিভাদির গলার স্বরে যেন চোখের জল মিশলো।

বললাম, ভাববেন না নিভাদি, নির্দোষ লোককে কি শাস্তি দিলেই হ'ল?

নিভাদি আশঙ্কায় চোখ তুলে বললেন, হ্যাঁ ভাই? জজ যদি ভাবে ও সত্যিই দোষী, তা হলে, তা হলে কি ফাঁসি হবে?

হেসে হাল্কা করার চেষ্টা করলাম। বললাম, ফাঁসি? না, না, ফাঁসি হবে কেন?

বললাম বটে, কিন্তু মনে মনে বেশ জানতাম মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছি নিভাদিকে। আর কোন কোন দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে, আপিস থেকে ফেরার সময় অথবা রাত্তিরে শুতে যাবার আগে নিভাদিকে জানালার ধারে উদাস ম্লান চোখ মেলে ফাঁসুড়ে জজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মনে প্রশ্ন জাগতো, এও কি সম্ভব? স্বামীর সম্পর্কে কি এতটুকু সন্দেহ নেই নিভাদির মনে? সত্যিই কি তাঁর ধারণা রতনচাঁদ নির্দোষ? না কি সব জেনেশুনেও রতনচাঁদকে ক্ষমা করেছেন নিভাদি?

একটি মেয়ের সংগে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল রতনচাঁদের, ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেম, প্রেম থেকে প্রবৃত্তি। তারপর হঠাৎ কলঙ্কের বিভীষিকা দেখেছিল রতনচাঁদ। সেই কলঙ্ক অপসারণের স্থূল পথের সাহায্য নিতে গিয়েই কি না কে জানে, মৃত্যু ঘটে মেয়েটির।

এমন একটি নৃশংস ইতিহাসের নায়ক রতনচাঁদ—এ খবর জানার পরও কি করে স্বামীকে ক্ষমা করলেন নিভাদি।

ক্ষমা! না, ক্ষমার চেয়েও আরো অনেক মহৎ গুণ বলতে হবে। চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখলাম নিভাদির সুস্থ সুন্দর মুখে রোগ-পাণ্ডুর দুশ্চিন্তার ছায়া নামছে। শরীর শীর্ণ হয়ে চলেছে দিনে দিনে, স্নিগ্ধযৌবন মুখে নামছে রুগ্ন বিষণ্ণতা।

নিভাদির বুকের ভেতর দিন-রাত যে আশঙ্কার আগুন জ্বলতো, তা তাঁর চেহারাতেই প্রকাশ পেতো। নিভাদির বাবাও বুঝতেন সব।

দুঃখ করে একদিন বললেন, জামাইকে হয়তো বাঁচাতে পারবো, কিন্তু মেয়ে বাঁচবে না আমি জানি।

সত্যিই তাই। প্রতিদিন সকালে ফাঁসুড়ে জজ গাড়ি চেপে কোর্টে যেতেন, প্রতিদিন বিকেলে ফিরে আসতেন যথারীতি। বোধ হয় লক্ষ্যও করতেন না তিনি, ওপাশের একটি একতলা বাড়ির জানালায় ব্যথায় ভরা দুটি চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। আশায় আশায় দিন গোণে, যদি কোন দিন চোখে চোখ পড়ে তা হলে, তা হলে হয়তো ঐ একজোড়া কান্নাভরা চোখের দৃষ্টিতে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করে অনুরোধ জানাবেন নিভাদি। আর এই দুশ্চিন্তার প্রতীক্ষায় দিনে দিনে দেখতাম ক্রমশই রোগা হয়ে যাচ্ছেন নিভাদি, মুখে ফুটছে রুগ্ন কুণ্ঠন, শরীরে অবহেলা।

শুধু কি তাই? রতনচাঁদকে বাঁচাবার জন্যে নিজের বাঁচবার মতনও কিছু আর অবশিষ্ট রাখলেন না নিভাদি।

নিভাদির বাবাই খবরটা ভাঙলেন একদিন। বললেন, খরচখরচা তো কম হচ্ছে না, তবু মেয়ের সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখবার জন্যে বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রী করে দিলাম।

শুধু বিষয়-সম্পত্তিই নয়, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, নিভাদি হাতের চুড়ির সংখ্যা যেন বেশ কিছু কমে গেছে। গলার হারে তবু কণ্ঠি ঢাকা ছিল, তাও দেখা গেল না আর।

পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করতো, এমন স্ত্রীর কিনা অমন স্বামী।

আমরাও একথা বলাবলি করতাম। সর্বস্ব পণ করে যে স্বামীকে বাঁচাতে চায়, যে-স্বামী স্ত্রীর বিশ্বাসের মূল্য দেয় না, অন্য মেয়ের আকর্ষণে ছুটে বেড়ায়, আর সেই মেয়েকেই খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়, সেই নিভাদির ভাগ্যে কিনা রতনচাঁদের মত স্বামী।

নিভাদির জন্যে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম আমরা।

আর নিভাদি বলতেন, আমি বিশ্বাস করি না ভাই। সব মিছে কথা, সব পুলিশের কারসাজি। ও কখনো এমন কাজ করতে পারে? ও খুন করবে? মেয়েদের মত নরম হাত, তুমি তো দেখো নি, চাঁপা কলির মত আঙুল, সেই হাতে কিনা—

অবিশ্বাসের হাসি হাসতেন নিভাদি। আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমাদেরও কেমন যেন অবিশ্বাস হ'ত।

নিভাদি বলতেন, আমি সব সহ্য করতে পারি ভাই, কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষ আমার দু'চক্ষের বিষ।

বলতেন, আমার কি মনে হয় জানো, এমনি ধারার কোন লোকই ওকে মামলায় জড়িয়েছে।

রতনচাঁদকে মামলায় কে জড়িয়েছিল তার খোঁজ না পেলেও দিনে দিনে মামলার বিবরণ পেতাম নিভাদির বাবার কাছে, কখনো বা খবরের কাগজে, আর বুঝতে পারতাম বিষয়-সম্পত্তি, নিভাদির হাতের চুড়ি, গলার হার বিক্রী করা টাকায় যে উকীল লাগানো হয়েছিল, তার বুদ্ধির প্যাঁচে মামলাটাও কম জড়িয়ে যায় নি।

তারপর একদিন শুনলাম, রতনচাঁদের মামলার রায় বেরুবে। রতনচাঁদ ছাড়া পাবে, একথা কেউ ভুলেও ভাবিনি আমরা। নিভাদি ছোট্ট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ফিটনে উঠে বসলেন। নিভাদির বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও গাড়িতে উঠলাম। মনে তখন শুধুই ভয়, শুধু আশঙ্কা। আগে থেকেই এক ডাক্তার বন্ধুকে বলে রেখেছিলাম, আদালতে উপস্থিত থাকবার জন্যে। হয় ফাঁসি, আর নয়তো দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড। আর রায় শুনেই হয়তো নিভাদি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন, ভয় ছিল মনে। সেদিনই হয়তো প্রথম মনে মনে একান্তভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। শুধু একটা প্রার্থনা ছিল: রতনচাঁদের যেন ফাঁসী না হয়। তা হলে, হয়তো নিভাদিকে বাঁচানো যাবে।

কিন্তু রায় শুনে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। প্রথমটা নিজের

কানকেই যেন বিশ্বাস হ'ল না। খালাস? সন্দেহের অবকাশে খালাস পেয়ে গেলো রতনচাঁদ!

একমুখ হেসে উঠে ফিরে তাকালেন নিভাদি, আর নিভাদির দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো।—বলেছিলাম না? বলি নি আমি, সব মিথ্যে!

শুধু রতনচাঁদ কোন কথা বললো না। এক কোণে জানালার বাইরে মুখ গলিয়ে দিয়ে বসে রইলো ও। বুঝলাম, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না ও।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, মানুষের জীবনে যদি কোন সত্যিকারের আনন্দের রাত থাকে তো নিভাদি সে-আনন্দের স্পর্শ পেলেন এতদিনে।

ভাবলাম, সক্কালবেলাতেই রতনচাঁদকে জানিয়ে আসবো কতখানি ত্যাগ আর দুঃখবরণের মধ্যে দিয়ে, কত গভীর বিশ্বাস আর প্রেমের হাতিয়ার নিয়ে নিভাদি তাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু হট্টগোল শুনে ভোরবেলাতেই ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এও কি সম্ভব?

রতনচাঁদ বিষ খেয়েছে। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে রতনচাঁদ।

শুনলাম, নিভাদি নাকি আবোলতাবোল কি সব বলছেন। নিভাদি পাগল হয়ে গেছেন।

দেখা করতে গেলাম।

বোবা চোখ মেলে আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নিভাদি। তারপর হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে বললেন, ক্ষমা? ক্ষমা করতে হবে? জানো, দুশ্চরিত্র পুরুষ আমার দু'চক্ষের বিষ। হ্যাঁ, বিষ বিষ।

খিলি খিল করে আবার উন্মাদের মত হেসে উঠলেন নিভাদি। আর তাঁর বিষের মত নীল একজোড়া চোখের হাসি দেখে ভয় পেলাম।

কু সী দা শ্রি ত

পার্কটার দক্ষিণ দিকে এক্‌সারি বড় বড় ম্যানশন দেখতে পাচ্ছো? ঐ যে কার্নিসের কোলে কার্নিস, ভেণ্টিলেটারের ভুরুতে ভেণ্টিলেটার দেয়া বাড়িগুলো—ওরই মাঝখানে দেখো আরেকখানি ক্ষুদে অট্টালিকা। হ্যাঁ, দুপাশের বাড়ির বিরাটত্ব এ বাড়িখানার মহিমা কমিয়ে দিয়েছে সত্যি। কিন্তু। বিচার করে দেখো তো, দেখো না একটু চোখ চেয়ে, একটু ভালো করে, তোমাদের চোখে দু'বেলা যেসব প্রাসাদ দৃষ্টির প্রসাদ পাচ্ছে তাদের চেয়ে কি এখানি অনেক বড় নয়? নয় অনেক বেশী সুন্দর, আর সৌষ্ঠবে নয় কি সার্থক?

চিক দিয়ে ঘেরা বাড়িখানা একটু রহস্যজনক, একটু অবোধ্য বুঝি? তা তো বটেই। এ পাড়ায়—এ পাড়ার বুকে যেন বেমানান। অলজ্জ স্বাধিকারের জোরে এ পল্লীর মেয়েরা সোজা হয়ে চলে, শীতের রাতেও পরে হাতকাটা জ্যাকেট। অর্গ্যাণ্ডি, মলমল, আদ্দি। জড়োয়া নয়, জড়ায় জরির কাজ করা হাওয়াই শাড়ি। কিম্বা পাতলা রেশমের জামদানি। হোক না শীতের সন্ধ্যা, থাক না বাতাস-বসন্ত। কি আসে যায়, সামান্য একটু রোমশিহরণের কণ্টক-কারণা, কথালাপ আর কৃষ্টির রোমাঞ্চ তো নষ্ট হয় না। তাই এরা শাড়ির আঁচলটা টেনে দেয় বুকের মাঝ দিয়ে, শাড়িটা সাপটে থাকে দেহের লালিত্যে, বাঁকা আর ভাঙা দেহরেখায় লেগে থাকে বাসনার আবরণ।

এরা হাসে সশব্দে, গান গায় গলা ছেড়ে, সিনেমায় যায় পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে। রঙিন শাড়ির আগুন ছড়ায়, এসেন্সের আমেজ ধরায়। স্যাম্পু করা চুল ফুরফুর করে, নীল রুমালের বাঁধন ওড়ে। নেচে বেড়ায়, ছুটে বেড়ায়, রেকর্ড বাজায়, রেডিও শোনে। সাদা মলমলে কি গোলাপী গালের ছায়া? না লুকোনো দেহের পাটলবর্ণের প্রতিচ্ছবি?

কিন্তু।

কিন্তু এদের মাঝখানে ও বাড়িখানার মুখে পড়লো কি করে চিকের আড়াল! ঘোমটার অন্তরালে ওরা কারা?

যেই হোক ও বাড়ির লোক মিশতে চায় না এদের সঙ্গে। সাগর আর নদীর মাঝে দূরত্বটা কম হ'তে পারে, কিন্তু মাঝখানে যদি দাঁড়ায় অভেদ্য পাহাড়—মিলবে কি ক'রে। হ্যাঁ, ওদের মাঝখানে ঐশ্বর্যের অনৈক্য না থাকতে পারে, আছে সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য।

ঐ সাদা গোল বাড়িটার অর্ধেকটা জ্যোতিষবাবুর দখলে। বাকী অর্ধেক বাড়িআলার। কোলকাতায় প্রথম যখন বদলি হয়ে এলেন, জ্যোতিষবাবু বুঝতে পারেননি পাড়াটার গুণগরিমা। ইদানীং টের পাচ্ছেন, আর মনে মনে চটে উঠছেন। কড়া হুকুম দিয়েছেন, পর্দা সরাবে না, চিক তুলবে না।

ষাট টাকায় ঢুকেছিলেন চাকরিতে, আজ জ্যোতিষবাবু পাচ্ছেন পনেরো শ'। সময় এবং স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে তাল রেখে চলেছেন, ছ' আনা দামের টাই ছেড়ে টুটাল ধরেছেন বহুদিন। বড় ছেলেকে ঢুকিয়েছিলেন মফস্বলের কলেজে, ছোটকে পড়িয়েছেন সেণ্ট জেভিয়ার্সে। কিন্তু মেয়েদের এতটুকু উড়তে দেননি।

ছেলেদের নাম বদলেছে উন্নতির ধাপে ধাপে। বড়োর নাম লক্ষ্মীনাথ, মেজো ছেলে অতুল, ছোট সূর্যেন্দু। মেয়েদের নামও মার্জিত হয়েছে। বড় রাধারানী, মেজো নির্মলা, সেজো মেয়ের নাম নমিতা আর সমিতা হ'ল ছোট। বড় আর মেজোর বিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক আগে। নমিতারও বিয়ের সময় হয়ে এলো।

কিন্তু। জ্যোতিষবাবু ভাবছেন অন্য কথা। তাঁরও যে সময় হয়ে এলো। আর মাত্র পাঁচ বছর বাকী। তারপরই রুটিন বাঁধা জীবনে যতি পড়বে। থেমে যাবে তাঁর দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা। শীতের সকালে স্নান করতে হবে না, ন'টার সময় সারতে হবে না অনিচ্ছুক আহার।

চাকরি থেকে আর পাঁচ বছর পরেই অবসর নেবেন জ্যোতিষবাবু।

তারপর? সেই কথাই ভাবছিলেন। সারাটা জীবন ভাড়াটে বাসায় কাটিয়ে এসেছেন। আজ কোলকাতা, কাল রংপুর, তারপর রাজসাহী নয়তো মালদহ। বিক্রমপুরে কাটিয়েছেন দু'বছর; বাঁক্‌ড়োতেও নেহাৎ কম দিন নয়।

জ্যোতিষবাবুর জন্মস্থান কিন্তু বর্ধমানে। বৃদ্ধ হয়ে আসছেন, বয়স বাড়ছে। জনারণ্যের জঞ্জাল তাই আর সহ্য হয় না।

জ্যোতিষবাবু ঠিক করেছেন, আর ভাড়াটে বাড়িতে নয়। এবার একটা নিজস্ব বাড়ি চাই। নিজের বাড়ি। যেখানে উত্তর-অবসরের দিনগুলি আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারবেন। শহর নয়, গ্রাম। ধোঁয়া আর ধাঙড়ের দেশে নয়, ধ্যান আর ধানের দেশে। দেশের ভিজে মাটি তাঁর মন টানছে।

ছোটবেলাটা কাটিয়েছেন গ্রামের বিশ্রামে। সব মানুষই তো ফেলে-আসা শৈশবের রোমাঞ্চ রোমন্থন করে জীবনের শেষদিন অবধি। কৈশোরের দিনগুলি তাঁর চোখে রমণীয় বলেই কৈশোরের মাটিটাও এত মধুর মনে হয়। সে-কথা জ্যোতিষবাবু বুঝতে পারেন না। তাঁর ধারণা, সোনালি ধানের সুগন্ধ আঘ্রাণ আজো বুঝি তেমনি মিঠে আর মনোহর।

বড় ছেলে লক্ষ্মী গ্রামের ওপর বীতশ্রদ্ধ। সে বাধা দেয় যুক্তির সংযুক্তিতে। বলে, পাড়াগাঁয়ের মত অপরিচ্ছন্ন জায়গায় বাস করে না কেউ। উপায় যার নেই, সে থাকুক গ্রামে, কিন্তু শখ করে টাকা নষ্ট করার মতো জায়গা নয় পাড়াগাঁ।

জ্যোতিষবাবুর অনেক সুমধুর স্বপ্নে বোনা গ্রাম। যুক্তি কি বিশ্বাসকে টলাতে পারে! জ্যোতিষবাবু বলেন, নালাটালাগুলো স্রেফ বাঁধিয়ে দোব সিমেণ্ট দিয়ে। কাঁদরের ওপর দিয়ে কংক্রিটের একটা পুল করে দোব, গাড়ি যাবে একেবারে বাড়ির দরজায়।

—পুকুর আর পানা?

—সে খরচও নয় আমিই দোব। রোজগার করেছি, খরচ করবো।

স্ত্রী বীণাবতী বলেন, টাকাগুলো ঐ করেই ওড়াবে আর কি!

জ্যোতিষবাবু সে কথায় কর্ণপাত করেন না।

মাঠের মাঝখানে একটা পুকুর আছে, দীঘিও হয়তো বলা চলে। নাম, স্নিগ্ধবাস। নাম-সার্থক-করা পুকুরই বটে। চারপাশের জমি থেকে পুকুরের পাড়গুলো অনেক উঁচু। জ্যোতিষবাবু ঠিক করেছেন, স্নিগ্ধবাসেরই উত্তর পাড়ে বেশ বাংলো টাইপের একখানা বাড়ি করবেন।

এর আগেও বহুবার আঁকজোক কেটেছেন তিনি। এখনো সে-প্ল্যান শেষ হয়নি। দিনের পর দিন কাগজ পেন্সিল নিয়ে ঘরের ছক কেটে চলেছেন। কোন্ দিকে কপাট হবে, ক'টা জানালা। রান্নাঘর দূরে হবে, না বাড়ির মধ্যে।

বাধা এলো হঠাৎ সেজো মেয়ের কাছ থেকে। জ্যোতিষবাবুর আঁকা প্ল্যান দেখে ভুরু কুঁচকে গেল নমিতার। বললে, তার চেয়ে রামপুরের ডাঙায় একটা তাঁবু খাটিয়ে থাকলেই হয়!

অর্থাৎ বাড়ির প্ল্যানে খরচের দিকটা একটু সংক্ষেপ করেছিলেন জ্যোতিষবাবু। দু'খানি ঘর, রান্নাঘর। ব্যস্। এক ইঁটের দেয়াল।

তাঁর আর দোষ কি? খরচ বাড়াও তো ছেলেরা চটে, খরচ কমাও তো মেয়েরা চটে। শেষে মাঝামাঝি একটা সুরাহা হ'ল। দোতলা হবে, ওপরে দু'খানি ঘর।

স্ত্রী বীণাবতী এদিকে বেঁকে বসলেন। কোলকাতায় চার বছর ধরে থেকে ইতিমধ্যেই শহরটার ওপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে। আরো পাঁচ বছর ধরে সে মায়াকে ঘনীভূত করার পর কি গ্রামে যেতে ইচ্ছে হবে তাঁর!

জ্যোতিষবাবুর মতে কোলকাতা একটা জঘন্য জায়গা। ভদ্রলোকে বাস করে না এখানে। কথাটা বলেই ঘৃণায় নাক কুঁচকে চিকের ফাঁক দিয়ে পাশের বাড়ির দিকে তাকালেন তিনি।

ছেলেরা বললে, গ্রামেও বাস করা যায় না, দূর থেকে কতই ভালো।

জ্যোতিষবাবু চটে উঠলেন। —এক ছটাক খাঁটি দুধ খেতে পাও এখানে? টাটকা মাছ পাও? শাকসবজি পাও ইচ্ছে মতো? গ্রামে তোমার গোয়ালে গরু, কত দুধ চাই খাও না। পালঙ শাক নিজের হাতে কেটে আনবো, পুকুর থেকে তুলবো কল্মি। জাল ফেললেই মাছ।

—কিন্তু ম্যালেরিয়া?

—টি বি কলেরা পক্স নেই এখানে? বছরে বছরে টিকে নিচ্ছো না?

—অপরিষ্কার জল।

—তা ত হবেই, সিওয়ারের পাশ দিয়ে জলের পাইপ যায়নি যে সেখানে। খানিক থেমে বললেন, আর তাছাড়া টিউবওয়েল তো করবোই।

—না, কোন কিছুতেই হার মানবেন না জ্যোতিষবাবু।

শেষে, শেষবাণ ছুঁড়লো সেজো মেয়ে। —গ্রামে বাস করবে? তার চেয়ে 'পল্লীসমাজ' বইটা পড়ে দেখো। কেবল ঝগড়া, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমা।

অতএব স্নিগ্ধবাস বাতিল।

স্রোত আর সময় কারো মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে না।

বাড়ি তৈরির জল্পনাকল্পনা চলে, বছরও কেটে আসে। ইতিমধ্যে

সেজো মেয়ের বিয়ে হয়েছে, রাঁচির কাছে এক ছোট্ট স্টেশনে আছে সে। স্বামীর চাকরিস্থলে। বড় ছেলে ডাক্তার, বিয়ে দিয়েছেন মাসখানেক আগে।

বড় ছেলে লক্ষ্মীনাথ ঠিক করেছে চাকুরি নয়, ডাক্তারি করবে সে। কোলকাতায় নয়, এখানে পাত্তা পাওয়া দুষ্কর। কোন মফঃস্বলে।

ছোট ছেলে এম এ পাশ করে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, চাকরি করবে না সেও। ছোটবেলা থেকে সাহিত্যবাতিকটাই ওর মাথা খেয়েছে, জ্যোতিষবাবু জানেন। বড় মেয়ে যাবার আগে সাবধান করে দিয়ে গেছে। সূর্যেন্দুর নাকি কোন একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে। তাকেই বিয়ে করবে বলে গোঁ ধরেছে।

সূর্যেন্দু এ-সবের সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

ও শুধু বুঝেছে কিছুদিনের মধ্যে ও ত্যাজ্যপুত্র হবেই এবং তা নাও যদি হয় তো জ্যোতিষবাবুকেই হতে হবে ত্যাজ্যপিতা। আসলে সংসারের কোন মানুষটার সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না ও। ওর মনের কেন্দ্রে একক আধিপত্য হ'ল স্বয়ং ওরই, স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাঁচতে চায় ও।

তাই জ্যোতিষবাবু যখন সূর্যেন্দুর অভিমত চাইলেন, সূর্যেন্দু সরল উত্তর দিলো না।

জ্যোতিষবাবু বললেন, আর তো চার বছর বাকী, একটা বাড়িটাড়ি করতে হয় এবার। বর্ধমানেই যদি করি তো কেমন হয়?

—মন্দ কি। এর বেশী উত্তর দিলো না সূর্যেন্দু।

একটু আহত বোধ করলেন জ্যোতিষবাবু।

স্ত্রী বীণাবতীকে ডাকলেন। —শুনছো, বর্ধমানেই নয় পাঁচ কাঠা জায়গা কিনি?

বর্ধমান? আকাশ থেকে পড়লেন বীণাবতী।

সত্যি। বছর দশেক আগে একবার শহরটা দেখে এসেছেন তিনি। বিশ্রী জায়গা। শহর না হাতি।

জ্যোতিষবাবু বোঝারার চেষ্টা করলেন, আরে না না, ব্রজেন, আমাদের আপিসের ব্রজেন বলছিলো আজকাল নাকি উন্নতি হয়েছে শহরটার।

বীণাবতী বিরক্ত হয়ে ওঠেন। —উন্নতি না কাঁকুড়। বছরে দুবার করে বানে ভাসতে পারবো না আমি। তার চেয়ে গলসীর জলার মাঠে হোগলার ছাউনী করে থাকলেই হয়!

—দামোদরে তো বাঁধ দেওয়া হচ্ছে।

—তুমি যেমন মানুষ, সেকথা আর বিশ্বাস করবে না। মনে নেই, সেদিন হাবুমামা কি বলে গেল? কনট্রাক্টর নিয়ে কি করে টাকা করছে ওরা? দামোদরের বাঁধ তো ওরাই দিচ্ছে, কংক্রিট দিয়ে ভরাট করার কথা, করছে বালি দিয়ে।

জ্যোতিষবাবু বলেন, তোমার হাবুমামা তো। মামাশ্বশুর হ'ন তাই বলি না। যা খুশি করলেই হ'ল, ইন্সপেক্টর নেই, দেখছে না তারা?

—ঘুষ বলে একটা জিনিস আছে।

জ্যোতিষবাবু থ্রোসিমেকাসের মতো নিরুত্তর হয়ে গেলেন। কথা

পাল্টিয়ে বললেন, কিন্তু সেখানেও তো মানুষ আছে, আর লক্ষ্মী তো বলছে মফঃস্বলেই ডাক্তারি করবে। বৌমাকে নিয়ে গিয়ে সংসার তো পাতবেই, তবে আর ভাড়া গুণতে যাবে কেন? নিজের বাড়ি থাকলে—

লক্ষ্মীনাথ কাছেই কোথায় ছিল। সে বলে বসলে, রোজগার যদি করতে পারি তো তিরিশ চল্লিশ টাকা ভাড়া দিতে গায়ে লাগবে না। আর, প্র্যাক্‌টিস না জমলে তো চাকরিই করতে হবে, তখন কোথায় থাকবো তার ঠিক কি।

অর্থাৎ, বিয়ের পরই নিরিবিলিতে নববধূকে নিয়ে সংসারের স্বপ্ন কে না দেখে। কে টানতে চায় পিতামাতার যত্নের যন্ত্রণা!

জ্যোতিষবাবু তবু বলেন, কিন্তু বাড়ি তো আমাকে করতেই হবে কোথাও না কোথাও।

সমিতা ছোট মেয়ে। জ্যোতিষবাবুর উন্নতির শেষ শিখরে ওর জন্ম। তাই ইস্কুলে যেতে পায় ও একা। চিকে চোখ রাখতে পায়। মিশতে পায় সতীর্থদের সঙ্গে। ও যাদের সঙ্গে মেশে, তাদের সকলেরই নিজস্ব বাড়ি আছে, অতএব সেদিক থেকে সমিতার মনের একটা কোণে কিছুটা দুর্বলতাও আছে।

ও বললে, বাড়ি যদি করতেই হয় তো কোলকাতায়। খরচ তো একই, যা জমির দামটা একটু বেশী।

বীণাবতী বললেন, তা সমু সত্যি কথাই বলেছে বাপু।

—পাঁচ সাত হাজারও তো কম লাগে বর্ধমানে। জ্যোতিষবাবু বলেন।

মেজো ছেলে অতুল বললে, কিন্তু এখানে রিটার্ন পাবেন বেশী। আধখানা ভাড়া দিলে মাস গেলে দেড়শো টাকা ভাড়া পাবেন।

—বাড়ি কি ভাড়া দেব নাকি?

সে যাই হোক, বর্ধমানে হতে পারে না।

নির্ঝর নিস্তব্ধ হবে না তোমাকে নিরীক্ষণ করে। নোঙর ফেলবে না সময়।

জ্যোতিষবাবুর চিন্তা চাপা পড়ে যায় সংসার সংগঠনের নীচে।

হঠাৎ একদিন হৈ চৈ। মেজছেলে অতুল কি যেন করে বসেছিল। জোর করে ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বয়সটা খারাপ, সময় থাকতে বিয়ে দিলে শুধরে যেতে পারে। তা না হলে আবার কবে কি করে বসবে! পাড়াটাও খারাপ, লজ্জা তো নেই, হয়তো থানা পুলিশ অবধি করবে।

হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে।

মেজবৌমা দেখতে সুবিধের নয়। একটু সুন্দর দেখে বৌ আনলেই হ'ত। লক্ষ্মীর বেলায় তো টাকার লোভ ছিল না, অতুলের বেলাও লোভটা সংবরণ করলে ভালো হত।

হয়তো বাপের ওপর চটে গেছে। বৌমাকেও তো চিঠিপত্তর দেয় বলে মনে হয় না। নাগপুরে কি একটা কাজ নিয়ে চলে গেছে। চিঠি লিখলেও উত্তর দেয় না।

জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে সুখের স্বপ্ন বুনতেন জ্যোতিষবাবু। কিন্তু

আজ দেখছেন সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে আসছে, আনন্দ ততই যেন উবে যাচ্ছে। শেষের দিনগুলির জন্য হয়তো অনেক দুঃখ জমা হয়ে আছে।

না, আর মাত্র তিন বছর বাকী। স্থায়ী আসনের ব্যবস্থা করতে হবে সময় থাকতে। ছেলেরা কেউ এক বেলাও হাসিমুখে ভাত দেবে না। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

বাড়ি চাই। বাড়ি একটা করতেই হবে।

গীতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ কেন জানি বারানসীর দিকে মন চলে গেল। স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

বীণাবতী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন। —বলো।

—বলছিলাম কি, যে আর তো বছর তিনেক মোটে বাকী! তা একটা বাড়ির ব্যবস্থা তো দেখতে হয়।

—তোমার ঐ ভাবা পর্যন্তই, বাড়ি আর হবে না কোনদিন।

—হবে না কেন, করলেই হয়।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন জ্যোতিষবাবু। তারপর বললেন, তা দেখো, বুড়ো বয়সে কি আর কোলকাতা টোলকাতা ভালো লাগে। বলছিলাম শেষ দিন ক'টা কাশীবাস করে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। ধরো কাশীতে যদি একটা বাড়ি করি?

বীণাবতী উল্লসিত হয়ে উঠলেন। —সে তো ভালোই, তাই করো।

—ধরো গঙ্গার ধারেই ছোট্ট দেখে একখানা বাড়ি, দুবেলা গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথের মন্দির। কাশীতে শাকসবজি কত সস্তা। এক একটা বেগুন আধ সের, এক আনা কি ছ' পয়সা সের। মটরশুঁটি, কপি, তারপর তোমার রাবড়ি, প্যাঁড়া।

উদরোন্মুখ জ্যোতিষবাবুর কথায় বীণাবতী না হেসে থাকতে পারেন না। বুড়ো বয়সেও খাওয়ার চিন্তা।

তবু গম্ভীরভাবেই বললেন, না সে ভালোই, কাশীতেই হোক।

কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন জ্যোতিষবাবু। আচ্ছা, কাশীতে জমির দাম কত করে? আন্দাজ? আন্দাজ কি এতদূর থেকে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, নৃপেনবাবুর খুড়শ্বশুর থাকেন কাশীতে, তাঁকে চিঠি লিখে জানতে হবে। নৃপেনবাবুকে বলতে হবে একখানা চিঠি লিখতে।

বাড়িখানা অবশ্য একটু বড় দেখেই করতে হবে। দেশ থেকে, এখান থেকে যারা যাবে, তাদের তো আর ধর্মশালায় উঠতে দেওয়া যায় না, ছেলে-মেয়েরাও তো যাবে মাঝে মাঝে।

দোতলা তো নিশ্চয়; ওপরে খান পাঁচেক ঘর, নীচে খান পাঁচেক। রান্নাঘর, ভাঁড়ার, পায়খানা আর চৌবাচ্চা—ওপরেও হবে, নীচেও হবে।

রাস্তার ওপর। কিম্বা গঙ্গার ধারে জমি নিতে হবে। মন্দির থেকে বেশী দূর হলে চলবে না। অবশ্য, তাতেও কিছু এসে যায় না, এক পয়সা মাইলে এক্কা ছুটবে—শেয়ারে।

সাঁচীর দিকে হলে দোষ কি? আর নয়তো রামনগর কি চুনার? না। সে তাহলে কাশীবাস হল না।

কাগজের ওপর ছক কাটতে শুরু করেন জ্যোতিষবাবু। কোথায় কোন ঘর হবে, কোন দিকে দরজা আর কোন দিকে জানালা।

সব প্রায় সমাধা করে এসেছেন, নৃপেনবাবুকে দিয়ে চিঠিও লিখিয়েছেন, এখন কেবল উত্তরের অপেক্ষায়।

বাইরের দেয়ালগুলো পয়েণ্টিং না প্লাস্টার, কি করবেন? ভেতরের দেয়াল বাফ রঙে ডিসটেম্পার করিয়ে নেবেন। আরো কত কি কল্পনা করছিলেন।

সব ভেঙে গেল হঠাৎ। নৃপেনবাবুর খুড়শ্বশুরের চিঠিতে। কাশীধাম নাকি বদলে গেছে। কাশী আর সে কাশী নেই। ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া বেরিবেরি থেকে শুরু করে পঞ্চাশ রকম রোগ। জমিও ভালো পাওয়া যায় না। যা আছে তা শহরের বাইরে।

অতএব, কাশী বাতিল।

বোশেখ থেকে বোশেখ। আরেকটা বছর কেটে গেল।

এই একটা বছরে অনেকখানি বুড়ো হয়ে গেছেন জ্যোতিষবাবু। অম্বলের রোগ ধরেছে। বার্লি খেয়ে অপিস করেন।

বড় ছেলে শ্রীরামপুরে প্রাকটিস জমিয়েছে, মাঝে মাঝে চিঠিপত্তর দিয়ে খোঁজ খবর নেয়। মেজছেলে অতুল পুজোর সময় একবার বাড়ি এসেছিল। তারপর থেকে আর কোন চিঠি দেয়নি।

সূর্যেন্দুর সঙ্গে ভাব হওয়া মেয়েটি এসেছিল একদিন। সূর্যেন্দুই নিয়ে এসেছিল। মেয়েটিকে দেখতে অদ্ভুত সুন্দরী—সে-কথা জ্যোতিষবাবু একশোবার বলবেন, কিন্তু স্বজাত তো নয়। সূর্যেন্দু বলে, এ যুগের জাত হল টাকায়, আর মঞ্জুশ্রী সেদিক থেকে অনেক উঁচু জাতের। ধনী পিতার একমাত্র মেয়ে সে।

কিন্তু সূর্যেন্দুর ব্যবহারটা তাঁর ভালো লাগে না। কেমন যেন নির্লজ্জ। মঞ্জুশ্রী যখন প্রণাম করলো, মেয়েটিকে চিনতে না পেরে বিস্মিত হয়েছিলেন জ্যোতিষবাবু। কিন্তু আরো বিস্মিত হলেন সূর্যেন্দুর কথায়।

মঞ্জুশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বাবা। তারপর তাঁর দিকে তাকিয়ে, মঞ্জুশ্রী। আপনার ভাবী বৌমা। কথাটা অত্যন্ত গম্ভীরভাবেই বলেছিল সূর্য, কিন্তু জ্যোতিষবাবুর চোখে ব্যাপারটা কেমন ঘৃণ্য লাগে।

মেয়েটির ব্যবহার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে তাঁর। কলেজে পড়া মেয়েদের মধ্যেও যে এতখানি শীলতা থাকে জ্যোতিষবাবু কল্পনাও করতে পারেন নি এর আগে। মঞ্জুশ্রী বেশ ভালো মেয়ে, পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত তো বটেই, বরং বলা চলে সূর্যেন্দুই ওর যোগ্য নয়।

কিন্তু না, বিয়ে দিতে তিনি পারবেন না। এতদিনের সংস্কার, কৌলিন্য, সুনাম, বংশগৌরব—নষ্ট করতে পারবেন না। যদি স্বজাতি হ'ত।

আহারের পর গ্লাসে জোয়ানের আরক ঢালতে ঢালতে ভাবেন। ভাবেন, সূর্যেন্দুকে এখনো হয়তো ফেরাবার উপায় আছে।

মাসখানেকের ছুটি নিয়ে চেঞ্জে যাবেন ঠিক করছেন। সূর্যেন্দুকেও সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেতে কি চাইবে? ওকে বোঝাতে হবে ওর সাহিত্যচর্চা একেবারে হচ্ছে না, বাইরে গেলে কিছু হতে পারে।

আসলে, সূর্যেন্দুকে অত্যন্ত ভালোবাসেন জ্যোতিষবাবু। একটু দুর্বলতা, তাই কিছু বলতে পারেন না।

সূর্যেন্দু 'না' বললে না। তাঁর সংগে মধুপুরে সেও গেল।

কেন জানি মধুপুর জায়গাটা জ্যোতিষবাবুর খুব ভালো লেগে গেল। মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, আর মাত্র দু'বছর বাকী। চাকরি থেকে অবসর নিতে আর মাত্র দু'বছর। বাড়ি একটা বানাতেই হবে, অতএব, মধুপুরেই বা নয় কেন।

দু'বেলা ভ্রমণের ফাঁকে জমি খুঁজে বেড়ান জ্যোতিষবাবু।

বাড়িতে কাউকে কিছু বলবেন না। এর আগে তিন তিনবার বলে ঠকেছেন। একটা না একটা বাধা ওরা দেবেই। বিশেষ কেউ অবশ্য সংগে আসেনি। ভয় স্ত্রী বীণাবতী আর ছোটমেয়ে সমুকে। সূর্যেন্দু তো নির্বিকার। তবু বললেন না কাউকে।

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে জমি খোঁজেন জ্যোতিষবাবু। পছন্দ-মত জমি পেলেই দরদস্তুর করে আসেন। শেষে পছন্দসই একটা জমির খোঁজ পেলেন জ্যোতিষবাবু। দামও বেশী নয়।

কিন্তু। জমিটা কেনবার আগে প্ল্যান একটা এঁকে ফেলতে হবে। কাগজকলম নিয়ে বসে পড়েন। আঁকজোক কাটেন। ঘরের সংখ্যা, বারান্দার দৈর্ঘ্য।

সব শেষ করে কথাটা খুলে বললেন বীণাবতীকে।

—জমি তো ঠিক করেছি এই মধুপুরেই।

—তা বেশ তো।

—এই দেখো বাড়ির প্ল্যান।

—ও ছাই বুঝি না, বলো দোতলা না একতলা, কখানা ঘর?

—করি তো দোতলাই করবো।

—তা করো না এখানেই, মন্দ কি। জমিটা কোথায়?

কিন্তু জমিটা কোথায় তা আর বলতে হ'ল না। তার আগেই সমিতা বেণী দুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, ম্যাগো। মধুপুরে আবার মানুষ বাস করে শখ করে? এখানে সবাই চেঞ্জেই আসে জানি।

—তা আমারো তো চেঞ্জ দরকার।

সমিতা বললে, জানতাম না তাই আসতে দিয়েছি তোমাকে। বিকেলে বেড়াতে যাই, দু'পাশে শুধু খুক্ খুক্ কাশি। অম্বল সারাতে এসে শেষে একটা বড় রোগ ধরুক আর কি।

সূর্যেন্দু বেশী কথা বলে না। বললে, সামনের বাড়ির গাড়িবারান্দার কাছে রেডোক্সেনের একটা ভাঙা অ্যাম্পিউল দেখছিলাম কাল।

অতএব, মধুপুর হতে পারে না।

আশ্চর্য! চার বছর ধরে হাওয়ায় হাট বসাবার কল্পনাই করেছেন,

কাজ এগোয়নি এতটুকু। কেবল জল্পনা কল্পনা, কেবল জরিপ আর নক্সা, কাঠ আর কংক্রিটের স্বপ্ন।

বুড়ো হয়ে আসছেন। আসছেন? এর মধ্যেই তো বেশ পাক ধরেছে চুলে, দু'দিন পরেই চাকরি থেকে অবসর নেবেন। তারপর?

তারপর।

আয় কমবে। মাসে দু'শো টাকা ভাড়া গুণতে পারবেন আর? কোথায় যাবেন তখন, কে দেবে বিনামূল্যের বসতি। স্থায়ী সুখ আর অফুরন্ত অবসর পেতে হলে নিজের বাড়ি চাই। নিজস্ব বাড়ি। যেখানে জলের পাম্প নিয়ে দু'বেলা ঝগড়া করতে হবে না বাড়িআলার সঙ্গে। যেখানে 'ভাড়াটে' অপবাদ সইতে হবে না। যেখানে থাকবে শান্তি আর শৃঙ্খলা।

না কোলকাতাতেই একটা বাড়ি বানাবেন।

বাড়িআলার সঙ্গে ইদানীং প্রায়ই মনোমালিন্য ঘটছে। তাকে দেখাতে হবে যে, তিনিও পারেন শহর কোলকাতার বুকে একখানা বিরাট বাড়ি হাঁকাতে। সে সঙ্গতি তাঁর আছে। আছে তো সত্যিই। অতএব এত কি গরব দেখায় বাড়িআলা। না হয় বাড়িই করেছে একখানা, জ্যোতিষবাবু ইচ্ছে করলে এর চেয়ে অনেক ভালো বাড়ি করতে পারেন।

ইচ্ছে করলে কেন, বাড়ি তো করবেনই। এই শহর কোলকাতার বুকেই বাড়ি তৈরি করবেন।

এবার আর নিজের প্ল্যান নয়। রীতিমত আর্কিটেক্ট ডাকিয়ে উপদেশ চাইলেন। কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে চলতে লাগলো ফোনালাপ, ঘোরাফেরা করতে লাগলো ব্লু প্রিণ্টের রাশি।

কিন্তু কোনটাই জ্যোতিষবাবুর মনঃপূত হয় না।

এমন সময় বীণাবতী মনে পড়িয়ে দিলেন, ছোট মেয়ে সমিতার বিয়ে দিতে হবে। ষোলয় পা দিয়েছে সে। শুধু কি তাই? রাতে আলো জ্বলে কেন তার ঘরে। নীল কাগজের চিঠির প্যাড কিনেছে কেন সমু? ডাকলে শুনতে পায় না কেন, কথা বললে উত্তর দেয় না কেন?

সমিতার ভাবনা জ্যোতিষবাবুকে বিচলিত করে নি।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলেন তিনি সুর্যেন্দুর কাছ থেকে।

"ধনী পিতার একমাত্র কন্যা হয়েও যে সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে চলে আসতে পারে, তোমাদের সম্মতির আশায় মিছে অপেক্ষা করে করে তো তার জীবনটা নষ্ট করতে পারি না। তাই, তোমাদের কাছ থেকে সরে এলাম। আশা রাখবো জীবনের শেষ দিন অবধি যে, তোমরা একদিন না একদিন ক্ষমা করবার সুযোগ পাবে।

"মঞ্জু হয়তো তোমাকে আর মাকে একদিন প্রণাম করতে যাবে। একাই। আমার ওপর তোমাদের যত ক্রোধ তা যেন সে বেচারীর ওপর না পড়ে।

"মা ও তুমি আমার প্রণাম নিও। ইতি—

সুর্যেন্দু।"

এদিকে মেয়ের বিয়ের জন্য তাড়া দিচ্ছেন বীণাবতী।

কথায় কথায় বলেন, তখনই বলেছিলাম, পাশ করেছে এবার বিয়ে দিয়ে

দাও। তা না, তখন হ'ল রোজগার করুক। এমন সোনার চাঁদ ছেলে সূর্যেন্দু—

কথা শেষ হয় না, বীণাবতীর চোখের কোণে জল দুলতে থাকে।

জ্যোতিষবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, সমুর বিয়ে তো, তা ব্যবস্থা করছি, ব্যবস্থা করছি। ঐ তো আসানসোলের সেই ছেলেটির খোঁজ নিতে লিখেছি রাধুকে।

এইভাবে সূর্যেন্দুর জন্য শোক আর সমিতার জন্য স্বামীর ভাবনা ভাবতে ভাবতে কোথা দিয়ে যে একটা বছর কেটে গেল টের পেলেন না জ্যোতিষবাবু। হঠাৎ একদিন দেখলেন—দেখলেন কেন, আবিষ্কার করলেন, যে তিনি বেকার।

ছোটবেলায় পড়াশুনো শেষ করে একবার বেকার হয়েছিলেন, আজ কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে জ্যোতিষবাবু আবার বেকার হয়ে পড়লেন।

চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী নটায় স্নান সেরে, ভাতের জন্য তাড়া দিলেন। বীণাবতীর খেয়াল ছিলো না। আপিসের পোশাক পরে মা-কালীর ছবিটাকে প্রণাম করে জ্যোতিষবাবু বেরুতে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর নিজেরই মনে পড়ে গেল যে, গতকাল সব চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন তিনি।

তবু আপিসে বেরিয়ে গেলেন। লজ্জায় ভাঙতে পারলেন না কথাটা স্ত্রীর কাছে। যাক্, সকলের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করে আসা যাক্। ফিরে এসেই আবার বাড়ি তৈরির চিন্তায় ডুবে গেলেন জ্যোতিষবাবু। অনেক ভাবলেন। ভেবে ঠিক করলেন, না, বাড়ি তৈরি করে কাজ নেই।

—সে কি! বাড়ি না করলে, থাকবে কোথায়? বীণাবতী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

জ্যোতিষবাবু থেমে থেমে বললেন, একটা বাড়ি তৈরী করতে যাওয়া, মানে পঁচিশ-তিরিশ হাজার কম করে। তার চেয়ে টাকাটা ব্যাংকে রাখলে বেশ কিছু সুদ পাওয়া যাবে বসে বসে। পেনশন তো নেই, চালাবো কিসে? তার চেয়ে সুদের টাকায় বেশ বেড়ানো যাবে, আজ গয়া, কাল বৃন্দাবন। পুরীটাও যাওয়া হয়নি বহুদিন।

বীণাবতীও ভেবেচিন্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা ঠিক।

এর পরও দুটো বছর কেটে গেছে। বাড়ি তৈরির কল্পনা নিয়ে আর কোনদিন বিভোর হয়ে ওঠেননি।

দিব্যি সুখেই দিন কাটাচ্ছেন। সমিতার বিয়েও হয়েছে সুপাত্রে। ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, মাঝে মাঝে ঘুরে আসেন তীর্থে তীর্থে। বড় ছেলে আর মেজো ছেলের কাছেও যান কখনো-সখনো।

সূর্যেন্দু প্রায় ত্যাজ্যপুত্র। মঞ্জুশ্রী মেয়েটি খুব ভালোই, কিন্তু স্বজাতি তো নয়। মাঝে মাঝে সূর্যেন্দুর জন্যেই একটু ব্যথা পান। তা না হলে জ্যোতিষবাবুকে সুখীই বলা চলতো।

ন ষ্ট না রী

মোগলসরাই স্টেশনে এসে ট্রেনটা যখন পৌঁছলো রাত তখন দশটা বেজে গেছে। এরপর আর লোকালটার জন্যে অপেক্ষা করা যায় না। 'এ পথ-টুকু টাঙা নয়তো এক্কাতেই যাওয়া যাক'—করুণাময় বললে।

রাত দশটা বলতে কি বোঝায় স্টেশনের ঝকঝকে আলোয় এতক্ষণ ওরা কেউই ঠাওর করতে পারেনি। টের পেল আলোর এলাকা পার হয়ে এসে। ওভারব্রিজের এদিকে নামতেই গা-ছম-ছম অন্ধকার। একটা বিড়ির দোকানে টিমটিমে হ্যারিকেনটা জ্বলছে শুধু, কোলে কুলো নিয়ে বিড়ি পাকাচ্ছে একজন। আর ঘাস চিবোতে চিবোতে পা ছুঁড়ছে ঘোড়াটা, মশার কামড়েই হয়তো।

একটাই টাঙা। শেয়ারে ভাড়া ঠিক করে উঠে পড়লো ওরা। করুণাময় আর নীলা। কোলের ছেলেটাও।

বঁড়শির মতো বাঁক নিয়ে টাঙাটা হঠাৎ ছুটতে শুরু করলো। এমন ঝাঁকানি, শক্ত করে ধরে না বসলে এখনি বুঝি ছিটকে পড়বে রাস্তায়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই নির্জন আর নিঃঝুম অন্ধকারের মাঠে নামলো টাঙাটা। পীচের পথটুকুর ওপরই যেন রাজ্যের অন্ধকার এসে জমেছে। চারদিক চুপচাপ। কোথাও কোন শব্দ নেই, কোথাও কোন আলো নেই। দু'পাশের ঢালু মাঠের মাঝ দিয়ে শুধু শিরদাঁড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে লম্বা মেটাল রোড। দু'জোড়া খুরের টপাটপ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না।

পথের দু'পাশে গাছের সারি, ছায়া শরীরের রহস্য মেখে নিঃশ্বাস চেপে আছে। স্তব্ধতা ভাঙবার জন্যে মাঝে মাঝে দু'চারটে কথা বলে নীলা, দু'চারটে কথার জবাব দেয় করুণাময়। তারপর আবার সেই নীরবতা। বাচ্চাটাকে এক বুক থেকে আরেক বুকে বদলে নিতেই হাতের চুড়িতে টুংটাং আওয়াজ উঠলো। ভয় হবার কথা বটে, নেই নেই করেও হাতে গলায় কোন্ না হাজার পাঁচেক টাকার সোনা আছে। আর এমন নির্জন রাতের রাস্তায় টাঙাওলাদের গুণ্ডামির কথাও শোনা গেছে। লোকটা অবশ্য রোগাসোগা, কিন্তু করুণাময়ই বা কি এমন পালোয়ান! তা ছাড়া রাস্তার কোথাও দলের লোকও যে অপেক্ষা করছে না, তাই বা কে বলতে পারে। করুণাময়ও যেন অনেকক্ষণ চুপচাপ, কথা বলছে না কেন? ভাবতেই কেমন ভয় ভয় করলো, পিছন ফিরে তাকালে নীলা। না, গঙ্গার পুল এখনো অনেক দূরে। দূরের আলোর সারিও গাছপালায় ঢাকা পড়েছে।

গাড়িটা খাড়াই উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু শব্দ ভেসে আসছে কিসের? টাঙারই ডুমডুমি যেন, ঘোড়ার খুরের টপাটপ টপাটপ আওয়াজ আসছে। ওদের গাড়িটার অনেক আগে আগে আরেকটা টাঙা

চলেছে বোধ হয়। হ্যাঁ, ঘাড় ফিরিয়ে সামনের পথের দিকে তাকালে নীলা, অনেক আগে এক টুকরো সলতে-পোড়া লণ্ঠন দুলছে মনে হ'ল।

তারপর হঠাৎ এক সময় আলো অদৃশ্য হয়েছিল, শব্দ শোনা যায়নি। কখন আপনা থেকেই ভয় মুছে গিয়েছিল নীলার মন থেকে। তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসছিল একবার, আবার পরমুহূর্তেই চোখ টেনে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছিল। আর সেই ফাঁকে কখন সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ একটা চিৎকারে চমকে জেগে উঠলো নীলা। আর পরক্ষণেই আতঙ্কে শিউরে উঠলো। খোকন কৈ? যাক, পড়ে যায়নি, করুণাময়ের কোলেই আছে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কখন করুণাময়ের কাঁধে মাথা রেখেছিল ও, আর সেই ফাঁকে নীলার অজান্তেই খোকনকে কোলে তুলে নিয়েছে করুণাময়।

কিন্তু চিৎকার কিসের? ভালো করে চেয়ে দেখলে নীলা।

এক পাশে একটা টাঙা, আর বিদ্ঘুটে চেহারার একটা লোক দু'হাত তুলে ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় অস্পষ্ট হলেও লোকটাকে দেখা গেল। বেঁটে আর মোটা। কালোও নিশ্চয়ই। শুধু সাদা ফুটফুটে একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি দাঁড়িয়ে আছে যেন। মুখটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে, পাঞ্জাবির হাতা দুটোর ভেতর থেকে রক্তমাংসের কোন হাত বেরিয়ে এসেছে বলে মনেই হ'ল না। কন্ধকাটাও বোধহয় এতখানি বীভৎস নয়।

আতঙ্কের ঝিম্‌ঝিম্‌নি দূর হতেই চোখ পড়লো আরো একজনের ওপর। দেখলে, টাঙাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। কপাল অবধি ঘোমটায় ঢাকা এক টুকরো ফর্সা মুখ। আড়নম্র চোখে হয়তো ওদেরই লক্ষ্য করছে।

ইতিমধ্যে কি যেন কথা হ'ল করুণাময় আর ঐ গুণ্ডা মতো লোকটার সঙ্গে। কি বিশ্রী আর মোটা লোকটার গলার স্বর। আর গায়ে শক্তিও তেমনি। বাক্স প্যাঁটরাগুলো ও-গাড়ি থেকে এ-গাড়িতে এনে রাখলো এমন অবহেলায় যেন দুটো হাল্কা সুটকেশ আনলো।

—শালার ঝামেলা! বোধহয় করুণাময়কেই শোনাবার জন্যে বললো, মাঝ রাস্তায় চাকা ভেঙে পড়ে রইলেন। আপনারা না থাকলে কি দশাটা হ'ত বলুন তো? কথার শেষে সশব্দে হেসেও উঠলো লোকটা, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'পাটি সাদা সাদা দাঁত ঝকঝক করে উঠলো।

করুণাময় বিরক্তির গলায় বললে, আসুন তাড়াতাড়ি, এমনিতেই রাত অনেক হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে বৈকি। লোকটা একটা তুড়ি বাজালো হাতে, শ্যামু, উঠে পড়ো চটপট।

মেয়েটি এগিয়ে এলো ধীরে ধীরে, টাঙার আড়াল থেকে। ঘোমটাটা টেনে বাড়িয়ে দিলে একটু। তারপর পা-দানিতে পা দিয়ে ওঠবার আগেই ওকে টুপ করে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরলো লোকটা, বসিয়ে দিলো সামনের আসনে। নিজেও উঠে বসলো।

টাঙা ছেড়ে দিতেই ঝর্‌ঝর্‌ করে ভয়ের ঘাম ঝরে পড়লো। তবু কেমন অস্বস্তি লাগলো নীলার। পিঠোপিঠি বসেছে ওরা, মাঝখানে ইঞ্চি-খানেকের একটা কাঠের ব্যবধান থাকলেও ঝাঁকানির চোটে পিঠে পিঠ লাগছে মাঝে মাঝে। আবার তাও ঐ অদ্ভুত লোকটাই বসেছে ওর পিছনে। করুণাময়ের পিঠেও কি ঐ মেয়েটির পিঠ লাগছে? নীলা ভাবলে এক মুহূর্ত, আড়চোখে একবার তাকিয়ে মনে মনেই হাসলে।

গঙ্গার পুলে উঠতেই ওপারের আলো-ঝলমল শহর চোখে পড়লো। ঠাণ্ডা জলো বাতাসের প্রলেপ পড়লো সারা গায়ে। ফিসফিস করে বললে, ধর্মশালার খবরটা নাও না এবার।

করুণাময় খানিক কিন্তু কিন্তু করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবেন আপনারা?

—চৌখাম্বা, চৌখাম্বার বাজারের মুখে। নিজের বাড়ি আছে আমার। বিশ পঁচিশ, হ্যাঁ, বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল এখানে। বিশ্বনাথের গলিতে একটা জরির, একটা তামা পেতলের দোকান আছে আমার। নিবারণ মাইতি—নিবারণ মাইতির জরি-বুটির দোকান বললেই যে কেউ দেখিয়ে দেবে।

বেঁটে থামের মতো চেহারা লোকটার। অথচ চোখেমুখে কথার খই ঝরছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নীলাকে হাসি চাপতে হবে বুঝি এইবার। ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার দিকে তাকালে নীলা, দেখতে পেল না বিশেষ কিছু। মনে হ'ল অন্ধকারটা হঠাৎ এক জায়গায় ঘন হয়ে আবছা মূর্তি নিয়েছে শুধু, মানুষ নয়।

করুণাময় কি বলতে চায় সেদিকে হুঁসই নেই নিবারণের, নিজের মনেই অনর্গল আত্মকাহিনী আউড়ে যায়। ভদ্রতার খাতিরেও জিজ্ঞেস করে না, কোথায় যাবেন, কোথায় উঠবেন? টাঙাটাও এদিকে গঙ্গার পুল পার হয়ে আলো-উজ্জ্বল শহরে ঢুকছে।

করুণাময় শেষে নিজেই প্রশ্ন করলে, ভালো ধর্মশালা বা হোটেল টোটেলের খবর দিতে পারেন?

—ধর্মশালা? ভালো অথচ ধর্মশালা? আসল উত্তর এড়িয়ে গিয়ে লোকটা আবার বাকবকুনি শুরু করলে। তার চেয়ে বলুন না সোনার পাথরবাটি। হেঁ হেঁ করে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো লোকটা। বললে, বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল মশাই, এই কাশীতে, চোখ বেঁধে ছেড়ে দিন চৌখাম্বার বাড়ি থেকে, ঠিক দেখবেন দোকানে পোঁছে যাবো, একটা কলার খোসাতেও পা পড়বে না। আর আপনি বলেন কিনা—

—না, মানে খবরটা পেলে উপকার হতো।

—খবর আমি না দিলে কে দেবে শুনি। ধর্মশালাই বলুন অধর্মশালাই বলুন, কাশীর সব শালাকেই আমি চিনি। ডালকামুণ্ডিতে চলে যান সিধে, বাঙালীর হোটেল চান তাও পাবেন। তবে পাড়াটা খারাপ, বাঈজী বেবুশ্যেদের আড্ডা......

কথা পাল্টাবার জন্যে করুণাময় তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, হোটেলের নামটা কি বলে দিন না?

—মুখুজ্যে, মুখুজ্যের হোটেল বললেই নিয়ে যাবে। আমার পেয়ারের লোক হচ্ছে, গিয়ে বলবেন, নিবারণ মাইতি পাঠিয়ে দিলে। আমার নাম করতে ভুলবেন না যেন। এই রোখো, রোখো......টাঙাওয়ালার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো নিবারণ।

চৌখাম্বার গলির সামনেই টাঙা দাঁড়ালো। ছোটখাটো সুন্দর বৌটিকে টুপ করে আবার নামিয়ে দিয়ে বোঁচকাবুঁচকিগুলো দু'হাতে ঝুলিয়ে টাঙার পিছনে এসে দাঁড়ালো নিবারণ। নীলাকে বললে, আসি মা লক্ষ্মী, রইলেন তো এখন ক'দিন। যাবেন আমার দোকানে। বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকেই বলবেন, নিবারণ মাইতির জরিবুটির দোকান। তা হলেই দেখিয়ে দেবে। নমস্কারের বদলে কাঁধটা একটু ঝাঁকালে শুধু।—আসি তা হলে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে নীলা, আর সঙ্গে সঙ্গে নিবারণের আড়ালে দাঁড়ানো বৌটির দিকে চোখ গেল ওর। ঘোমটা খুলে পড়েছে। হঠাৎ যেন মেয়েটির সারা মুখে রক্ত জমে গেছে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে করুণাময়ের দিকে। ফিরে তাকালে নীলা। হ্যাঁ, বাজারের ঝলমলে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল নীলা, করুণাময়ের মুখেও অস্বাস্তির ছায়া।

—বৌ বুঝি?

মেয়েটি এগিয়ে এসে কৌতুকের হাসি হাসলে। তারপর একবার করুণাময়ের দিকে একবার নীলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, বৌ বুঝি?

—হুঁ। বলেই করুণাময় অন্য দিকে মুখ ফেরালে।

মেয়েটি তবু নাছোড়বান্দা। করুণাময়ের কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে আবার প্রশ্ন করলে, তোমার?

—হুঁ। আবার সেই গম্ভীর গলার ছোট্ট উত্তর।

—ছেলে না মেয়ে?

করুণাময় উত্তর দিলো না দেখে নীলাই বললে, ছেলে।

মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসলো। তারপর নিবারণের কানে কানে কি যেন বললে।

চমকে উঠলো নিবারণ।—অ্যাঁ! এতক্ষণ বল নি? আরে মশাই আসুন আসুন। নেমে আসুন, হোটেলে কোথায় যাবেন?

করুণাময় কোনরকমে বললে, না থাক। মুখুজ্যে না কার......

—হ্যাঁ মুখুজ্যের হোটেলে যাবেন! শালা এক নম্বরের জোচ্চোর। আসুন, নেবে আসুন। তাছাড়া, আপনি হলেন গিয়ে সম্বন্ধে আমার...... হে হে করে হাসলো নিবারণ—সবচেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, কি বলেন?

অগত্যা নামতেই হ'ল ওদের।

নীলা শুধু সকৌতুকে বললে, পরিচয়টা কি এ জন্মের, না গত জন্মের?

করুণাময় উত্তর দিলো না। পরিচয় তো গত জন্মের নয়, গত জীবনের।

শ্যামলীর সঙ্গে আবার দেখা হবে, এতদিন বাদে হঠাৎ এমনভাবে দেখা হবে ভাবতেও পারেনি করুণাময়। কত বদলে গেছে শ্যামলী, নতুন

মানুষ হয়ে গেছে। আর, আর সারা রাস্তা ওর পিঠের স্পর্শ পেয়েও করুণাময় বুঝতে পারেনি, সন্দেহ হয়নি একবারের জন্যেও। অথচ, এই তো ক'টা বছর আগে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলে বুঝতে পারতো।

কাছাকাছি বাড়িতেই থাকতো ওরা। করুণাময়ের সঙ্গে বাড়িতে এসে দেখা না করতে পারলেও দেখা দিয়ে যেত সে প্রতিদিন বিকেলে। রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান পেতে বসে থাকতো করুণাময়। তারপর ওর বোনের সঙ্গে দুর দুর করে কাঠের সিঁড়িতে শব্দ করে ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে আসতো শ্যামলী। দু'একটা সকৌতুক ইশারা ইঙ্গিত, দু'চারটে ছোট ছুটকো কথা ছাড়া আর কিছু হ'ত না অবশ্য। তবু নিজের ঘরে বসে বসে ওদের উচ্চকিত হাসি আর কথা শুনতো ও। আবার যখন সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা পায়ে নেমে যেত শ্যামলী, তখনও ঠিক বুঝতে পারতো করুণাময়।

শুধু কি তাই! একদিন ওর অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে সারাটা দুপুর কাটিয়ে গিয়েছিল শ্যামলী। সুধার সঙ্গে গল্প করতে করতে ওর বিছানায় শুয়েও ছিল হয়তো। একটিমাত্র স্প্রিংয়ের মতো কোঁকড়ানো চুল দেখে ধরতে পেরেছিলও, টেবিলের ওপর ছড়ানো কাঁচিতে-কাটা কাগজের টুকরো-গুলো দেখেই চিনেছিল কার কান্ড।

তারপরেও ওর ঘরে বহুবার এসেছে শ্যামলী। পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা তো দূরের কথা, সব ওলটপালট করে দিয়ে যেত সে। আলমারি ঘেঁটে এ থাকের বই ও থাকে, ও থাকের বই টেবিলের ওপর এনে রাশ করে রাখতো। কোনদিন চাদরটা চেয়ারে আর মাথার বালিশ পায়ের দিকে ফেলে দিয়ে গেছে। তবু বেশ লাগতো করুণাময়ের। শ্যামলী এসেছিলো, ওর ঘরের বাতাসে তার স্পর্শ রেখে গেছে, একথা ভাবতেও রোমাঞ্চ অনুভব করতো করুণাময়।

ভোর ছ'টার সময় কলেজ বসতো শ্যামলীদের। ছ'টা বাজার আগেই ট্রামেবাসে, ফুটপাতের ধারে ধারে, পার্কের রেলিং ঘেঁষে রঙবেরঙের পাখির মতো শাড়ি জড়ানো মেয়েদের ভিড় দেখা যেত। ঘুম-ভাঙো-ভাঙো শিশিরে ধোয়া নরম-শরম চোখ আর হাসিতে ভেজা ঠাণ্ডা কথার কৌতুক ভেসে উঠতো।

করুণাময়ও এসে দাঁড়াতো এই সময়েই। একটা থামের পাশে থামের মতোই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো। পূর্বদিকের রাস্তাটার দু'পাশে উঁচু উঁচু বাড়ির সারি, তারই ফাঁকে সিঁথির মতো সরু এক ফালি আকাশ দেখা যেত, রুপো চমক দিতো। ফিকে ফিকে লোক চলাচল শুরু হ'ত, কাঁধে হোসপাইপ ব'য়ে নিয়ে জলঝুরি ছিটিয়ে যেত দুটো লোক।

তারপরই হঠাৎ এ গলি সে গলি থেকে এক ঝাঁক পায়রার মতো মিষ্টি মেয়ের দল এসে হাজির হ'ত এই মোড়টায়। কথা আর হাসিতে বাতাস কেঁপে উঠতো। রাস্তার ধারে ধারে, পার্কের গায়ে গায়ে কলেজের ফটক অবধি তীর্থকন্যাদের ভিড় হোত শুধু।

বাতাসের মতো সোঁ সোঁ শব্দ করে একটার পর একটা ট্রাম পিছলে এসে থামতো মোড়ের মাথায়। তারপর আরেক দফা দম নিয়ে একেবারে

কলেজের গেটে। পাখা ঝটপট করে বেরিয়ে আসতো ওরা সবাই, একজন ছাড়া।

শ্যামলী। কলেজ পৌঁছবার আগেই শ্যামলী নেমে পড়তো। একটা স্টপেজ আগে, মোড়ের মাথায় ট্রাম থামতেই একরাশ মোটা মোটা বইখাতা বুকে চেপে টুপ করে নেমে পড়তো ও। ছোটখাটো একহারা শরীর, চটুল চোখ, চতুর দৃষ্টি। আর মুখের হাসির মতোই চঞ্চল, স্বতঃস্ফূর্ত। বাঁহাতে বইপত্তর, ডান হাতে পিছনে রবারের টুকরো লাগানো একটা হলদে পেন্সিল।

ট্রাম থেকে নেমেই শাড়ির আঁচলটা ঘুরিয়ে এনে পিঠ ঢাকতো, পাড়ের কোণাটা দাঁতে চেপে গালে পেন্সিল বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসতো ও। দূরে দাঁড়ানো করুণাময়ের দিকে।

শ্যামলীকে নামতে দেখে ট্রামের জানালায় বসা মেয়েরা ঠোঁট টিপে হাসতো, আলাপী দু'চারজন টীকাটিপ্পনী ছুঁড়তে কসুর করতো না। ঘাড় না ফিরিয়েও শ্যামলী বুঝতে পারতো, শুনতে পেত, হাসতো করুণাময়ের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই।

আর ট্রামটা চলে যেতেই ধুপ করে বই-খাতাগুলো করুণাময়ের হাতের ওপর ফেলে দিতো।

—বাঃ রে, তোমার বই-খাতা রোজ রোজ আমি বইতে যাবো কেন। অনুযোগ করতো করুণাময়।

শ্যামলী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিতো, ওমা, দু'দিন পরে আমাকেই বইতে হবে, বই-খাতাতে আপত্তি এখন থেকে?

তারপর, কোনদিন ফাঁকা মাঠের নির্জনতায় পার্কের ঘাসে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় কিংবা পথে পথে ঘুরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। পা ছড়িয়ে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসতো ওরা, আর চিনেবাদামের খোসার স্তূপ জমে উঠতো ওদের পাশে।

সেদিনও এসে বসলো ওরা নির্জন পার্কের কোণে, পুরোনো বেঞ্চিটায়। কিন্তু কিছুতেই যেন সহজ হতে পারলো না করুণাময়। ভালবাসা যতই গভীর হয়, মনের গোপনে ভয়ের বেলুন ততই হয়তো ফেঁপে ওঠে। ভালবাসা হারাবার ভয়। ভয় থেকে সন্দেহ। শ্যামলীকে এত কাছে পেয়েও যেন কাছে পাচ্ছে না করুণাময়, এত মন জানাজানির পরেও যেন দূরে সরে যাচ্ছে শ্যামলী।

প্রলাপের মতো নিরর্থক কথা আর কথা।

শ্যামলীর পিঠের ওপর হাত রাখলে করুণাময়। আরো কাছে টেনে আনতে চাইলে ওকে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালে শ্যামলী। ধীরে ধীরে করুণাময়ের হাত সরিয়ে দিলে ওর পিঠের ওপর থেকে।

এমন ঘটনা নতুন নয়। করুণাময়ের কাছে অজানা কোন বিস্ময় নয় শ্যামলীর এ ব্যবহার। মনের কপাট খুলে রেখেও স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে চায় যেন শ্যামলী। কিন্তু কেন?

সে প্রশ্নের উত্তর খ‍ুঁজে পায়নি কর‍ুণাময়। শ‍ুধ‍ু অসহিষ্ণ‍ু হয়ে উঠেছে কখনো-সখনো, আঘাত পায়নি।

সেদিনও আহত বোধ করলো না কর‍ুণাময়, কিংবা এত বেশী আঘাত পেল যে, অন‍ুভবের চেতনাও হারিয়ে ফেললো।

ঠিক্ অন্য অন্য দিনের মতোই শ্যামলী ওর হাতটা সরিয়ে দিতেই কর‍ুণাময় বললে, আমি জানতাম।

—কি জানতে? কপালে ভ্র‍ু তুলে স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করলে শ্যামলী।

ওর হাসি দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো কর‍ুণাময়।—হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'র না। এ চিঠি তোমারই লেখা।

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ছ‍ুঁড়ে দিলো কর‍ুণাময়। 'প্রেম নয় রে বোকা মেয়ে, ও আমার সময় কাটাবার সঙ্গী শ‍ুধ‍ু।'—কোন বান্ধবীকে লেখা শ্যামলীরই চিঠি। বিশ্বাস করে একান্ত গোপনে যে চিঠি ও লিখেছিল, তা যে কর‍ুণাময়কেই পাঠিয়ে দিয়ে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তা কি ও ভেবেছিল কোনদিন। শ্যামলী কি ক'রে বোঝাবে যে লজ্জা বাঁচাবার জন্যে, সত্য ঢাকবার জন্যে অনেক মিথ্যেই মেয়েদের বলতে হয়।

—তোমার কাছে এতদিন যা বলেছি, তার কোন দাম নেই, যা লিখতে বাধ্য হয়েছি, সেইট‍ুকুই সত্যি হ'ল? দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল এলো শ্যামলীর।

তারপর কিছ‍ুদিন চলেছে না দেখার, না দেখা দেয়ার অভিমান। আবার ভুল ভেঙেছে, সন্দেহ দ‍ূর হয়েছে। বিরহশেষের উন্মাদনায় মিলনের দিনকে কাছে টেনে আনবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছে কর‍ুণাময়।

ভয়ে আনন্দে থরথর করে কেঁপে উঠেছে শ্যামলী, অন‍ুরোধের স্বরে বলেছে, না, না, বাবার অমতে কিছ‍ু করতে বলো না আমায়। কখনো কৌতুকে হেসে উঠেছে শ্যামলী।—ইস্কুলের মেয়ের মতো পালিয়ে যাওয়া, না, মরে গেলেও তা পারব না আমি।

তব‍ু, চুপি চুপি একদিন ওর দিদির কাছে খ‍ুলে বলেছে সব কথা। মাকে অনেক ছোটবেলাতেই হারিয়েছে, তা নইলে মাকেও বলতে বাধতো না হয়তো। কিন্তু সব স্নেহ মমতা উপেক্ষা করেছেন শিবব্রতবাব‍ু। না, এ অনাচার তিনি হতে দেবেন না, এমন অসামাজিক ঘটনা তাঁর বংশে ঘটতে পাবে না। মা হারা মেয়েকে মান‍ুষ করেছেন তিনি, জীবনে কোন আঘাত দেননি মেয়েদের, কিন্তু, কিন্তু এ অবৈধ বিবাহ তিনি সমর্থন করতে পারবেন না।

মেয়ের ইচ্ছায় বাধা দেননি কখনো, কলেজে পড়তে দিয়েছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু, না, এ হতে দেবেন না শিবব্রতবাব‍ু।

বলেছেন, শ্যামলীকে কলেজে যেতে হবে না আর, বলে দিও।

বলেছেন, বাড়ি থেকে বেড়াতে যেতে হয় আমার সঙ্গে যেতে বলো।

বলেছেন, শ্যামলীর ওপর একট‍ু চোখ রেখো চামেলি।

তাই, কর‍ুণাময়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতেও যতি পড়েছে একদিন। আর

অন্ধ আক্রোশে বাবার ওপর গুমরে মরেছে শ্যামলী, বিছানায় পড়ে পড়ে কেঁদেছে, কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে শুধু।

তারপর।

তারপর হঠাৎ একদিন উঠে দাঁড়িয়েছে ও। হিংস্র আনন্দে নিজের মনেই হেসে উঠেছে।

ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন শিবব্রতবাবু। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন।—এসেছো। গম্ভীর গলায় বললেন শুধু।

ধীরে ধীরে পাইপটা তেপায়ার ওপর নামিয়ে রেখে করুণাময়ের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে গেলেন একবার।—স্কাউন্ড্রেল! চিৎকার করে উঠলেন হঠাৎ।

—তুমি শিক্ষিত? তুমি ভদ্রসন্তান? গর্জে উঠলেন শিবব্রতবাবু।

করুণাময় উত্তর দিলো না কোন। কি উত্তর দেবে ও? ও নিজেই জানে না কেন এ ক্রোধ, এ অপমানোক্তি। শিবব্রতবাবুর কাছে এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে ও আসেনি।

—ইডিয়ট! শিবব্রতবাবু আবার মন্তব্য করলেন।

—বাবা! বড় মেয়ে চামেলি এসে দাঁড়ালো তাঁর ঘাড়ে হাত দিয়ে। শিবব্রতবাবুর চুলে আঙুল ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে বললে, বাবা! ডাক্তার না তোমাকে জোরে কথা বলতে নিষেধ করেছে। ডাক্তারের নিষেধ নয়। চুলে আঙুলের স্পর্শটুকুই যেন ফিসফিস করে বললে, রাগলে ক্ষতি হবে বাবা! অপমান ক'রো না ওঁকে।

—হুঁ! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শিবব্রতবাবু। বললেন, তুমি ভেতরে যাও।

চামেলি ঘরে যেতেই হাত পা থরথর করে কেঁপে উঠলো শিবব্রতবাবুর। স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারলেন না। চোখের কোণে জল জমে এলো আবার।

—ফ্যুল। দুদিন আগে বলতে কি হয়েছিল? অ্যান্ড উই টু কুড্‌ন্‌ট হ্যাভ ডিটেকটেড বাট ফর দি সিমটমস। গলার স্বর নামিয়ে বললেন।

করুণাময় তখনও বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে আছে।

—শ্যামলীর সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি দিতাম না, তোমার মতো স্কাউন্ড্রেলের হাতে মেয়ে দেবার দুর্বুদ্ধি আমার হ'ত না কোনদিন......সাচ্ য়্যান ইনোসেন্ট ফ্লাওয়ার......তার সর্বনাশ করতে কনসেন্সে লাগলো না তোমার, ইডিয়ট?

এতক্ষণে খানিকটা রহস্যের হদিশ পেল যেন করুণাময়।

ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত ধীর স্বরে বললে, শ্যামলীর কোন ক্ষতি তো আমি করিনি!

—ক্ষতি করোনি? আবার গর্জে উঠলেন শিবব্রতবাবু। অ্যান্ড শি ইজ গোয়িং টু বি এ, গোয়িং টু বি এ...। কথা শেষ করতে পারলেন না

শিবব্রতবাবু। তবু চমকে উঠলো করুণাময়। উদ্‌ভ্রান্ত অবোধ্য দৃষ্টিতে শিবব্রতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেরই অজান্তে বেতের চেয়ারটায় বসে পড়লো ও। কোন কথা বলতে পারলো না।

—এই উইকের মধ্যেই ইউ টু মাস্ট গেট ম্যারেড। যাও, মেক্ ইওরসেল্ফ রেডি।

চেয়ার ছেড়ে উঠলো করুণাময়, বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। 'মেক্ ইওরসেল্ফ রেডি'। পথে চলতে চলতে হাসলে করুণাময় নিজের মনেই। হ্যাঁ, প্রস্তুত হ'তে হবে, আর কোনদিন যাতে ফিরে আসতে না হয় এখানে, সেজন্যেই প্রস্তুত হ'তে হবে। কিন্তু! আশ্চর্য! আশ্চর্য মেয়েদের মন। সত্যি, শ্যামলীর ঐ নিরপরাধ ফুলের মতো সুন্দর মুখের আড়ালে এতখানি কলুষ কি করে লুকিয়েছিল। এমন অর্থহীন খেলা খেলেছে কেন সে এতদিন করুণাময়ের সঙ্গে। আর, আর সব দোষ সব গ্লানি আজ করুণাময়ের ব্যর্থ বুকে কেন ঢেলে দিলো ? অদ্ভুত! 'প্রেম নয়, ও আমার সময় কাটাবার সঙ্গী শুধু'। চিঠির সে লাইনটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো আবার। কিন্তু, কিন্তু কে এই সর্বনাশের জন্যে দায়ী। আর, এসমস্ত অপরাধের ভার করুণাময়ের ওপরই বা চাপিয়ে দিলো কেন শ্যামলী। যদি সত্যিই অন্য কাউকে ও ভালবেসে থাকে, সমস্ত দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিলো কেন তাকে ?

চোখের সামনে ওর সমস্ত আলো অন্ধকার হয়ে গেল, পায়ের তলার মাটি বেনো নদীর পাড়ের মতো হঠাৎ যেন ধসে গেল। প্রশ্ন আর প্রশ্ন। হাজারো অবোধ্য প্রশ্ন ঘুরলো ওর মাথায়, অনেক কল্পনা।

একবারও মনে হ'ল না এ সবই শ্যামলীর অভিনয়।

দিন কয়েক পরেই আশঙ্কায় উত্তেজনায় অধীর হয়ে চামেলি এসে ডাকলো।—শ্যামলী!

চিঠি লেখার নীল প্যাডখানা চাপা দিয়ে সহাস্য মুখ তুলে তাকালো শ্যামলী। আর পরক্ষণেই চামেলির মুখে ব্যর্থতার চিহ্ন দেখে বিস্মিত হ'ল।

—শ্যামলী। ধীরে ধীরে উদাস চোখ মেলে চামেলি বললে, শ্যামলী, করুণাময় নেই।

—নেই ? শুধু প্রতিধ্বনি তুললে শ্যামলী।

—চলে গেছে। খবর না দিয়ে চলে গেছে সে।

করুণাবিষণ্ণ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে তাকালে ও। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। তারপর হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলো শ্যামলী। সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে যেন হাসি ফেটে পড়লো তার। দেয়ালে দেয়ালে ঘা খেয়ে ঘুরে এলো সে হাসি, সশব্দ হাসির উচ্চকিত রেশ জানালার কাঁচ ভেঙে দিলো যেন। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো শ্যামলী। তবু যেন হাসি চাপতে পারছে না; বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে ক্রমাগত।

—পালিয়েছে। পালিয়েছে সে। শ্যামলী বললে, তারপর আবার সশব্দে হেসে উঠলো। পাগলের হাসি যেন। অর্থ নেই, শেষ নেই।

কতগুলো বছর কেটে গেল, তবু সে হাসি আর বন্ধ হ'ল না। কত

ডাক্তার, কত মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে দেখানো হ'ল, কিন্তু শিবব্রতবাবু মেয়েকে প্রকৃতিস্থ করতে পারলেন না।

জীবনের শেষ ক'টা দিন সমাজ সংসার থেকে দূরে সরে থেকে কিছুটা নির্বিকার আনন্দে কাটাবার জন্যে এসে উঠলেন এখানে। নিবারণ মাইতির বাড়ির একটা অংশ ভাড়া নিয়ে বাসা বাঁধলেন নতুন করে। সঙ্গে বড় মেয়ে চামেলিও।

নিবারণ মাইতির ডাক পড়লো সঙ্গ দেবার জন্যে, এটা ওটা সাহায্য করবার জন্যে। নিবারণও বেঁচে গেল তার অসহনীয় একাকিত্ব থেকে।

পাশাপাশি বাড়ি, একই বাড়ির পাশাপাশি ঘর বললেও চলে। উত্তরের একখানা কি দেড়খানা ঘর নিয়ে নিবারণ আর তার দোকানের কর্মচারীর যৌথ সংসার। দুজনেই অবিবাহিত। আর পূবের দু'খানা ঘর ভাড়া নিলেন শিবব্রতবাবু। বারান্দা ডিঙিয়ে এবাড়ি ওবাড়ি করা চলে যখন খুশি।

তবু প্রথম প্রথম একটু দূরে দূরে থাকতো নিবারণ। শহুরে শিক্ষিত লোক, চলনে বলনে বিদেশী ঢং ভদ্রলোকের। তার ওপর বেশভূষাতেও সর্বদা কলারহীন শার্ট আর দামী কাপড়ের ট্রাউজার। মুখে পাইপ। এসব দেখে একটু সমীহ করে চলতে হ'ত নিবারণকে। খুঁটিনাটি সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলেও ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলতো। ভয় কি শুধু শিবব্রত-বাবুকে? মেয়ে দুটিকেও ভয় করতো নিবারণের। বড়োটি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, সিঁথিতে সিঁদুর, ব্যবহারেও গৃহিণী। তাই চামেলিকে তেমন ভয় পেত না নিবারণ, ভয় পেত শ্যামলীকে। বারান্দায় দাঁড়ালেই কখনো কখনো ওদের জানালার দিকে চোখ যেত, কখনো বা হাওয়ায় ওড়া পর্দার ফাঁকে কপাটের আড়ালে শ্যামলীর শ্বেত পাথরের পা দু'খানি চোখে পড়েছে, অনেক সময় তার ছোট্ট নিটোল মুখের উত্তাপ পেয়েছে।

আশ্চর্য হয়েছে মেয়েটির ব্যবহারে। যদিবা হঠাৎ কোনদিন চোখো-চোখি হয়েছে অমনি হেসে উঠেছে শ্যামলী, আর নিবারণ ভেবেছে এ বুঝিবা বিদ্রূপের হাসি, উপহাসের উল্লাস।

তারপর কি করে যেন শিবব্রতবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ও, আরো অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছে শ্যামলীর। পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছে।

নিবারণের ঘর থেকে ওদের জলঘরটা দেখা যেত। একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলে নিবারণ, শ্যামলী আঁচাতে এসেই গলায় আঙুল দিয়ে বমি করছে। ঠিক্ এই ব্যাপারটাই পরপর ক'দিনই লক্ষ্য করলে ও।

আরেক দিন শিবব্রতবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছে নিবারণ, হঠাৎ শ্যামলী এসে হাজির।

—তেঁতুল আছে তেঁতুল? দিদি একটু তেঁতুল দিবি?

চামেলি কাছেই কোথায় যেন ছিল, ছুটে এসে শ্যামলীর হাত ধরে বললে, চল ও ঘরে চল।

কথা শুনে প্রথমটা বিস্মিত হয়নি নিবারণ, কিন্তু চোখ তুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল ও। কেমন এক অর্থহীন উদাস দৃষ্টি শ্যামলীর চোখে, প্রকৃতিস্থ

মানুষের চোখ নয় যেন। বুকের আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, শরীরে নেই লজ্জার সঙ্কোচ। শুধু দুটো উদ্ভ্রান্ত চোখ কি যেন খুঁজছে।

চামেলি ওকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার আগেই এক ঝটকা দিয়ে সটান এসে বসলো ও শিবব্রতবাবুর চেয়ারের হাতলে। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, দোলনা দেবে না আমায়, দোলনা কিনে দেবে না?

শিবব্রতবাবু বললেন, চামেলি মা, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

চামেলি আবার টানতে টানতে নিয়ে গেল ওকে, আর কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো। —দেখেছো বাবা, কি করেছে দেখো।

শিবব্রতবাবু ঘাড় ফিরিয়ে চামেলির হাতের সিল্কের শাড়িখানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

চামেলি ক্রোধের স্বরে বললে, দেখো ছিঁড়ে একেবারে কুটিকুটি করেছে, বলে খোকনের জন্যে কাঁথা করবো। কত কাপড় ছিঁড়লো বলোতো?

দুঃখের হাসি হাসলেন শিবব্রতবাবু, বললেন, কি আর করবি মা, জেনে-শুনে তো আর করছে না'

তারপর চামেলি চলে যেতেই নিবারণকে উদ্দেশ করে বললেন, কিছু মনে করো না নিবারণ, তোমার কাছে ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলাম। আমার ছোট মেয়ে শ্যামলীর মাথায় গোলমাল আছে।

নিবারণও রহস্যের রাস্তায় আলো দেখতে পেল। আরো কিছু শোনবার জন্যে চোখ তুলে তাকালে ও।

শিবব্রতবাবুর গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। বললেন, কত ডাক্তার দেখালাম, কত হাসপাতালে রাখলাম, তবু সারাতে পারলাম না ওর রোগ। ওর ঐ এক পাগলামি, সময়ে সময়েই ঐ এক কথা। 'খোকন আসবে, খোকনের জন্যে কাঁথা সেলাই করতে হবে, দোলনা কিনতে হবে' তার জন্যে, আরো কত যে প্রলাপ বকে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ যখন ভালো থাকে, শি'জ কোয়াইট ন্যাচারেল।

নিবারণের মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন এলো, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও ভাবলে প্রশ্নটা করা উচিত হবে কি না। তারপর বললে, বিয়ের পর পাগল হয়েছে বুঝি? ছেলেপুলে হয়ে মারা গিয়েছিল?

—না। ছোট্ট একটা উত্তর দিয়ে পাইপ ধরালেন শিবব্রতবাবু। দু' মুখ ধোঁয়া ছেড়ে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন হাতে। কয়েকটা কলমের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন নিঃশব্দে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, না, বিয়ে হয়নি ওর। তার আগেই হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। কখন থেকে যে ও এমন হয়ে গেছে, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

নিবারণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, সে কি? বুঝতে পারেন নি?

—না। তখনও ঠিক এমনি করতো। কেবল বলতো গা বমি বমি করছে, করতোও মাঝে মাঝে। আচার তেঁতুল এই সব খেতে চাইতো, আর যখন তখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তো। হাব ভাব লক্ষ্য করে হঠাৎ একদিন চামেলি বললে, বাবা, সর্বনাশ হয়েছে। কেউ বোধ হয় সর্বনাশ করেছে শ্যামলীর। বাপের মন, রাগের মাথায় চুল ধরে এক চড় বসিয়ে দিলাম ঐ একফোঁটা

মেয়ের গালে। কত ধমক দিলাম, ভয় দেখালাম, একটা কথারও উত্তর দিলে না। চামেলি এত অনুনয়-বিনয় করলে, তবু সাড়া নেই মেয়ের মুখে। তারপর...

কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেলেন শিবব্রতবাবু। নিবারণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে চোখের পাতা ভিজে গেছে শিবব্রত-বাবুর। গলার স্বরও যেন আটকে গেছে। নিবারণও বুকের ভেতর অবোধ্য এক ব্যথা অনুভব করলে।

মাথা নিচু করে বললে, থাক, ওসব বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

—কষ্ট? হাসলেন শিবব্রতবাবু। এখন তো সহ্য হয়ে গেছে, কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন, ইট ওয়াজ এ টেরিব্‌ল শক। এখন আর পাই না। সব অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়েছি।

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, শ্যামলী কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি কিছু। তারপর হঠাৎ একদিন ওর টেবিলে একটি ছোকরার ফটো দেখতে পেলাম, আমার পরিচিত। ডেকে এনে ধমক দিলাম তাকে, বললাম বিয়ে করতে হবে তোমাকে। ঘাড় হেঁট করে ছোকরা চলে গেল, আর ফিরলো না। তারপর একদিন জানতে পারলাম, আমাদের সব সন্দেহ মিথ্যে, শ্যামলী সত্যিই কোন দোষ করেনি। আমরাই ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, তখন থেকেই নতুন কাপড় ছিঁড়ে কাঁথা সেলাই করতে বসে গেছে শ্যামলী, দোলনা দোলনা করে আব্দার ধরেছে। বুঝলাম কোন একটা আঘাত পেয়েই এমন হয়ে গেছে ও। ছেলেটিকেও মিছিমিছি গালাগাল দিয়েছিলাম। সে বেচারীরও কোন দোষ ছিল না। সে শুধু ভালই বেসেছিল, কোন অপরাধ তার ছিল না।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল নিবারণ। এমন ঘটনা, এমন রহস্যময় কাহিনী কখনও শোনেনি ও। আশ্চর্য, সামান্য একটা আঘাত থেকে কি এমন মনোবিকার ঘটতে পারে? ও বললে, হয়তো প্রথম থেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিল, আপনারা বুঝতে পারেননি।

শিবব্রতবাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, তাও হতে পারে হয়তো। কে জানে! মানুষের মন বড় ঠুনকো জিনিস, কখন যে কি হয়। চামেলি কিন্তু বলে, আমি বিয়েতে মত দেব না বলেই ও ধরনের অভিনয় করেছিল শ্যামলী। ছেলেটিও নির্দোষ, তাই আমার কথা শুনে শ্যামলীকে ভুল বুঝে সরে গিয়েছিল।

নিবারণ বললে, পৃথিবীটা এক তাজ্জব মনোহারীর দোকান বুঝলেন না। খুঁজে দেখলে ও সবরকমই পাবেন। কিন্তু ডাক্তার দেখিয়েও সারাতে পারলেন না ওকে, এই দুঃখু।

শিবব্রতবাবু হাসলেন। —না, সারাতে পারলাম আর কৈ। একজন শুধু বলেছিলেন, বিয়ে দিলে অনেক সময় নাকি ভালো হয়, একেবারে না হোক কিছুটা সেরে ওঠে। কিন্তু পাগল জেনেও শ্যামলী-মাকে কে বিয়ে করতে রাজি হবে বলো?

—আমি হবো। আমি বিয়ে করবো ওকে। হঠাৎ বলে উঠলো নিবারণ। পরক্ষণেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর সারা মুখ, শিবব্রতবাবুর হাত দুটো ধরে

লজ্জা আর অনুনয়ের স্বরে বললে, মাফ করবেন আমায়। আমি, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। অন্যায় করে ফেলেছি আমি, মাফ করবেন আমাকে।

শিবব্রতবাবু হেসে উঠলেন। —আহা এত লজ্জা পাবার কি আছে, মানুষ কি ভেবে-চিন্তে কথা বলে সব সময়। আমার কথা শুনে ব্যথা পেয়েছো তুমি, তাই ওকথা বলে ফেলেছো।

নিবারণের লজ্জা গেল না তবু। বললে, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আর এই তো চেহারা......আত্মবিদ্রূপের হাসি হাসলে নিবারণ, আমি কিনা, আমি কিনা আপনার মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। আবার অস্বস্তিকর হাসি হাসলে নিবারণ। —করি তো দোকানদারী, আমি কিনা......

কথা শেষ করতে পারলে না নিবারণ, হাসিটা ওর কান্নার মত শোনালো।

শিবব্রতবাবু চকিতে চোখ তুলে তাকালেন। —তুমি, তুমি সত্যি ওকে বিয়ে করতে চাও নিবারণ? করবে, বিয়ে করবে তুমি ওকে? অনুরোধের আতিশয্যে নিবারণের হাত চেপে ধরলেন।

নিবারণ লজ্জায় ভয়ে কুঁকড়ে গেল যেন।

--না, না। আমি অশিক্ষিত মানুষ, দোকানদারী করে খাই, আমি.. ...এই তো চেহারা......না, না।

—সুযোগ পেলেই শিক্ষিত হওয়া যায় নিবারণ, আর চেহারা জন্মগত ব্যাপার। কিন্তু মনুষ্যত্ব সাধনায় অর্জন করতে হয়। সারা দেশে এমন মনুষ্যত্ব কারো দেখতে পেলাম না নিবারণ, তুমি তাদের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বড়ো তুমি। বলতে বলতে থরথর করে কেঁপে উঠলেন শিবব্রতবাবু, দু চোখ বেয়ে দুগাল বেয়ে আনন্দের, খুশির অশ্রু ঝরে পড়লো তাঁর।

তারপর। সত্যিই একটু একটু করে ভালো হয়ে উঠলো শ্যামলী। অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। সুস্থ দেখালো ওকে। পুরোনো দিনের সমস্ত ভুলে-যাওয়া ছবিগুলো নতুন করে মনে পড়লো আবার, মাঝখানের কয়েকটা সুতো হারানো বছরের ইতিহাস শুধু মুছে গেল ওর মন থেকে। বিশ্বাস হ'ল না নিবারণের কথা।

প্রথম প্রথম মনে পড়াবার চেষ্টা করতো নিবারণ। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে কনুই দেখাতো, বলতো, এই যে দাগটা, কেন জানো? কামড়ে দিয়েছিলে একদিন। আর এই কপালে এটা? কয়লা ছুঁড়ে মেরেছিলে।

শ্যামলী শুনে খিল খিল করে হেসে উঠতো।—এতও বানিয়ে বলতে পারো।

ও যে কোনদিন পাগল হয়ে গিয়েছিলো, একথা কিছুতেই শ্যামলীর নিজের বিশ্বাস হ'ত না। তবু মাঝে মাঝে অবোধ্য প্রশ্ন জাগতো মনে, সব রহস্যের বড়ো বিস্ময় নিবারণ। অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারে না নিবারণ ওর জীবনে কখন এলো, কেমন করে এলো। আশ্চর্য! যার আসবার কথা, সে তো নিবারণ নয়, করুণাময়। করুণাময়কে ওর স্পষ্ট মনে পড়ে। আরো কত কথা, মধুর স্বপ্ন। তারপর......

অনুযোগ করতো তাই নিবারণের কাছে। —দ্যাখো, আমার স্মরণশক্তি বড্ড কমে যাচ্ছে। কোন কথা মনে পড়ে না।

অথচ শ্যামলী নিজেই বিস্মিত হ'ত। সব ভুলে গিয়েও শৈশবের, যৌবনারম্ভের দিনগুলো কি করে মনে রইলো ওর, করুণাময়কেই বা ভুলতে পারলো না কেন? করুণাময়! আবার কোনদিন কি দেখা হবে তার সঙ্গে? কতদিন উদাস মুহূর্তে প্রশ্ন জেগেছে শ্যামলীর মনে। হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায়, ওকে কি চিনতে পারবে করুণাময়? কিংবা, কে জানে ও নিজেই হয়তো চিনতে পারবে না। এমন কত কি ভেবেছে শ্যামলী, বহুদিন। কিন্তু কোনদিন ভাবতেও পারেনি, এমন আকস্মিকভাবে দেখা হবে, এমন বিচিত্র পথে।

করুণাময়ও ভুলতে পারেনি শ্যামলীকে। যতই ক্ষত ঢাকবার চেষ্টা করেছে, ততই গভীর হয়ে উঠেছে সেটা, ব্যথা দিয়েছে। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সুন্দর একখানি মুখ, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হাস্যমুখর একজোড়া চোখ।

তাই চৌখাম্বার গলির আলোতে চিনতে কষ্ট হয়নি।

এমন দিনের সুযোগের আশায় কত কল্পনা, কত স্বপ্ন বেঁধেছিল ও। কত কথা বলবার ছিল, বলাবার ছিল! নিস্তব্ধ রাত্রির অতিথি-শয্যায় শুয়ে অস্বস্তি বোধ করেছে, শুধু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তারপর এক সময় এসে দাঁড়িয়েছে বাইরের বারান্দায়। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকেছে, সুমুখের অন্ধকার দরদালান আর মেঘঢাকা শুক্লাকাশের মাঝে কি যেন খুঁজেছে বারবার। মেঘ সরে গেছে এক সময়, একফালি ঠাণ্ডা আর নরম জ্যোৎস্নায় সারা শরীর আর মন ভিজে গেছে ওর। হঠাৎ কানে এসেছে লঘু পায়ের শব্দ, চোখে পড়েছে একটি নারীদেহের ছায়াশরীর।

শ্যামলী এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। মৃদু শান্ত স্বরে প্রশ্ন করেছে, কেমন আছো?

—ভালো। তুমি?

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়েছে শ্যামলী, ঈষৎ হাসির আভাস এনেছে চোখেমুখে।

আর কোন কথা নয়। চুপচাপ দুজনে দাঁড়িয়ে থেকেছে পাশাপাশি, রেলিং ধরে। তারপর হঠাৎ শ্যামলীর হাতে হাত রাখতে গেছে করুণাময়, আর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দূরে সরে গেছে শ্যামলী। চকিতে একবার ফিরে তাকিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পুরোনো দিনের কয়েকটা ঘটনা মনে পড়লো করুণাময়ের, মনে মনে হাসলে ও। তবু অপেক্ষা করলে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। কিন্তু শ্যামলী ফিরলো না আর।

দেখা দিলো একেবারে ভোরের স্নিগ্ধ আলোয়।

কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল করুণাময়ের। চোখ চেয়ে দেখলে, নীলা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে। আর চায়ের পেয়ালা হাতে শ্যামলী।

শ্যামলীর হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে এগিয়ে দিলো নীলা। বললে, তুমি ভাই তোমার রান্না দেখবে যাও, ও'র ব্যবস্থা আমি দেখছি।

শ্যামলী তবু নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো।

নীলা সহাস্যে বললে, কি আয়েশী দেখেছো? আটটার আগে বিছানা ছাড়বে না।

—এ ক'দিন তেমন আয়েশী থাকলে বাঁচবো, আমার আবার বারোটার আগে রান্নাই হয় না। ঠোঁটে হাসি কাঁপালে শ্যামলী।

বিদ্রূপের স্বরেই বোধ হয় নীলা বললে, তোমাদের মধ্যে মিল দেখছি অনেক!

শ্যামলী সে কথা শুনতে পেল না। খোকা জেগে উঠে কান্না শুরু করেছে দেখে ছুটে গেল। আর খোকাকে কোলে নেবার পর থেকেই সব ভুলে গেল ও। সব কাজে ভুল হতে শুরু করলো।

অদ্ভুত! শ্যামলীর অমন হাসিখুশী মুখের আড়ালে কোন বিষণ্ণতা থাকতে পারে, ওর উজ্জ্বল চোখের কোণে বেদনার অশ্রু লুকিয়ে থাকতে পারে, কে জানতো!

—খোকনকে আমার কাছে রেখে যাবেন ভাই? নীলাকে এক সময় বললে শ্যামলী।

নীলা উত্তর দিলে, ভালই তো! হাত-পা ঝেড়ে একটু ঘুরতে পাই তাহলে, বসতে পাই দু'দণ্ড।

—উঃ, বেশ, দেখবো কেমন ছেড়ে থাকতে পারেন। কি বলো খোকন? ব'লে খোকনকেই যেন প্রশ্নের মীমাংসা করতে দেয় শ্যামলী, আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে বুকে চেপে, জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

শুধু কি তাই.? খোকনকে স্নান করাতে পুরো এক ঘণ্টা সময় নেয় শ্যামলী। আর সেই সময় কত প্রলাপ বকে যায় তার সঙ্গে, ইয়ত্তা নেই। অর্থও নেই। আজেবাজে কথার পর কথা। খোকন হয়তো নিজের মনেই হাসে, নিজের মনেই ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নেচে ওঠে শ্যামলী। খোকন ওর কথা বুঝতে পেরেছে, খোকন ওকে ছেড়ে থাকতে চায় না, ইত্যাদি।

করুণাময় হেসে বলে, শেষে নিউমোনিয়া ধরিয়ে ছাড়বে।

—তা সত্যি। নীলাও কৌতুকে হাসে। বলে, ভয়ও হয়, আবার ভাবি, বেচারীর কোলে তো আসে নি কেউ, দু'দিনের জন্যে নয় একটু ভুলেই থাকলো।

কিন্তু ক্রমশই যেন উৎসাহে আনন্দে উদ্দাম হয়ে ওঠে শ্যামলী। আর নীলা ভয় পায়। শ্যামলীর কথায় আর ব্যবহারে কি যেন এক রহস্যের ইশারা দেখতে পায় ও, আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—আচ্ছা, মেয়েটা কি পাগল নাকি? করুণাময়কে প্রশ্ন করে নীলা। আজ দুপুরে দেখি কি, ওর ঘরে খোকাকে কোলে নিয়ে.........কথা শেষ করতে পারে না নীলা, হেসে গড়িয়ে পড়ে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলবার চেষ্টা করে, আর পরমুহূর্তে কৌতুকের হাসিতে চাপা পড়ে যায় ওর কথা।

—এত হাসছো কেন? একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করে করুণাময়।

আবার মুখে আঁচল চেপে নীলা কোন রকমে বলে, খোকাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিল। খাওয়াচ্ছিল না...মানে...আবার হেসে ওঠে নীলা।

—তাতে হাসবার কি আছে?

—না না। বোতলের নয়। আবার হেসে ওঠে নীলা।

কিন্তু হাসি মিলিয়ে গেল একদিন নীলার মুখ থেকে। বিস্মিত হ'ল ও, চোখ চেয়ে ভালো করে তাকালো শ্যামলীর দিকে। আশ্চর্য!

—কি বলছো, ঠিক বুঝলাম না ভাই। অনুযোগ করলে নীলা।

শ্যামলী কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, উনিও তো তাই বলেন। সত্যি বলুন, বাড়িতে দোলনা না থাকলে মানায়? বাড়ির শ্রীই থাকে না। আচ্ছা, আপনার বাসায় দোলনা আছে তো?......থাকবেই তো। ওকে এত করে বলি, তবু একটা দোলনা কিনে দিলো না এদ্দিনেও। কতই বা দাম?

—দোলনার লোক আসুক, তারপর কিনবে এখন। সান্ত্বনার সুরে নীলা বললে।

শ্যামলী ঠোঁট ওল্টালে, আপনিও ঐ কথা বললেন? দোলনা থাকলে কত সুন্দর দেখায় বলুন তো। ঠিক হয়েছে, এবার খোকনের জন্যে আনতে বলবো।

নীলা সহাস্যে বললে, তাই ব'লো।

কিন্তু লক্ষ্য করলে, যতই দিন যায়, ততই যেন কি এক পরিবর্তন স্পট হয়ে ওঠে শ্যামলীর দেহমনে। খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উদাস হয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কি যেন ভাবে, কিংবা কিছুই যেন ভাবে না।

প্রথম প্রথম বেশ একটা কৌতুক বোধ করতো নীলা। ক্রমশ একটা বিদ্বেষ ভাব জাগতে শুরু করল ওর মনে। খোকনকে সত্যিই যেন ছিনিয়ে নিতে চায় শ্যামলী। এক মুহূর্তের জন্যেও নীলার কাছে আসতে দেয় না তাকে। রাত্রে নিজের কাছে নিয়ে শোবার জিদ্ ধরে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন নীলা বললে, কালই আমরা চললাম ভাই।

—খোকন? খোকন থাকবে তো? উদ্‌গ্রীব হয়ে শ্যামলী জিজ্ঞেস করলে!

ক্রোধ তো দূরের কথা, হেসে ফেললে নীলা। বললে, না, ওকেও নিয়ে যাবো বৈকি! ভয় নেই, তোমার কোল আলো করেও খোকন আসবে।

শ্যামলী অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে তাকালো নীলার মুখের দিকে। নীলার কোন কথাই যেন কানে যায়নি ওর, অর্থ বোঝেনি কোন কথার। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, না-না, খোকন যাবে না, খোকনকে যেতে দেবো না।

নীলা উত্তর দিলো না। সরে গেল সেখান থেকে। আর কিছুক্ষণ পরেই খোকনের কান্না শুনে করুণাময় আর নীলা দুজনেই ছুটে এলো। শ্যামলীর কোল থেকে খোকন পড়ে গেছে।

নীলা খোকনকে কোলে তুলে নিয়েই শ্যামলীকে কি যেন বললে, ক্রোধের স্বরে।

করুণাময় বললে, কোল থেকে হঠাৎ পড়ে গেছে, দোষ কি ওর?

—পড়ে গেছে। রাগ বেড়ে যায় নীলার। —ডাইনী! ডাইনী ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে ওকে। না, আর নয়, চলো আজই ফিরে যাবো আমরা।

শ্যামলীর চোখে তখনও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আঁচল খসে পড়েছে কাঁধ থেকে। কোন কিছুই ও যেন দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। শুধু

একজোড়া সজল বড়ো বড়ো চোখ মেলে ও সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মনে মনে বিড় বিড় করছে, খোকনকে আমি যেতে দেবো না, খোকনকে আমি যেতে দেবো না।

বিদায়ের মুহূর্তেও ঐ একই কথা লেগে রইলো ওর মুখে। সিঁড়ি আগলে দুহাত মেলে বাধা দেবার চেষ্টা করলে নীলাকে। —খোকনকে যেতে দেবো না, খোকনকে আমি যেতে দেবো না।

নিবারণ ওকে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ ক্ষেপে গেল যেন শ্যামলী। রাগে ক্ষোভে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে শুরু করলে।

করুণাময় নিবারণকে আড়ালে ডেকে বললে, ওঁকেও স্টেশনে নিয়ে চলুন, তাহলে বাধা দেবে না হয়তো।

শেষে তাই ঠিক হলো। নিবারণ বললে, না, খোকন যাবে না। চলো স্টেশন থেকে ফিরিয়ে আনবো।

চট্ করে উঠে বসলো শ্যামলী। সমস্ত মুখ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো ওর। —সত্যি? সত্যি ফিরিয়ে আনবে?

চৌখাম্বার গলিতে আলো ঝলমল করে উঠলো, সন্ধ্যা নামলো শহরের বুকে। তারা চিক্ চিক্ গঙ্গাজল কালো হয়ে গেল ক্রমশ। তিমির পিঠের মত পীচের রাস্তার মসৃণতায় অন্ধকার জমাট বাঁধলো। আর সেই গা-ছমছম অন্ধকার ভেদ করে টাঙা ছুটলো আবার।

সেই পুরোনো রাস্তা ধরে, তেমনি আঁকাবাঁকা মেটাল রোডের ওপর দিয়ে চৌখাম্বার আলো-ঝলমল বাজার পার হয়ে টাঙা ছুটলো। গাছের ছায়ায় ছায়ায়, মাঠের নির্জনতা মাড়িয়ে, দীর্ঘশ্বাসের মত আশঙ্কা-চুপচুপ নিঃশব্দতায় টাঙার ডুমডুমি আর ঘোড়ার খুরের টপাটপ আওয়াজ ভাসলো শুধু। চাঁদ-জ্বলা আকাশের দু-একটা রুপালী স্ফুলিঙ্গ হয়তো বা এখানে-ওখানে, রাস্তার ধারের শাখাপল্লবিত গাছের ফাঁকে উঁকি দিয়ে ঠিকরে পড়েছে। আর সেই চাঁদ-উঁকি-দেয়া রাস্তার অন্ধকারে ছুটে চললো ওরা।

ঠিক তেমনিভাবেই করুণাময় আর নীলা বসে আছে পাশাপাশি, আর পিঠে পিঠ দিয়ে শ্যামলী আর নিবারণ।

গঙ্গার ব্রিজ এগিয়ে এলো। অতিকায় একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত দেখালো ব্রিজের ইস্পাত-কাঠ-কংক্রিটের আকৃতি। ওপরে পরিচ্ছন্ন আকাশ, আর নীচে গঙ্গার স্রোতে চোখের তারার মত কালোর গভীরতা। সুমুখে নির্জন নিঃশব্দ পথ।

ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দ করে পোলের ওপর উঠলো টাঙাটা। দমকে দমকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো কানে, চুলে, স্বেদস্নাত মুখের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো শ্যামলী। —আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না।

নিবারণ হঠাৎ রূঢ়স্বরে একটা ধমক দিলো। চুপ করে গেল শ্যামলী।

ব্রিজের মসৃণ পথ অতিক্রম করে ইতিমধ্যে নীচে নেমে এসেছে টাঙা,

সামনেই বঁড়শির মত একটা বাঁক। আর বাঁক্ ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে টাঙা থেমে গেল।

চাকার দিকে তাকিয়ে টাঙাওয়ালা বললে, যাবে না হুজুর, চাকা টাল খেয়েছে।

যাবে না? লাফিয়ে নীচে নামলো শ্যামলী। তারপর আবার চিৎকার করে উঠলো, না, না, আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না। আর চিৎকার করতে করতে গঙ্গার দিকে, গঙ্গার ব্রিজের দিকে ছুটে গেল শ্যামলী। রুক্ষ চুল পিঠের ওপর ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো, শাড়ির প্রান্ত খসে পড়লো শরীর থেকে, উন্মাদের মত, উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে গেল শ্যামলী। আর পিছনে পিছনে নিবারণও ছুটে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। শুধু নিঃশব্দ নিঃঝুম রাতের অন্ধকারে একটা চিৎকার ভেসে এলো বার বার। —আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না। আর তার পিছনে নিবারণের কর্কশ গলার ডাক—শামু ফিরে এসো, শামু, শ্যামলী ফিরে এসো।

করুণাময় হঠাৎ দেখলে, দূরে অনেক দূরে চাঁদের আলোয় সিল্যুটের ছবির মত একটা ছায়াশরীর ঠিক ব্রিজের থামের আড়ালে এসে থমকে থামলো। —শ্যামলী। শ্যামলী। চিৎকার করে উঠলো করুণাময়।

তারপর। তারপর সে ছায়াশরীর অদৃশ্য হ'ল।

অনেকক্ষণ পরে ব্রিজের থামটার কাছে এসে পেঁছলো করুণাময় আর নীলা। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে। না, শ্যামলী নেই। নিবারণ? নিবারণও নেই। শুধু টর্চের তীব্র আলোয় কি যেন চকচক করে উঠলো। আবার সেদিকে আলো ফেললে করুণাময়।

না, শ্যামলী নয়। ব্রিজের একটা বল্টুতে এক ফালি কাপড় লেগে রয়েছে, হাওয়ায় পতাকার মত উড়ছে পৎ পৎ করে। শাড়ি ছেঁড়া একটুকরো কাপড় কোত্থেকে উড়ে এসে লেগেছে, কে জানে!

ভয় করছিল বাসনার।

নিঝুম অন্ধকার, আর তার মাঝে টিকটিক করে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা।

নিস্তব্ধ নিশীথের মাঝে একঘেঁয়ে শব্দটা অধৈর্য করে তোলে বাসনাকে। আশা আকাঙ্ক্ষায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে সে। চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাকে বিছানায়। প্রতীক্ষার প্রহর গুণে চলে।

স্বামীর নিদ্রিত নিশ্বাসের আওয়াজ আসছে কানে। স্বামীর কথা মনে পড়তেই বুকটা দুলে উঠলো তার। ভয় আর আশঙ্কায়। আজ বিশ্বনাথকে ভয় পায় বাসনা। অথচ। সেদিন স্বামীকে ভালবাসতে না পারলেও ভয় করতো না।

স্বপ্ন নয়। অতিবাস্তব কয়েকটা ক্ষুদ্র দিনের ইতিহাস আজ স্পষ্ট মনে পড়ে তার।

সুখী সে হয়নি সেদিনও। বৃদ্ধকে পতিত্বে পেয়ে সুখী হতে পারে না কোন যুবতী। কিন্তু আজকের মত মনের কোণে ঘৃণা বিদ্বেষের জন্ম হয়নি সেদিন। বরং লাল বেনারসীর আগুন ছড়িয়ে যেদিন বিশ্বনাথ ঘটকের প্রাসাদে ঢুকেছিলো, সেদিন ঐশ্বর্যের জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বাসনার। আগামী দিনের নিরানন্দকে মন থেকে সরিয়ে ফেলে যৌবনের সখীর সামনে প্রমাণ দেখিয়েছিল, বিশ্বনাথ বৃদ্ধ নয়। স্বামীকে প্রৌঢ়ত্বে নামিয়েও যেন তৃপ্ত হয়নি।

টিকটিক টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। ওটা যেন বাসনার অতীত রোমন্থনের ছন্দ রেখে চলেছে। নিরিবিলি দ্বীপের বুকে গীটার বাদ্য যেমন ডেকে আনে পাখির ঝাঁক, তেমনি বিগতদিনের ছবিগুলো ভেসে আসে।

স্বামীর সম্বন্ধে আশঙ্কা কম ছিল না। ছোটবেলা থেকে স্বর্ণ-স্বামীদের সম্বন্ধে কত কি রটনাই ত শুনে এসেছিল। রত্নপতিরা নাকি লম্পট অসচ্চরিত্র অসংযমী হয়, গণবধূ আর জনি ওয়াকার হয় তাদের সহবাসী। অথচ, বিয়ের পর পরিচয় পেল বিশ্বনাথের। সত্যি। অদ্ভুত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। আর, আর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বাসনাকে সুখী করার জন্য কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা। সুখী না হোক, খুশিতে ভরা ছিল তার মন।

তৃপ্তি না থাক, ছিল শান্তি।

একটি দিন।

মধুচন্দ্রিকার রাত। ছোট্ট নদীর জল চাঁদ ভাঙছে তখন। আকাশের কোণে শ্বেতদুম্বার লোমের মত পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ। রাতের আসমানে

পাহারা দেয় নীলাভ আলোর প্লাবনী পাহাড়। নীলার পাহাড় আর তার এক কোণে নিচু রমজানি চাঁদ। বকের বুকের মত সাদা ধবধবে দুধেলা বীথির দু'পাশে হীরের ফুল ছড়ানো নীল ডানা। কোন দূর দিগন্তে যেন উড়ে চলেছে, দুনিয়ার দরিয়া পার হয়ে কোন দূর দিগন্তে।

আকাশ দেখলেই বাসনার কল্পনা ডানা পায়। শিশু স্রোতস্বতীর ধারে ঠাণ্ডা বালির ওপর দেহ বিলিয়ে পরম আয়েশে স্বপ্ন দেখে বাসনা। শীতল শ্রান্তি নয়, কামনার তপ্তবাষ্প তার রক্তে।

অনুরাগের আবেগ বোধ করে বাসনা।

মন চায় একটা সক্ষম বুকের ওপর লুটিয়ে পড়তে। দেহ চায় উন্মাদ আগ্রহের আচ্ছুরিতক আলিঙ্গন। উদ্দাম সুখের অধীরতায় তার কুসুম কোমল শরীর চায় অত্যাচারের আনন্দ।

আড়চোখে বিশ্বনাথের দিকে তাকায় বাসনা। ভালো করে তাকিয়ে দেখে। বিশ্বনাথকে বৃদ্ধের কোঠায় ফেলতে মন চায় না। ঠিকুজী মিলিয়ে বয়সের দৌত্যেই মানুষের যৌবন নয়। তার দুর্ভাগ্যের জন্য বিবাহের দিনেও চোখের জল ফেলতে দেখেছে সে অনেককে। কিন্তু বাসনার মনে হ'ল পৃথিবীতে তার মত সুখী আর কেউ নেই।

লজ্জা দমন করে ধীরে ধীরে বিশ্বনাথের হাতের ওপর হাল্কা করে তার হাতখানা রাখে সে। বিশ্বনাথ চকিতে ফিরে তাকিয়ে আবার উদাস-দৃষ্টিতে অন্যদিকে চোখ চায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, আজকের দিনে তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই।

বাসনা স্পষ্টবাক্। সরমে মরে যাবার মত মেয়ে নয় সে। তাই ঠোঁটে মৃদু হাসি দুলিয়ে বললে, আজকের দিনটাই তো তোমার সব থেকে বড় উপহার।

বাসনা স্বচ্ছন্দ। কিন্তু অমন ঘষামাজা কথা ফোটে না বিশ্বনাথের মুখে। সাবলীল হ'তে পারে না সে। বাসনা বুঝতে পারে লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারছে না বিশ্বনাথ। পুরুষমানুষ অত লাজুক হয়! স্বামীর লজ্জাধিক্য কৌতুকের সঞ্চার করে বাসনার মনে। ঠোঁট টিপে কৌতুকের হাসি চাপে সে।

নিরুত্তর বিশ্বনাথ জ্বলজ্বলে হীরের কণ্ঠহারটা পরিয়ে দেয় বাসনার গলায়। কাঁপা হাতে। নিঃশব্দে। অন্যদিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করে, তুমি...তুমি সুখী হয়েছো বাসনা?

আশ্চর্য।

ঐ ছোট ক'টি কথায় বাসনা সেই প্রথম টের পেয়েছিল বিশ্বনাথের একটা দিক কত দুর্বল। মায়া হয়। বিবাহ পরের কয়েকটি দিনের কথা ভেবে আজ স্বামীর ওপর মায়া হয় বাসনার।

টিকটিক টিকটিক করে হেঁটে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। আজ অপেক্ষার আক্ষেপে সময়কে মনে হয় শ্লথগতি। অথচ সে আনন্দের দিনগুলি যেন মুহূর্তে মিলিয়ে যেত।

মনে পড়ে বাসনার।

নিজেকে কেন জানি চঞ্চল বোধ করে সে। বিশ্বনাথ কি সত্যই ঘৃণা পাওয়ার যোগ্য?

নীচের হল ঘরের দেয়াল ঘড়িতে টং করে একটা ঘণ্টা বাজলো। চমকে উঠলো বাসনা।

আরো কিছুক্ষণ কাটাতে হবে। তারপর—

হঠাৎ বিশ্বনাথের মুখটা দেখতে ইচ্ছে হ'ল তার। কেন কে জানে। রেশমী চাদরটা পায়ের দিকে ঠেলে দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলে সে। নিশ্চুপ কাটালে কয়েক মিনিট। না, বিশ্বনাথ জাগে নি। ধীরে ধীরে বেডসুইচ টিপে পালঙ্ক-শিয়রের নীল আলোটা জ্বাললে। তারপর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকালে তার মুখের দিকে। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সে অনেকক্ষণ।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় বসে বসে কি যেন ভাবতে শুরু করলে বাসনা।

বিদ্বেষ নয়। মায়া হয়। তাই বোধ হয় সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, স্বামীকে সুখী করবে মনপ্রাণ দিয়ে। সতর্ক থাকবে যাতে কোনরকম আঘাত না দিয়ে ফেলে স্বামীর দুর্বলতার স্থানে।

—চট্ করে একবার সেজেগুজে এসো তো লক্ষ্মী।

কথাটা ভোলেনি সে আজও। সবে পিয়ানোর ডালাটা খুলেছে এমন সময় বিশ্বনাথ এসে বললে।

নিজের অভিনয় নৈপুণ্যে নিজেই চমৎকৃত হয়ে যায় বাসনা। চকিত মরালের মত গ্রীবা বেঁকিয়ে আহ্লাদের স্বরে সুর করে প্রশ্ন করে, কেন?

—চলো না একটু বেড়িয়ে আসি, ডায়মণ্ড হারবারের দিকে।

ধনুকের মত বাঁকা ভুরুটি বিস্ময়ে কপালে তুলে প্রতিপ্রশ্ন করে সে।—ডায়মণ্ড হারবার? তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে মিষ্টি হাসি দুলিয়ে বলে, জী হুজুর।

ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে বেশ বদল করতে গেল বাসনা।

ডায়মণ্ড হারবারের দিকে মোটর বিহার করার মত মনের অবস্থা তখন নয়। তবু, 'কিন্তু' করলে না সে। বিরক্তি চাপা দিলে মুখে হাসি টেনে। তারপর প্রসাধন প্রকোষ্ঠে ঢুকে টেনে বের করলে সাজসজ্জা।

সুন্দর করে সাজালে সে নিজেকে। হাফ-গিনির আকারে একটা সিঁদুরের টিপ জ্বালিয়ে দিলে কপালে। লোভাতুর বুক বন্দী হ'ল রক্তরেশম ব্লাউজে। স্পাইরেলের মত পাক দিয়ে নিলে লাল বেনারসীখানা। দীর্ঘশিখা লক্‌লকে আগুনের মত ঝলকে উঠলো তার লম্বা ছিমছিমে শরীরটা। গলায় প্রবালের মালা, পান্নার দুল দোলালে কানে। বাম হস্তের মণিবন্ধে লাল মখমলের স্ট্র্যাপের মাথায় ছোট্ট হাতঘড়ি। অলঙ্কারের কলঙ্ক রাখলে না দু'হাতে। শুধু সূক্ষ্মতম সাদা শাঁখাজোড়া ওর দেহের লালিমা দিলে বাড়িয়ে। ভেলভেটের নাগরায় পা গলিয়ে দেয়ালের বড় আয়নাটায় নিজের রূপ দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায় বাসনা। আগুন. ঠিক আগুনের শিখার মত দেখায় তাকে। এক গাছ পলাশের মত উজ্জ্বল।

ইচ্ছে করেই স্বামীর গায়ে গা লাগিয়ে বসলে বাসনা। ঢালা পিচের রাস্তায়. গড়িয়ে চললো বিশ্বনাথের বিশহাজারী ক্যাডিলাক। তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট।

—স্পীড বাড়ারে বাহাদুর, স্পীড বাড়া। ক্রমাগত স্পীড বাড়াতে বলে বিশ্বনাথ।

আশ্লেষতৃষিতা বাসনার মনেও উন্মাদনা আসে। গতির সুরা যেন বাসনার আত্মোৎসাদনাকাঙ্ক্ষী মনকে করে তোলে উন্মত্ত।

দিকচক্রবাল ভেদ করে আরো অনেক দূর ছুটে চলে তার দৃষ্টি। পার্শ্বোপবিষ্ট বিশ্বনাথকে ভুলে গেছে সে। মেটাল রোডের চিকন মসৃণতায় দৃষ্টি পিছলে পড়ে তার। মনও।

অর্ধবিস্মৃত একটি মুখ মনে পড়ে। সুমুখের দিগন্ত পার হয়ে ছুটে চলেছে তার চোখ, মন ধাওয়া করে পিছন পথে। পিছনের ইতিহাস মনে পড়ে বাসনার। প্রাক্‌বিবাহ যুগের সুমধুর শান্তি নামে তার স্বপ্নালু চোখে।

—কি ভাবছো ?

চমকে ফিরে তাকায় বাসনা।—কৈ কিছু না তো।

না, অভিমান নয়। ফিরবার পথে বারবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলে বাসনা। বুঝতে পারলে, লজ্জায় মুখ ফেরাতে পারছে না বিশ্বনাথ। গোপন লজ্জা। মানসিক দারিদ্র্য হয়তো বা। মায়া হয়!

বিস্মৃতির অতল থেকে অতীত দিনের ইতিহাস উদ্ধার করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে বাসনা। স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে তার সারা শরীর। শাড়ির আঁচলে বুক পিঠ মুছে নেয় বাসনা। উর্ধাঙ্গ নিরাবরণ করে দেয়। শিথিল করে দেয় কোমরের বাঁধন। তারপর দেয়ালের সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে রেগুলেটার ঘোরায়। ধীরে ধীরে পাখাটা ঘুরতে আরম্ভ করে। স্বেদস্নাতা বাসনা যেন এতক্ষণে একটু আরাম বোধ করে। খানিক চুপ করে বসে থাকে অন্ধকারে, তারপর শুয়ে পড়ে।

টিকটিক আওয়াজ। সিলিং-পাখার মাথায় স্পার্ক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। স্পার্কের সবুজাভা অন্ধকারে চমকে উঠছে। সেদিকে চোখ দিয়ে শুয়ে থাকে বাসনা।

অদ্ভুত। বাসনাকে সুখী করবার জন্য বিশ্বনাথের কি অপরিসীম চেষ্টা। তবু সুখী হতে পারেনি সে। প্রাক্‌বিবাহ যুগে কি ছিল তার এমন আরাম-শয্যা? চাবি টিপলে জ্বলতো না আলো, ঘুরতো না পাখা। দক্ষিণা বাতাসের দাক্ষিণ্যে দিন কাটাতে হ'ত তখন। তাকে সুখী করার জন্য কত আগ্রহ বিশ্বনাথের। তার কাছে বিশ্বনাথ যেন শিশুর মত সরল হয়ে যায়।

সেদিনটা মনে পড়ে বাসনার।

সহাস্য চিৎকারে বাসনাকে ডাকতে ডাকতে ওপরে উঠে এলো বিশ্বনাথ। পিছনে বাহাদুর ড্রাইভারের হাতে একরাশ জিনিস-পত্তর।

টেবিলের ওপর জিনিসগুলো রেখে বাহাদুর সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

বিশ্বনাথ সলজ্জ হাসি হেসে বললে, মার্কেটে গিয়েছিলাম।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি! দোকানে আর কিছু রেখে আসনি বোধ হয়। মৃদু হেসে বাসনা বললে।

প্যাকেটগুলোর তেলাপেপারের ঢাকা খুলতে খুলতে বিশ্বনাথ বললে, দ্যাখো পছন্দ হয় কি না।

জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখে সানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো বাসনা।—সত্যি, চমৎকার তো।

—পছন্দ হয়েছে?

—নিশ্চয়। এমন সেট মিলিয়ে জিনিস পাওয়া যায়, কাপড় গয়না?

—কষ্ট করে খুঁজলেই পাওয়া যায়। আত্মগর্বে হাসলে বিশ্বনাথ।

—খুঁজলেই কি হয়, চোখ থাকা চাই। বাসনা বললে। একটু থেমে।—তুমি ছোটবেলায় ছবি আঁকতে, না? স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিশ্বনাথ। নম্রস্বরে অনুরোধ জানালে সে, এখনি একবার পরে আসতে হবে লক্ষ্মী, দেখবো কেমন মানায় তোমায়।

প্রসন্ন মনে বেশ বদল করতে গেল বাসনা।

শ্বেত মলমলে ঢাকলে বুকের তপ্তোল্লাস। সাদা জর্জেটখানা আধপাক দিয়ে টেনে দিলে বুকের মাঝ দিয়ে। শুভ্রবসনে ঢাকা সুপুষ্ট মসৃণ পিঠের ওপর দুলিয়ে দিলে মোটা বেণীটা। প্ল্যাটিনামের দুল দোলালে কানে। গলায় আইভরির হাঁসুলি। হাতের কব্জিতে গজদন্তের চুড়ি আর কঙ্কণ। সাদা সোয়েডের উঁচু হীল জুতোর স্ট্র্যাপটা বেঁধে নিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালে সে। নিজের চোখেই নিজেকে অদ্ভুত সুন্দর দেখালো। সাদা ধবধবে দিগন্ত বলাকার মত। কৈলাসগামী ভারলুপ্ত মরালীর মত। ভোরের শিশিরে ভেজা শ্বেতপদ্মের মত সুন্দর দেখালো। রাতের জ্যোছনা মাখা দুধসাগরের মত।

মুখে আত্মতৃপ্তির মৃদু ঝিলিক ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলো বাসনা।

বললে, চলো, আজ কোথাও বেড়াতে যাই।

চমকে ফিরে তাকালে বিশ্বনাথ।

বাসনা লক্ষ্য করলে, দুশ্চিন্তার কুঞ্চিত রেখা ফুটেছে তার কপালে।

আর একবার চকিতে বাসনার দিকে তাকিয়ে নিয়ে জানালাটার কাছে সরে গেল বিশ্বনাথ।

—পর্দাটা কে সরালে? প্রশ্ন করলে বিশ্বনাথ, মুখ না ফিরিয়েই।

তারপর রাস্তার দিকে, অদূরের জানালায়, দূরের কোন এক বাড়ির ছাদে দৃষ্টিটা সার্চলাইটের মত ঘুরিয়ে নিয়ে পর্দাটা ভাল করে টেনে দিলে সে।

সন্দেহদুর্বল মন। দুঃখের হাসি হাসলে বাসনা। মায়া হয়।

প্রাণস্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে বাসনার। নিজের কানেই শুনতে পায় সে।

ঘড়ির কাঁটাটাও যেন গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। টিকটিক করে দ্রুত তালে হেঁটে চলেছে। চঞ্চল হয়ে ওঠে বাসনা। পাখার ছিদ্রে স্পার্কের সবুজাভা এখনো জ্বলে উঠছে থেকে থেকে।

ঠিক বোঝা গেল না। ঢং করে একটা ঘণ্টাধ্বনি হ'ল যেন নীচের হলঘরে। পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিলে বাসনা।

মায়া মমতা? মায়া মমতার ব্যথার চেয়েও তার অন্তরের বেদনাটুকু যেন আরো অনেক গভীর।

কত মিষ্টি দুপুর আর দুরন্ত রাতের স্বপ্ন বুনতো সে। কে জানতো, মৌচাকের মক্ষিরানীর কপালে জুটবে না এক ফোঁটা মধু। বাতাসে কাসেল রচনার দিন থেমে থিতিয়ে যাবে তার জীবনে, কে জানতো।

কত গভীর প্রেমের আকর্ষণ ছিল তাদের পরস্পরের প্রতি। সেই বিবাহপূর্ব দিনে অনেক নিদ্রিত রজনীর একাকিত্বে তার মনে হয়েছে, প্রেমের পাত্রকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না সে একটা দিনও। অথচ আজ কি সত্যই সে মরে গেছে? হয় তো। জীবনধারণ করাকেই তো আর বাঁচা বলে না।

অতীত দিনের স্বপ্নমন্থন করতে করতে জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। পর্দাটা সরাতে গিয়ে হাতটা থেমে যায়। বিশ্বনাথের সেই সন্দেহ-দুর্বল ব্যবহার মনে পড়ে। তবু। তবু জোর করে সরিয়ে দেয় সে পর্দাটা। অন্ধকূপের নিপীড়ন অসহ্য ঠেকে। না, নিশ্ছিদ্র সিন্দুকের রত্নহার হয়ে থাকতে পারবে না বাসনা।

পর্দাটা হিংস্র উত্তেজনায় সরিয়ে দিলে সে সজোরে, তারপর পিপাসী চোখ ছেড়ে দিলে মুক্ত আকাশের গায়ে। বুকটা তার ব্যথায় টনটনিয়ে উঠলো।

পান্থশালার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল প্রেমিকের কাছে। উপেক্ষা করে এসেছে সে। নিঃশুল্ক প্রেমের প্রতিদানে দিয়েছে সে অবিশ্বাস। আজ স্বামীর ব্যবহারে রাগ হয় তার, অথচ বিগত দিনের অনুরাগকেও তো কৈ আস্থার চোখে দেখেনি। কে জানে, আজো হয় তো বাসনার স্মৃতি বুকে চেপে দুঃখের রাত্রি যাপন করে চলেছে সে। তার মুখটা আজ ছায়ার মত ভেসে ওঠে বাসনার চোখে।

প্রোষিতদয়িতের কল্পিত দুঃখের কথা ভেবে ভারাক্রান্ত মন লঘু হয়ে আসে বাসনার। আত্মনিপীড়নে অদ্ভুত এক আনন্দ পায়। কল্পনায় সজীব করে তোলে কয়েকটি মিথ্যা মুহূর্ত। কৃপা আর করুণার মানদণ্ডে নিজেকে যাচাই করে। কল্পনায় দীর্ঘায়িত করে তাদের বিস্মৃত বিশ্রম্ভালাপ। চোখে জল আসে, মনে আসে শান্তি।

চিন্তাক্লিষ্ট চোখ নেমে আসে পথের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে পথের জনতা দেখে বাসনা। বাঁশের মই কাঁধে করে চলেছে লোকটা—হয় তো গ্যাসবাতি জ্বালাতে। বছর দশেকের একটি সুন্দর কিশোর ছুটে চলেছে। সাদা হাফপ্যাণ্ট, নীল টাওয়েল গেঞ্জি, হাতে ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট। যতক্ষণ দেখা যায় তার দিকে তাকিয়ে থাকে বাসনা। পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে চলেছে একটি আয়া। সাহেবদের একটি ছোট্ট ফুটফুটে শিশু। তার হাতের বেলুনটা ফেটে গেল শব্দ করে।

হঠাৎ চোখ গেল তার সামনের রেস্তরাঁটির দিকে।

অভদ্র!

তৃষ্ণার্ত চোখে বাসনার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে একটি ছোকরা। সামনের টেবিলে তার একরাশ বই। কোন কলেজের ছাত্র হয় তো। কিন্তু অমন অভদ্রের মত তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন ও। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল বাসনার। ক্রোধে অপমানে রী রী করে উঠলো সারা শরীর। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালে বাসনা, অপ্রতিভ হয়ে মুখ ফেরালে ছেলেটি। তবু রাগ গেল না।—ধ'রে চাবুক লাগানো যায় না ছোক্‌রাটাকে!

—কি দেখছো?

সন্দেহবাতিকগ্রস্ত অতি দুর্বল অনুসন্ধিৎসু মনের প্রশ্নটা কর্কশ ঠেকলো বাসনার কানে। চকিতে ফিরে তাকিয়ে বাসনা দেখলো রুগ্ন সিংহের মত অকর্মণ্য হিংসার তেজ বিশ্বনাথের চোখে। বাসনা সরে গেল।

কপালে হাত দিয়ে দেখে বাসনা। হ্যাঁ, গরম হয়ে উঠেছে কপালটা, রাগে শিরাদুটো দপদপ করছে।

সমস্ত শরীর থেকে উষ্ণতা ঠিকরে বের হচ্ছে।

পাখার গতি কমিয়ে দেয় বাসনা। ঝ'ড়ো বাতাসে হাঁপিয়ে উঠছে যেন।

টিকটিক শব্দটা শোনা যায় আবার। প্যারালিটিক পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা।

রেশমী চাদরটা গলা অবধি টেনে ঢাকা দেয় বাসনা, তারপর আলো জেবলে তাকায় ঘড়ির দিকে। না, এখনো অনেক দেরি। প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়নি এখনো। আড়চোখে একবার তাকায় নিদ্রিত বিশ্বনাথের দিকে। বিশ্বনাথ অচেতন। ঘুম ভাঙেনি তার।

মাথার বালিশটা বুকে চেপে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে বাসনা। টিকটিক টিকটিক শব্দ করে ঘড়িটা।

তৃষ্ণা অনুভব করে বাসনা। গলাটা শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা হয় না তার। বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবতে চেষ্টা করে।

বাসনা বুঝতে পারেনি, কেমন করে বিশ্বনাথের ওপর তার সমস্ত মায়া মমতা উবে গেল একে একে। শুধু অনুভব করে, ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে। হিংস্র নির্যাতনের মধ্যে আর দিন কাটাতে পারে না বাসনা। তার মেয়েলী বুকে অপমান লুকিয়ে রাখতে পারে না।

পাগল হয়ে যাবে বাসনা। আত্মহত্যাকে চিরকাল ভয় করে এসেছে। আজ কিন্তু ইচ্ছামৃত্যুর বিভীষিকা অমৃত মনে হয়। ব্যথায় খাঁ খাঁ করে ওঠে বুকটা। কান্না গুমরে মরে ওর বুকে।

যদি জীবনে থাকতো শান্তি। যদি এতটুকু শান্তি থাকতো তার জীবনে। জীবনের আশা থাকলে যৌবন উপেক্ষা করতে পারতো বাসনা। কিন্তু।

কপাটে খিল্ দিয়ে এসে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। অস্থির দেহটা নরম বিছানায় ডুবিয়ে দিলে। তবু। তবু শীতল শয্যাটা যেন উষ্ণ মনে হ'ল বাসনার।

বহুক্ষণ ধরে পড়ে পড়ে কাঁদলে সে। মনোদঃুখের অসহনীয়তাকে আর

যেন চেপে রাখতে পারে না। মৌমাছির মত হুল্ উঁচিয়ে রয়েছে বহু-দিনের সঞ্চিত ব্যথার সারি। বুক জ্বালিয়ে শব্দ হয়ে প্রকাশ পেতে চায়। এখন যদি কাউকে সে কাছে পেত। যে কোন একজনকে যদি শোনাতে পারতো তার বেদনার ইতিহাস।

সহানুভূতি পাবার জন্য কাঙাল হয়ে ওঠে মন।

ছোট্ট শিশুর মত কেঁদে ককিয়ে ওঠে সে।—না, না, পারবো না আমি, বাঁচতে পারবো না। অসহন ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে বাসনা।

ঝনঝন করে কড়া নাড়ার শব্দ বেজে ওঠে পরক্ষণেই।

সাড়া দেয় না বাসনা।

—কপাট খোলো, শীগগির কপাট খোলো। বিশ্বনাথের স্বরে আদেশের সুর।

আঁচলে চোখমুখ মুছে কপাট খুলে দিলে বাসনা। তারপর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালে বিশ্বনাথের দিকে। আগুনের ফুল্কি ছড়ানো চোখ জোড়া নতুন ঠেকলো।

—কথা বলছিলে কার সঙ্গে? হৃদয়হীন কাঠিন্যের ধাক্কা দিয়ে বিশ্বনাথ বললে।

—কথা? বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল বাসনা।

বিশ্বনাথ ততক্ষণে তল্লাসী চোখে খুঁজতে শুরু করেছে। খাটের তলায়, আলনার পাশে, আলমারির পিছনে। একজন কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়। তাকে খুঁজে বের করবে সে। তার সন্দেহ যে অকারণ নয় প্রমাণ করবেই।

নীচের ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে বিছানার ওপর উঠে বসলে বাসনা। ঘামে ভিজে গেছে তার সারা শরীর। চোখের কোণ দুটো জ্বালা করছে। হাতের উল্টো পিঠে উষ্ণ নিশ্বাসের উত্তাপ অনুভব করলে সে। অন্ধ উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

শিথিল বসন সামলে নিয়ে বেড্সুইচ টিপে পালঙ্ক-শিয়রের নীল আলোটা জ্বাললো আবার। বিশ্বনাথের স্পর্শ বাঁচিয়ে খাট থেকে নীচে নামলে। ঘড়িটার দিকে তাকালে একবার। টিকটিক করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে ঘড়ির কাঁটা। জ'লো-হাঁসের মত ক্ষুদে পায়ে। সময় শেষ হবার নাম নেই। প্রতীক্ষার প্রহর যেন আর শেষ হয় না।

কাঁপা হাতে জানলায় রাখা কুঁজোটা থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিলে সে। ঢকঢক করে খেয়ে বাকীটা চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলে। আঁচলটা ভিজিয়ে নিয়ে প্রলেপ দিলে কানে কপালে।

নিদ্রিত বিশ্বনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বিতৃষ্ণায় ভরে গেল তার মন। বিশ্বনাথ এত কুৎসিত?

না। এ নারকীয় পাতালপুরীর বন্দী জীবনকে ত্যাগ করে যাবে সে, সহ্য করবে না অকারণ নির্যাতন।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আরাম কেদারাটায় বসলে এবার। আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে উঠলো বাসনা। আশ্চর্য।

ঐ কুৎসিত লোকটার পাশে কি করে কাটিয়েছে সে এতদিন!

নীচের হল্ ঘরের দেয়ালঘড়িতে টং করে একটা ঘণ্টা বাজলো। কিছু ক্ষণ, আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

প্রতিহিংসার আগুন জ্বলেছিল হয়তো তার চোখে। প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল সেদিন।

বিশ্বনাথের ক্যাডিলাক বিচিত্র ধ্বনি তুলে ফটক পার হতেই দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। চিকের পর্দাটা তুলে দিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। চকিতে চারপাশ দেখে নিলে অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে। তারপর চঞ্চল চোখ চেয়ে তাকালে গলিরাস্তাটার দিকে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো তার বিষাদী মন। প্রতিদিনের মত আজো বসে আছে ছেলেটি। তারই দিকে তাকিয়ে। বাসনাও তাকিয়ে রইলো। আজ আর তাকে চাবুক মারতে ইচ্ছা হ'ল না। কেমন যেন দয়া হ'ল। অসহায় ব্যর্থতা বুকে করে এখনো অপেক্ষা করছে সে। দিনের পর দিন আশা আঁকড়ে অপেক্ষা করছে। হাসি পায়। কৌতুকের হাসি চমকে যায় বাসনার মনে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। চমৎকার যৌবনসুলভ চেহারা। চেষ্টা করে তার দিকে চোখ রেখে মৃদু হাসলে। তরুণটির মুখেও উদ্ভাসিত হ'ল এক টুকরো অনুরাগসুখহাস্য।

মুগ্ধ মোহে তাকিয়ে রইলো বাসনা। ভুলে গেল লোকলজ্জা। উচিতানুচিতের বালাই ধুয়ে মুছে গেল। অভূতপূর্ব একটা খুশির রেশ যেন জলতরঙ্গের বোল ফুটিয়ে গেল মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

তারপর, হঠাৎ সেখান থেকে ছুটে পালালো বাসনা।

এতক্ষণ যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল সে। আত্মস্থ হতেই অত্যন্ত লজ্জা বোধ করলো। কান লাল করে পালিয়ে এলো। একটা ছিছি-কার ঠেলে উঠলো তার বুক থেকে। কেন, এতদিনের সক্ষম বাঁধনে বাঁধা মনের গ্রন্থিটা হঠাৎ আজ এত ঢিলে দিলো কেন? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বাসনা, বারান্দায় দাঁড়াবে না সে কোনদিন, তুলবে না আর চিকের পর্দাটা, তাকাবে না জনপদের দিকে।

প্রতিজ্ঞা টিকলো না তবু।

পরের দিন বিশ্বনাথ চলে যেতেই চিকের পর্দাটা তুলে দাঁড়ালে সে। চকিতে চোখাচোখি হ'ল। একরাশ বই বগলে করে কোথায় যেন চলেছে ও। বাসনাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালে পথের মাঝে। সরে যেতে ইচ্ছে হ'ল না বাসনার। শুধু ঈষৎ লজ্জায় চোখ ফেরালে অন্য দিকে। মনে মনে চাইলে তরুণটির সামনে তার যৌবন সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করতে। কৌতুকে হাসলে।

তারপর। তারপর লিপির দৌত্যে পরিচয় হ'ল প্রগাঢ়। এলো আমন্ত্রণ। এসেছে সুযোগ।

না, আর বোধ হয় বেশী দেরি নেই। সময় ঘনিয়ে আসছে।

বাসনা অনুভবে বুঝতে পারে, সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই ভয় বাড়ছে তার।

না। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। অধৈর্য হবে না। আর কিছুক্ষণ পরেই তো শুরু হবে তার অভিসারযাত্রা। জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করবে বিশ্বনাথকে। তারপর দয়িতের কাঁধে ভর দিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। স্খলিত তারার মত। হাউইয়ের ফুলের মত জীবন ভোর ফুটে ফুটে পড়বে অজস্র-সুখ খুশীয়াল অনন্ত মুহূর্ত। ওদের যুগ্মযৌবন দিনের আকাশ জুড়ে প্রহরী থাকবে রঙিন রামধনু, রাতের আসমানে পাহারা দেবে রূপালী পাহাড়।

আগামী সুখের স্বপ্ন চঞ্চল করে তোলে বাসনাকে।

ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে কপাটের কাছে এলো সে। খিলটা খুললে খুব আস্তে। খুট্ করে একটা শব্দ হ'ল। ভয়ে বুকটা দুলে উঠলো তার। নিঃশ্বাস চেপে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। না, বিশ্বনাথের ঘুম ভাঙেনি।

বাইরে বেরিয়ে এলো সে এবার। দ্রুত পায়ে এসে দাঁড়ালে বারান্দায়। তুলে ধরলে চিকের পর্দাটা।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলে ভাল করে।

বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগেই। ঝকঝকে ইস্পাতের পাতের মত চমক দিচ্ছে পিচের রাস্তা। ক্লান্ত পৃথিবী নিঝুম ঘুমে ঢুলছে। কোথাও নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। নিঃশব্দ। নিশ্চুপ। গলির মোড়ের গ্যাসবাতিটাও যেন জৌলুস হারিয়েছে।

মিনিট কয়েক সময় আছে আর হাতে। এখনি এসে পড়বে ও। তার আগে—

হোক্ চুরি, তার অজস্র বসন-ভূষণ রত্নালঙ্কারের কিছু সে সঙ্গে নেবেই।

পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে প্রসাধন কক্ষের দিকে পা বাড়ালো সে। হঠাৎ চোখ গেল তার অন্ধকার বারান্দাটার দিকে। ভয়ে শিউরে উঠলো। সুদীর্ঘ বারান্দাটা অন্ধকারে ছম্ছম্ করছে। থামের পর থাম, কার্নিসের কোলে কার্নিস ডুবে আছে অন্ধকারে। সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময় বোধ করলে বাসনা। বাড়িটা এত বড়, এমন বিরাট আকার বাড়িটার!

কিসের একটা শব্দ হ'ল যেন। চট্ করে সরে এসে কপাটে কান পাতলে সে। অপেক্ষা করলে অনেকক্ষণ। না, ঘুম ভাঙেনি বিশ্বনাথের।

বহুদূরে একটা মোটরের হর্ন বাজলো। বিশ্রী লাগলো শব্দটা। ক্যাডিলাকখানা এমন বিশ্রী আওয়াজ করে না। ভাবলে বাসনা। পরক্ষণেই হাসি পেল তার। বাড়ি গাড়ি এ সবকে এখনো নিজের ভাবছে সে?

এর পর কি আর গাড়ির দরওয়াজা খুলে বিনয়নম্র সেলাম জানাবে বাহাদুর? নাই বা জানালে সম্মান, নাই বা পেল সে ফাঁকা মাহাত্ম্য। সুখী তো হতে পারবে।

ধীরে ধীরে সাজঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে বাসনা।

পরমুহূর্তেই চোখ ঝলসে গেল তার।

হঠাৎ বাতাসের বুক চিরে শিস বেজে উঠলো।

কিন্তু। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে বাসনার। পা টলছে।

এত ঐশ্বর্য তার? এ সমগ্র ঐশ্বর্য তারই?

দেয়ালের চারপাশের আয়নাগুলো ঝক্‌মক্‌ করছে বিজলীবাতির রোশনাই লেগে। বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো বাসনা।

দুধের মত সাদা জর্জেট। লাল বেনারসী। য়্যামেথিস্টের মত সবুজাভা রেশমী বেগমবাহারের গায়ে। নীলার অশ্রু দিয়ে রাঙানো নীলাম্বরী। চম্পাবরণ কড়িয়াল।

প্রত্যেকটির স্পর্শ নেয় বাসনা। তড়িৎ হাতে খুলে ফেলে তার ভাঁজ, মেলে ধরে উজ্জ্বল আলোকের সামনে। তৃষাতুর চোখ তার দৃষ্টি দিয়ে রস আহরণ করে।

কাচের আলমারিটার দিকে ফিরে তাকায় বাসনা। উন্মাদনা নেচে ওঠে তার সুরাক্ত শোণিতে। অজস্র রত্নালঙ্কারের উজ্জ্বল ঝলসানি। আইভরির হাঁসুলী, প্লাটিনামের দুল। হীরার কণ্ঠহার, মুক্তোর সিঁথিময়ূর। প্রবালের মালা, সোনার কঙ্কণ।

এত ঐশ্বর্য তার? এর একক সম্রাজ্ঞী সে?

হঠাৎ যেন এক গোপন সুড়ঙ্গপথের কপাট খুলেছে, বাসনার মনে হয়, আর চোখের সামনে ঝলসে উঠেছে প্রবাল প্লাটিনাম, হীরেজহরৎ, মণিমুক্তা চন্দ্রহারের হাট। ভোরের সূর্যের মত! শারদ রামধনুর মত ফুটে পড়ছে অপূর্ব রঙ আর রত্নের সমাবেশ। দিনের আলোয় তার দেহের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছে এরা, কিন্তু উচিত মূল্য পায়নি বাসনার চোখে।

অদ্ভুত।

না, এর একটা কাণাকড়িও ফেলে যেতে ইচ্ছে হয় না।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে বাসনা। মাথা ঝিম্‌ঝিম করে তার।

বাতাস চিরে আর একটা শিস বেজে উঠলো।

বাসনা তখনও বিমূঢ় স্থির। না, না, এসব ফেলে যেতে পারবে না সে। এসব ফেলে—যেতে পারবে না।

তী র - ধ নু ক

তখন বাবুলডিহির দেহেই শুধু শহুরে ছাপ ছিল, মনটা ছিল গেঁয়ো। ইস্কুল লাইব্রেরি, ওমনিবাস ইলেক্‌ট্রিসিটি। ছিল না কি! সিনেমা হাউস থেকে সিমেট্রি অবধি সব কিছুই ধোপদুরস্ত, ঝকঝকে। বিরাট কারখানা। বড়ো বড়ো দোকানে সাজানো শো-কেসের প্রলুব্ধি, ফিরিঙ্গি মেমের প্ররোচনা। ছিল সব, ছিল না জীবন। থামা ইঞ্জিনের মত হুইস্‌ল দিতো, ধোঁয়া ছাড়তো, কিন্তু এক পা এগিয়ে যাবার সামর্থ্য ছিল না শহরটার।

শান্তনু ফিরে এসে দেখলে নতুন নগর বাবুলডিহি জেঁকে উঠেছে, জমে উঠেছে। নেশা ঘুচেছে, এসেছে উন্মাদনা। বাঁচতে শিখেছে মানুষগুলো।

স্টেশন থেকে বাইরে যাবার আন্ডারওয়ের সুড়ঙ্গপথে সেই মিহি আলোর কণিকা নিভে গেছে, এসেছে ফ্লোরেসেণ্টের রোশনাই। কারখানার সেই আকাশছোঁয়া চিম্‌নির ভোঁ-এ ভাটা পড়েছে, কঁকিয়ে কাঁদে এখন সাইরেন। খরচ কম, বাজন জোর। লুডোর ছকের মত বাঁধা রাস্তা। পাথর আর পীচের চওড়া মেটাল রোড। একটা অতিকায় কুমীর যেন রোদ নয়, ছায়া পোয়াচ্ছে। দু'পাশে হিজল আর হরিতকীর গাছ। দেওদার আর আমলকী। এখানে ওখানে ঘাসের জাজিমে আধো শুকনো মুচকুন্দের হলুদ-রাঙা পাপড়ি। দুপুর রোদের ছায়া-ছায়া বাতাসে ভাসে মিঠে সৌরভের স্নিগ্ধতা। সারিবাঁধা বাংলোর বাগানে পাম আর পাতাবাহার দুলছে ঈষৎ হাওয়ায়। পেরাম্বুলেটারে কুকুরের বাচ্চাটাকে বসিয়ে হাসাহাসি খেলা করছে কয়েকটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে একটা সাইকেল-রিক্সা এগিয়ে আসছে। কালো শাড়ি, রুপালী জরির পাড়, ফর্সা মুখ। চেনা গেল না তবু। মাল-গাড়ির শাণ্টিংয়ের আওয়াজ শুনে ওদিকে তাকালো শান্তনু। শেডের ওপাশে আরেকটা ইয়ার্ড বেড়েছে।

শান্তদা!

চমকে ফিরে তাকালে শান্তনু।

অনুপমার মুখে হাসি উছলে উঠলো। —কখন এলে শান্তদা? এই তো আজই দুপুরে গিয়েছিলাম তোমাদের বাসায়। হাজার হোক্‌, এটা তোমার জন্মস্থান, মানুষ হয়েছো এখানে। মাঝে মাঝে কি আসতে নেই? উঃ, ভাগ্যিস মাসিমারা বদলি হয়ে এলেন আবার, তা না হ'লে তো তোমার সঙ্গে দেখাই হ'ত না আর এ জন্মে। কেমন আছো? কথা বলছো না যে?

প্রথমটা একটু কথা খুঁজতে কষ্ট হচ্ছিল শান্তনুর। চিনতে তো পারে নি চট্‌ করে। নেহাৎ সমিতা বলেছিল বলেই বুঝতে পারলো। অনুপমা! এই সেই অনুপমা? কিন্তু ঠিক যেমনটি আশা করেছিল তেমন তো নয়।

—কি, কথা বলছো না যে!

শান্তনু হেসে বললে, কথা বলার সুযোগ দিলে কৈ? নিজেই তো হরবর করে বলে গেলে কি সব, বুঝতেই পারলাম না আদ্ধেক।

অনুপমা হেসে উঠলো খিল খিল করে।—চিনতেই পারোনি তাই বলো। আর নয়তো ভুলে গেছো আমাদের।

—বোধ হয় চিনতেই পারিনি! কারণ, যাকে মনে পড়ছে সে কাউকে 'শান্তদা' বলবে, 'তুমি' বলবে বলে তো মনে হয় না।

অনুপমা এবার রিক্সা থেকে নামতে নামতে বললে, এই যে লক্ষ্মী ছেলের মত কথা বেরুচ্ছে। সমি বলেছিলো বটে, শান্তদা একেবারে বদলে গেছে। তা এতো বদলে যাবে ভাবতে পারিনি। সত্যি, সেই বোকা বোকা ছেলেটি বড়ো হয়েছে, বুদ্ধিমান হয়েছে দেখেও 'দাদা' বলবো না, 'তুমি' বলবো না?

অনুপমা আবার হেসে উঠলো, সশব্দে।

দুপুরে যখন ফেন্সিংয়ের ফটকে নাম দেখতে দেখতে বাড়ি খুঁজছিল ও, অনুপমাকে তখন দেখেছিল, ওদের বাসা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দলবল নিয়ে। তখন চিনতে পারেনি। এখন যেন আরো অপরিচিত মনে হচ্ছে।

সমিতা খুশিতে চোখ নাচিয়ে বলেছিল, আর দুমিনিট আগে আসতে পারলে না শান্তদা!

—কেন রে? মা হেসে প্রশ্ন করেছিলেন।

—বাঃ রে, অনুরা এসেছিল না!

—অনু? একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করেছিল শান্তনু।

—ও মা, ভুলে গেছ? অনু, অনু, অনুপমা।

—ও।

না, ভুলে যায়নি শান্তনু। ভুলে যেতে চায়। ছোট বয়সের অন্তরঙ্গ, ভুলবে কেন! কিন্তু। না, অনুপমার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। কি করে দাঁড়াবে ও তার সামনে। চোখ তুলে কি তাকাতে পারবে। কথা! কি কথা বলবে! দু'জনেই হয়তো নিরস দুটো খুচরো প্রশ্ন করবে। উত্তর শোনবার জন্যে নয়। ভদ্রতার খাতিরে। দু'জনেই হয়তো চুপচাপ বসে থাকবে কিছুক্ষণ। মাথা নিচু করে। তারপর সেই শুকনো গলায় বলবে, চলি। চলে যাবে অনুপমা। খানিকটা ব্যথার ছাপ রেখে। এই তো জানা ছিল শান্তনুর।

অনুপমার আর কি রূপই বা ও ভাবতে পারে।

রং-ঝলমল ফ্রক-পরা সেই বছর দশেকের ছোট্ট মুখখানি। ফর্সা ধবধবে গালে তিনটে নীলাভ শিরা ফুটে উঠেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে অভিমানে, বিরক্তিতে বঁড়শির মত বেঁকে গেছে নাকটা। মিনিটে মিনিটে ছুটছে পোশাক বদলাতে, প্রসাধন সারতে। রঙিন কাচের জলচুড়ি, চুলের রিবন—দিনে আটবার বদলানো চাই।

সেই অনুপমাকে ও নতুন পোশাকে দেখতে চায় না।

সমিতা বললে, তোমার আসবার কথা আছে আজ সে-কথা কিন্তু বলি নি আমি। অনু জানেও না।

ভালই হয়েছে, শান্তনু ভাবলে। নিরাভরণ রূপ অনুপমার, একটা সাদা থান কাপড় ছাড়া ওর সারা দেহে থাকবে না কোন অলঙ্কার, মুখে আর ঠোঁটে থাকবে না সেই পুরোনো দিনের প্রসাধনের নেশা—এ যেন কল্পনা করতে পারে না শান্তনু।

আশ্চর্য।

কে বলবে, অনুপমা বিধবা।

বিয়ের পর ফুর্তি আর ফুরসতে ভরা তিনটি মাস। রামধনু-চোখের ছোট অবকাশ। আরাম আর আনন্দে কেটে গেল অবসরের বাসর। তারপর। তারপর হঠাৎ একদিন জ্যোছনা রাতের পাঁপড়ি গেল খসে, অনেক অনেক তারার ফুল শুকিয়ে গেল।

সে-সব দিনের কথা যেন অনুপমা ভুলে গেছে। বনবিহারীবাবুও যেন ভুলতে পারলে বাঁচেন। স্ত্রী রত্নমালাকে বলেন, একমাত্র সন্তান অনুপমা, ওকে মেয়ে না ভেবে ছেলেই ভাবো না। এক বৌ মারা গেলে কি আবার বিয়ে দিতে না ছেলের?

—অনুমা'র আবার বিয়ে দেব আমি।

—কি যে বলো। রত্নমালা উত্তর দেন বটে, কিন্তু ঠিক প্রতিবাদের জোর পান না। সাহস নেই, এই যা। মনে মনে ভাবেন, উনি আরো শক্ত হয়ে বলেন না কেন। বললেই তো পারেন, কে কি বললো না বললো, যায় আসে না। রত্নমালার আপত্তিটুকুও কেন ধমক দিয়ে চেপে দেন না। কৈ আরো পাঁচটা ব্যাপারে তো রত্নমালার কথা টেঁকে না। নিজের ইচ্ছেতেই চলেন।

তবু। নরম স্বরে বড়োজোর বলবেন বনবিহারীবাবু, এই বয়সে ও জীবনটা খুইয়ে বসে থাকবে, এই চাও?

কত কিই তো বুঝতে পারেন বনবিহারীবাবু, বিয়ের পর থেকে আজ অবধি একটা কথাও কি গোপন রাখতে পেরেছেন রত্নমালা? মুখ ফুটে না বললে কি বুঝতে পারেন না?

রঞ্জন মারা গেল। ঠিক বিয়ের তিনমাস পরেই। কান্না পেয়েছিল অনুপমার। বুকের ভেতর একটা ফাঁপা ব্যথা। ফাঁকা ফাঁকা। হঠাৎ যেন বাড়ি খালি হয়ে গেল, মায়ামমতার শেষ রাতটা অবধি ফেলে রেখে। ফাঁকা নির্জন বাড়িতে একা নিকাজ রাত কাটাবার মত দুঃসহ।

কিন্তু।

আবার ফিরে এলো অনুপমা। আয়নার সুমুখে। সাজলো সযত্নে। হাসলো প্রাণ খুলে। বললে কথা। কথা, কথা, কথা।

জীবনের কোথাও যেন বাঁক নেই। হাসি আর হাসি। ছেলেমানুষের মত তুচ্ছ কৌতুকে হেসে উঠবে সশব্দে। লাল রেশমের হিল্লোল ছড়িয়ে হেলে দুলে হাঁটবে। নয়নারাম ভঙ্গিমায় পটুনৃত্যের মুদ্রাময় আবেশে হাসিতে ঢলে ঢলে চলবে। ললিত কৌতুকলাস্যে। লাবণ্যের বন্যায়। খুশির জোয়ারে যেন ভেসে চলে। কথা। বিশ্রম্ভাতুর বিহঙ্গের মত কামনা-কাকলির স্রোত। মিষ্টিমধুর সুরেলা কণ্ঠস্বর। অনর্গল কথা বলে চলে। কথা, কথা। আর মনমাতানো গানের ফাঁকে সঙ্গতের তালের মত

হাসি ছিটিয়ে দেয় কথার ফাঁকে। হঠাৎ গেয়ে ওঠে একটা গানের কলি নিজের মনেই। থমকে থমকে। হেসে ওঠে।

—তাকিয়ে দেখছো কি হাঁ করে?

হ্যাঁ, অনিমেষ চোখেই তাকিয়ে দেখতে হয়। দুরন্ত হাসি দিয়ে আঁকা ঠোঁট, চোখের কালো তারায় চকিত চাঞ্চল্য। সাদা পাতাবাহারের মত গালের ওপর নীল শিরার সম্মোহন। লাল রেশমী শাড়িতে জড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরা দেহ। ডানদিকের কাঁধে একটা কালোর ছোপ। পিঠের সঙ্গে এঁটে আছে কালো মলমলের ব্লাউজটা। শ্বেতপাথরের মত সাদা ধবধবে ঘাড়ের কাছ থেকে পা অবধি ঢর্লে পড়েছে সোনালী জরির নক্সা-কাঁটা আঁচল। আর পিঠ বেয়ে দুলছে সুপুষ্ট বেণীর লুব্ধতা।

—শান্তদাটা কি বল্‌তো সমি! হেসে উঠলো আবার।

সমিতাকে বললে, বলিস নি বুঝি কিছু? চলো, শান্তদা, হিজলির দিকে বেড়াতে যাবো। হাঁ করে রয়েছো যে, বুঝতে পারছো না। তুমি না এলেও যেতাম। অন্যদিন চাঁদমারি অবধি যাই, আজ তোমার মত একটা বীর-পুরুষ বডিগার্ড রয়েছে যখন, হিজলি অবধি যাবো। খিলখিল করে হেসে উঠলো আবার অনুপমা।

তারপর সমিতার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—হুঁ। কি ব্যাপাররে সমি, এত সাজগোজ করেছিস যে! হিজলির নাম শুনেই? আবার হেসে উঠলো অনুপমা।—আজকাল তো আর ওখানে চাঁদমুখ ডোটিনিউরা নেই।

কি হচ্ছে! চোখের ধমক দিলো সমিতা। কিন্তু, ঐ অবধি।

অনুপমার যা খুশি তা বলবে, নিজের দিকে না তাকিয়েই। অথচ অনুপমাকে কিছু বলতে হ'লে ভেবেচিন্তে বলতে হবে। ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে কষ্ট হয়, আঘাত দেওয়া যায় না। অনুপমা নিজেই যে শুধু ভুলে আছে তা নয়, ওরাও ভুলে যাবার ভান করে। তবু হিরন্ময়ী ভুলতে পারেন না, শান্তনু তাঁর ছেলে।

সমিতাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যান।—কি হচ্ছে সমি?

ভয় পায় সমিতা।

শান্তর সঙ্গে তোদের এত হৈ হৈ কিসের? রঙিন কাপড়চোপড় পরে বলেই কি কচি খুকি নাকি অনু? আর তোরা হাসিঠাট্টা আমোদ আহ্লাদ কর, মানে হয়। শান্তকে তার মধ্যে টেনে নিয়ে যাস কেন? হাজার হোক, অনু হিন্দুর ঘরের বিধবা।

—বাঃ রে, শান্তদার ছোটবেলাকার বন্ধু ও। ক্ষীণ প্রতিবাদ সমিতার।

ঝাঁঝালো গলায় উত্তর আসে।—ন্যাকামি করিস না সমি।

অভিমানের স্বরে সমিতা বলে, বেশ, অনুকে আসতে বারণ করে দেবো।

—তাই বলেছি। কথাবার্তা বলবে না কেন, বলবে। সত্যি, দোষ নেই মেয়েটার। এই বয়সেই কপাল পুড়েছে। যতটা ভুলে থাকতে পারে। তা বলে ওর ঐ আইবুড়ি মেয়ের মত চালচলন, সাজগোজ আমার ভাল লাগে না।

সমিতা বলে, মনে ওর কোন পাপ নেই বলেই সাজগোজ করতে পারে।'

—আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে কে কথায় পারবে বাপু।

—শান্তদার তো পনেরো দিন কেটেই গেল, আর তো সাতটা দিন। সাত দিনেই নষ্ট হবার মত ছেলে নয় তোমার শান্তদা।

—তোর ঐ কাটা কাটা কথার জন্যেই তোর মা কাছে রাখতে চায় না, বুঝতে পারছি এখন।

সমি হেসে ওঠে।—ঠিক বলেছো। এবার তুমিও তাড়াতে চাইবে তো?

হিরণ্ময়ী না হেসে পারেন না। আর পরমুহূর্তেই অনুপমাকে হাসি মাখানো মুখে ফেন্সিংয়ের ফটক পেরিয়ে আসতে দেখে সব রাগ উবে যায়। সত্যি! বড়ো ভালো মেয়েটা।

মৌসুমী ফুলের বাগানের মাঝ দিয়ে সরু লাল কাঁকরের আর্ক-ওয়ে, দু'পাশে নুড়ি পাথরের মালা। মরমর মরমর শব্দ হয় অনুপমার জুতোর চাপে। হেলে দুলে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে অনুপমা।

সমিও এগিয়ে যায় সবুজ বেতের চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে।—কি রে, লোক পাঠালুম সকালে, এলি না যে ?

—এমনি। শরীরটা ভাল ছিল না।

তাই কি? না। সকালে অনুপমার সারা দেহে মনে একটা ঝড় বয়ে গেছে। অনেক চেষ্টায় সহজ হয়েছে, শক্তি এনেছে শান্তনুর সামনে এসে দাঁড়াবার।

—তুই আসবি না ভেবে শান্তদা গেল কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

—ও।

বেতের কেদারাটা টেনে নিয়ে বসলো অনুপমা। মুখে চোখে একটু স্বস্তি ফুটলো। যাক্, শান্তনু নেই।

হিরণ্ময়ী বললেন, তোরা থাক্ তা হ'লে বাসায়, আমি যাই অনুর মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

হিরণ্ময়ী চলে গেলেন। অনুপমা ঠোঁট টিপে হাসলে একবার, সমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে।—মাসিমা তোকে ধমক দিচ্ছিলেন মনে হ'ল, কেন রে?

সমিতাও হাসলে।—না, রে, ধমক নয়। বলছিলো আমার কাটা কাটা কথার জন্যেই নাকি মা কাছে রাখতে চায় না আমায়, এখানে পাঠিয়েছে।

—হুঁ। পাশের বাড়ির ছেলেটির জন্যে, না কাটা কাটা কথার জন্যে ভগবান জানে! বিদ্রূপের দীর্ঘশ্বাস ফেললে অনুপমা।

মুখোমুখি বারান্দায় বসে রইলো ওরা দু'জনে। বাংলো-পিওন বিশ্বনাথকে ডেকে একবার বললে, চিক দুটো তুলে দিতে। তারপর মোটা মোটা থামের ফাঁকে যতখানি গেছো আকাশ দেখা যায়, তাকিয়ে রইলো। কথা নেই। সমিতার হাতে শুধু পুলির দড়ি-জোড়া। পাখাটাকে টেনে একবার এদিকে আনছে আবার পাঠাচ্ছে ওকোণে।

পাশের বাংলোর বাগানে মিসেস রবিনসন বাগিচা তদারক করে বেড়াচ্ছে, বাচ্চা ছেলেটার হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে।

পাঁউরুটির প্যাঁটরা মাথায় লোকটা চলে গেল। সাইকেলের ক্রিং ক্রিং

শব্দ করে এসে দাঁড়ালো ডেয়ারি ফার্মের লোকটা। দুধের বোতল দুটো নামিয়ে রেখে সেও চলে গেলো।

ধোপদুরস্ত কালোপাড় শাড়ি পরে আয়াটা সার্ভেণ্টস্-কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছে। সেদিকে চোখ গেল সমিতার।

বললে, এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাপু চোখে লাগে। জমাদারনীটা অবধি রোজ কাপড় বদলায়।

অনুপমা হাসলে।—হুঁ।

—কথা বলছিস না যে। কি হ'ল তোর?

—না, কিছু না। এমনি।

—শান্তদা দেখলে তো—জানিস, শান্তদা কি বলে? সমিতা হেসে উঠলো। বললে, তুই নাকি দিনে পাঁচ কোটি দশ লক্ষ কথা বলিস। হো হো করে হেসে উঠলো সমিতা।

অনুপমাও একটু মুচকে হাসলে। তারপর আবার চুপ করে রইলো।

পশ্চিমের মেঘটা এদিকে ক্রমশ লাল হয়ে আসছে। লাল আর হলুদ মেশানো একটা জাফরানি আলো এসে পড়েছে। ফুলের পাপড়িগুলোর রং গেছে বদলে, চিকচিক করছে। সামনের পীচের রাস্তাটাও। সমাহিত শান্তিতে পৃথিবীটা যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিঃস্ব।

—কি এতো ভাবছিস বল তো? সমি প্রশ্ন করে।

—কিছু না।

কিছু কি নয়? না। সত্যি কিছু ভাবছে না অনুপমা। তবু, অনেক, অনেক কিছু ভাবার চেয়েও যেন গভীর। ভাবনা চিন্তার শেষ সীমানার না-ভাবা।

মনে মনে রোমন্থন করে চলে অনুপমা। সকালের সেই দৃশ্যটা।

হঠাৎ যেন কথাগুলো সচেতন করে তুলেছিল অনুপমাকে।

—ঐ যে, শান্তদা। সাইকেল-রিক্সাটা গেট পার হতেই সমিতা বলে উঠলো। বেশ কিছুটা স্বস্তি পেল যেন।

খুশী খুশী চোখে এগিয়ে এলো শান্তনু।—যাক্, অনুও এসে গেছে।

—কি ব্যাপার? সমিতা প্রশ্ন করলে।

—তোদের সিনেমা হাউসটার কিছু উন্নতি হয়েছে কিনা দেখবার ইচ্ছে হল। তাই টিকিট কিনে আনলাম তিনখানা। তারপর অনুপমার দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার আবার অমত নেই তো?

কথা বললে না অনু, ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালে। অর্থাৎ, আচ্ছা। ঠিক যেন প্রশ্নের উত্তর নয়। অনিচ্ছার সম্মতি।

সমিতা বলে উঠলো, মাসিমা যে নেই। ক'টা বাজলো?

—এখনি বেরুতে হবে। মা নেই?

—অনুদের বাড়ি।

—সুখিয়াকে দিয়ে চাবিটা পাঠিয়ে দে না।

তা নয়। মাসিমার কথাগুলো তখনো মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে সমিতার। চট করে কিছু উত্তর দিতে পারলো না। কি করে তুলবে ও আসল কথাটা।

যাক্, আরেকবার নয় বকুনি খাবে।

কিন্তু মাসিমার কথাগুলো হয়তো মিথ্যা নয়।

অনুর পাশে বসতে যাচ্ছিল শান্তনু, একরকম ঠেলে সরিয়ে দিলে সমি।

সিনেমা ঘরে পৌঁছে—এই সরো, আমি মাঝখানে বসবো।

দুটো দীর্ঘ দীর্ঘ ঘণ্টার একটা মুহূর্তও উপভোগ করতে পারলো না শান্তনু। কেমন যেন তালকাটা নাচের মত। সুর ভুলের গান। অনুপমা হঠাৎ বদলে গেছে কি! সেই সশব্দ খুশখেয়ালের হাসি নেই, নির্বাক। চুপচাপ বসে আছে। ছোট ছোট উত্তর। নেহাৎ অনিচ্ছার সাড়া।

একটা নতুন চেতনার আভাস ভাসছে অনুপমার মনে। বারবার শুধু মনে পড়ছে সেই কয়েকটা টুকরো কথা।

পর্দার আড়ালে ছিল অনুপমা। হঠাৎ ঘরের ভেতর গলার স্বর শুনতে পেল।

মা আর বাবা কথা বলছে! সরে আসতে যাচ্ছিল, নিজের নামটা শুনে থমকে দাঁড়াতে হ'ল অনুপমাকে।

—এইভাবে কি মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাও। গলার স্বর ভারি হয়ে এলো বনবিহারীবাবুর।

রত্নমালার কণ্ঠেও কান্নার আভাস।—আমারই কি কষ্ট হয় না ভাবো?

—অনুর বিয়ে দোব আমি আবার।

রত্নমালা নিশ্চুপ।

—হেসেখেলে বেড়ায় বলে কি বুঝতে পারি না। ওর ভেতরটা—

—চুপ করো তুমি। ওসব আর শুনিও না আমাকে। সত্যি করেই হয়তো রত্নমালা আঁচল চাপলেন চোখে।

বাপের দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা স্পষ্ট কানে এলো অনুপমার।

—শান্তনুকে বেশ লাগলো আমার। বনবিহারীবাবু বললেন।

রত্নমালার কণ্ঠস্বরে আনন্দের চমক।—সত্যি, চমৎকার ছেলেটি।

—ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ।

মৃদু হাসির রেশ বাজলো রত্নমালার গলায়।—কি ঝগড়াই ছিলো, শান্ত এসে আমার কাছে লাগাচ্ছে অনুর নামে, অনু গিয়ে লাগাচ্ছে হিরণদির কাছে।

—কদিন থেকে দেখছি, ওদের দুটিতে বেশ ভাব জমে উঠেছে।

—হবেই তো।

—তা নয়। দুজনের মধ্যে—

কথাটা শেষ করতে বাধো বাধো ঠেকলো হয়তো।

রত্নমালা উত্তর দিলো, ও তোমার মনের ভুল। কিংবা কি জানি!

—শান্তনুর সঙ্গে বিয়ের চেষ্টা করলে কেমন হয়?

ব্যাস্। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি অনুপমা। পা টলছিলো ওর। সোজা চলে এসেছিল ও শোবার ঘরে। দরজায় খিল এঁটে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল। বুকভরা ব্যথা নিয়ে। শান্তনু! শান্তনুকে কি ও ভালবেসে ফেলেছে? হয়তো। বাবা তো ভুল করে না। বারবার শান্তনুদের বাড়ি

যেতে ইচ্ছে হয় কেন। আগেকার মত কৈ সময়টা একঘেয়ে লাগে না তো। অপেক্ষার ঘড়ির কাঁটা খুঁড়িয়ে চলে কেন। শান্তদার সঙ্গে কথা কয়ে, বেড়িয়ে অন্তত তিন চার ঘণ্টা কাটায় রোজ, অথচ মনে হয় কেন এত ছোট সময়, অল্প সময়।

শান্তনুর কি অনুপমাকে ভাল লাগে?

কে জানে।

আরো কয়েকটা দিন পরে। একটু একটু করে সহজ হয়ে এলো অনুপমা। প্রতিটি কথায় সংযত বাঁধুনি। আশঙ্কার ধীরতা ভাবে ভঙ্গিতে। নেই সে হাসির হঠকারিতা। নেই সে মুগ্ধালাপের প্রলাপ।

নিঃশব্দে এগিয়ে চললো দু'জনে।

চাঁদমারির মাঠের পাশ দিয়ে। দেওদার পাতার চাঁদোয়ার নীচে লম্বা পীচের শড়ক। নির্জন। শান্ত স্তব্ধ। সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোছায়ার কৌতুক ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ইস্পাতের পাতের মত চকচকে রাস্তায়। কাঁটাবেড়ার কচি সবুজ পাতায় নরম রোদের ঝিলিক, আর বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ।

কালভার্টের পাশে সিমেণ্টের বাঁধানো বেদীতে বসেছিল এক-জোড়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণ-তরুণী। ছেলেটির সুপুষ্ট হাতখানা আদরে জড়িয়ে আছে মেয়েটির কটিদেশ। চোখে সোহাগের দৃষ্টি দু'জনেরই।

পিছনে বেদীর গায়ে ঠেস দিয়ে আছে বাইকটা।

হঠাৎ উঠে পড়ল ওরা, শান্তনু আর অনুপমা কাছে এসে পড়েছে তখন। মেয়েটিকে বাইকের সামনে বসিয়ে উধাও হ'ল। শান্তনু মৃদু হেসে তাকালে অনুপমার মুখের দিকে। অনুপমা কিন্তু মুখ ফেরালো না, আড়চোখে একবার তাকিয়েই অন্যমনস্ক হ'ল।

কোন কথা বললে না শান্তনু, সম্মতি ভিক্ষে করলে না অনুপমার কাছে। ধীরে ধীরে বেদীটার দিকে পা বাড়ালে।

—শান্‌তো-দা।

চেঁচিয়ে টেনে টেনে ডাক দিলে সমিতা।

পিছন ফিরে তাকালে দু'জনই। দুপাশের গাছগুলো ঝুঁকে রয়েছে রাস্তাটার ওপর, মাঝখানে সরু আর লম্বা মসৃণ পথ ছুটে গেছে অনেক, অনেক দূর অবধি। চোখ যায় না। সমিতা কিন্তু খুব বেশী দূরে নেই। হাতের পাতাজোড়া মুখের কাছে চোঙার মত করে আরেকবার চেঁচিয়ে ডাকলে সমিতা ছুটতে ছুটতে। তারপর থেমে পড়ে জুতোর স্ট্র্যাপ বাঁধায় মন দিলে।

দু'বার হাতছানি দিয়ে বেদীটায় এসে বসলে শান্তনু, আর পাশেই অনুপমা। বেশ কাছাকাছি। সমিতার আসতে কয়েক মিনিট লাগবে। অথচ। শান্তনুর ম'দো রক্তে হঠাৎ মাতাল হাওয়া দুলে উঠলো। ইচ্ছে হ'ল, এখনি। এই মুহূর্তে—ভাল করে তাকিয়ে দেখলে শান্তনু। কামনা-রাঙা লোভাতুর চোখে। অনুপমার দিকে। অনুপমার দেহের যৌবন-

রেখার দিকে। পাতলা অর্গ্যান্ডির ব্লাউজে বুকের উদ্দামতা পড়েছে ঢাকা। শাড়ির আঁচলটা কাঁধের পাশে। অন্যদিকে তাকাবার ভান করে অপাঙ্গে তাকালে শান্তনু। বুকের সঙ্গে যেন এক হয়ে মিশে গেছে গোলাপী রঙের ব্লাউজটা। গোল গলার সীবনপ্রান্তের বন্ধন ডিঙিয়ে তপ্তোল্লাসের তরঙ্গ। অনুপমার অধীর উন্মাদনা প্রকাশ পাচ্ছে ওর প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে। থর থর কাঁপছে অনুপমা। কণ্ঠহারের চকচকে লকেটও। যৌবন দেহের প্রতিটি ছন্দ। শ্বেতপাথরের সুডোল বাহু। সমিতার জুতোর আওয়াজ আসছে খুটখুট করে। কিন্তু পাশাপাশি তিনটি মোটা গুঁড়িতে ঢাকা পড়ে আছে সমিতা।

শান্তনুর উষ্ণ হাতের স্পর্শে চমকে উঠলো অনুপমা। চিবুকের ওপর অনুভব করলে তপ্ত নিশ্বাসের প্রলেপ।

অবশ দেহটা আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করলে অনুপমা। দুর্বল প্রচেষ্টায়।

সমিতাকে দেখা গেল।

—এই সরো, আমি মাঝখানে বসবো।

সমস্ত রাত্রি ঘুম এলো না অনুপমার চোখে। সমস্ত শরীরে তার কে যেন আগুন ছিটিয়ে দিয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করলে অনুপমা। গাল দুটো চেপে রইলো বালিশে। হাতের আঙুলগুলো উল্টে রাখলো চাদরের ওপর। অসহ্য একটা যন্ত্রণা। ঘুম আসে না, ঘুম আসে না তবু। টেনে টেনে হাতটা ঘষলে বিছানার ওপর।

কেমন একটা লজ্জা। অস্বস্তি। ভোর হল, রোদ বাড়লো। তবু শান্তনুর উদ্দেশে পা বাড়াতে পারে না। ফণাধর বিষাক্ত একটা সাপের টুঁটি চেপে ধরে আছে যেন। তবু। নিজেকে বড়ো অসহায় বোধ করছে অনুপমা।

আহারের পর খালিপায়ে এসে বসলে সে। বারান্দার ডেক-চেয়ারে।

হিরণ্ময়ী এসেছেন। শান্তনুর মা। ভাসা-ভাসা কথালাপের আওয়াজ আসছে কানে। টুকরো টুকরো ভাঙা ভাঙা কথা।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো অনুপমা। চুপ করে অপেক্ষা করলে কিছুক্ষণ। তারপর। চলতে শুরু করলে।

ওপাশের ফটকটা দিয়ে ঢুকলে অনুপমা। সামনাসামনি এতখানি পথ হেঁটে যেতে কি এক অস্বস্তি। দূর থেকে শান্তনু তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। আর মাথা নিচু করে এতখানি যেতে পারবে না অনুপমা। তার চেয়ে ওপাশের ফটকটাই ভাল। হঠাৎ গিয়ে হাজির হবে একেবারে শান্তনু আর সমিতার পিছনে।

কিন্তু। কৈ! কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। শান্তনু নেই, সমিতা নেই।

পা টিপে টিপে এগিয়ে এলো অনুপমা। ধীরে ধীরে পর্দাটা সরিয়ে এক পা ভেতরে দিয়েই—বেরিয়ে এলো।

আসতে যেটুকু সময় লেগেছিল, ফিরতে অনেক কম। দ্রুত পায়ে বাড়ির পথ ধরলে অনুপমা।

বিয়ের ঠিক তিনমাস পরেই রঞ্জন মারা গিয়েছিল। বুক ঠেলে উঠেছিল ব্যথা! চোখে নিঃস্বতার অশ্রু নেমেছিল। কপাটে খিল দিয়ে গুমরে গুমরে কেঁদেছিল অনুপমা।

আজ আবার কাঁদলে। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ, রত্নমালা হয়তো একবার ডাকাডাকি করে ফিরে গেলেন। আস্তে আস্তে উঠে বসলো অনুপমা। ঘরের কোণে ঢুকেছে আবছা অন্ধকার। দুপুরের রোদ সোনা হারিয়েছে। নেমেছে নীলাভ কুয়াশা। সন্ধ্যার আকাশে ব্যর্থ বিহঙ্গের কান্না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো অনুপমা। তারপর।

রঞ্জন মারা যাবার পরেও আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল অনুপমা।

আজ আবার দাঁড়ালো।

রূপ? বিতৃষ্ণার হাসি চমক দিলো ঠোঁটে।

গলার হারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। খুললে হাতের কঙ্কণ, সারা দেহের অলঙ্কার। খুঁজে বের করলে সেই পুরোনো দিনের সাদা ধবধবে থান কাপড়। নিপাড় মোটা সুতোর শুভ্রতায় নিজেকে ঢাকলে। পায়ের নীচে ফেললে রেশমী অঙ্গবাস, লোহিত লালিত্য। রঙের রোশনাই নিভে গেল। পাপড়ি খুললো একটি রজনীগন্ধার অন্ধ কলি।

আয়নার দিকে, নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইলো অনুপমা। পূর্ণযৌবন শ্বেতশিউলির চোখের কোণে অশ্রুবিন্দুটা হেসে উঠলো হঠাৎ।

চাঁদমারির ময়দানকে পাশে ফেলে লম্বা পীচের সড়ক ধরে আজও হয়তো চলছে শান্তনু। হিজল হরিতকীর সাঁঝের ছায়ায়। নির্জন পথ। কালভার্টের পাশে সেই সিমেণ্টের বাঁধানো বেদীটায়। শান্তনু গিয়ে বসবে। সমিতাও।

মাঝখানে নয়।

শি শু মে ধ

রোগীদের বিদায় দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকলো সুকোমল। ঘরের রোগীটিকে এবার দেখতে হবে।

প্রায় মাসখানেক ধরে কলিকে ভুগছে সুষমা। বেশ থাকে সাধারণ মানুষের মতো, খায় দায় দিবানিদ্রা দেয় ঠিক আর আর মেয়েদের মতোই। রাঁধুনী বামুনের সঙ্গে ঝগড়া করে, ঝিকে বকে, চাকরদের ধমক দেয়। সন্ধ্যার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায় সযত্নে, কবরী বাঁধে, সিঁথিতে টানে চওড়া সিঁদুরের রেখা, কপালে পরে খয়েরের টিপ। রাঙি রঞ্জনী—হ্যাঁ তাও ওর প্রসাধনের টেবিলে স্থান পায়। ঝকঝকে রঙিন শাড়ি পরে, সাঁওতালী দোসুতী কাপড়ের পাড় আঁটা ব্লাউজ পরে। হেসে কথা কয়, গুন গুন করে গান গায় কখনোসখনো, রসিক চোখে স্বামীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় ক'রে আব্দার ধরে, সিনেমায় যাবো। সুকোমল কিন্তু 'না' বলে না।

—যাও না সুশীলাকে সঙ্গে নিয়ে।

—বাঃ রে, তাই কি বলছি আমি। সিনেমার ঐ ছাইভস্ম ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনতে যাবার জন্যে যেন আমার আর ঘুম হচ্ছে না।

—তবে যে এখুনি বললে সিনেমা দেখতে যাবো।

সুষমা মুখ হাসি হাসি করে বলে, বলছিলাম তুমি যদি যাও।

—ওঃ, এই কথা।

সুষমা কপট ক্রোধে ঠোঁট ফোলায়, কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করে, হাসবার কি আছে এতে। সিনেমা দেখলে তোমার জাত যাবে নাকি ?

সুকোমল বলে, না জাত নয় জীবিকা, সময় নষ্ট করার মত সময় আমার কোথায় বলো তো!

সুষমা চটে যায়। বলে, আমি বেঁচে থাকতে সময় তোমার কোনদিনই হবে না। আমি মরলে সুন্দর দেখে বউ নিয়ে এসো, তখন দেখবে সময় নষ্ট করেও সময় কাটছে না।

সুকোমল আবার হো হো করে হেসে ওঠে। কথার জবাব দেয় না।

কিন্তু। হ্যাঁ, একটা কিন্তু আছে এখানে।

সাধারণ মানুষের মতোই দিন কাটায় সুষমা। বেশ থাকে, খায় দায়, দিবানিদ্রা দেয়। আবার হঠাৎ, মাঝদুপুর কি মাঝরাত সে হিসেব নেই, চিৎকার করে ওঠে যন্ত্রণায়। লোকজন ছুটে আসে, ছুটে আসে ছোটবোন সুশীলা। দু'হাতে পেটটা টিপে পিঠের সঙ্গে লাগাবার জন্য কসরৎ করে, মাথাটা কোলের ভেতর গুঁজে যন্ত্রণায় ছটফট করে। লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে, জবাই করা মুর্গির মতো ঝটপট করে ওঠে, কুঁজো হয়ে সারা ঘরটায় ছোটাছুটি করে। নুন আর গরম জল খেয়ে যতক্ষণ না বমি করে ফেলে ততক্ষণ শান্তি পায় না।

চোখের সামনে এসব যখন দেখে সুকোমল, তখন তারও চোখে জল আসে। সুষমার কণ্টটা সেও যেন অন্তরে অন্তরে বোধ করে। সুষমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, পাখার বাতাস করে, হটওয়াটারের ব্যাগ ধরে কাটিয়ে দেয় সারারাত।

কিন্তু সকালের সুষমাকে দেখো। একেবারে অন্য মানুষ। ভোর-বেলাকার ফুলের মতো যদিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, তবু ওর শ্রান্তিস্নাত রূপটাকে তুলনা করা চলে শিশির-ধোয়া সোনালী সকালের যুঁই ফুলের সংগে। ঘুমজাগা বিহংগের মতো কথার কাকলি ফোটে ওর মুখে।

আসলে স্বামীর ভালবাসাই সুষমাকে এখনো টিঁকিয়ে রেখেছে। কিংবা কে জানে, স্বামীর ভালবাসা নয়, স্বামীর প্রতি ভালবাসাই হয়তো।

তবু মাঝে মাঝে অনুযোগ করে সুষমা।

বলে, লক্ষ্মীটি, একটা ভালো ডাক্তার এনে দেখাও না। সত্যি আমার মনে হয় কবে হয়তো হঠাৎ মরে যাবো।

সুকোমল হেসে বলে, মরতে তোমার এতো ভয় কেন, সুষমা?

—ভয় নিজেকে কি, ভয় তোমাকে। সত্যি বলছি, তোমাকে ফেলে রেখে আমি মরে যাবো ভাবতেও পারি না।

তারপর খানিক চুপ করে থেকে ঠোঁট টিপে টিপে হাসে, আর সুকোমলের দিকে কৌতুকের চোখে তাকায়। বলে, আমি বড্ড স্বার্থপর, নয়?

সুকোমল খুশী করার জন্য বলে, তোমার ঐ স্বার্থপরতার বিশ্রামটুকু পাই বলেই তো বাঁচতে লোভ হয়। ভেবে দেখো তো, যদি জানতাম যে তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না, তা হ'লে এত বড় হতে পারতাম, না এমন অমানুষের মতো দিনরাত খাটতে পারতাম!

সুষমা চুপ করে থাকে। ওর সুস্নাত চোখে আনন্দের অশ্রু চমকে ওঠে বেতফলের গায়ে শিশিরের মতো। এক-তারা সাঁঝের আকাশের মত। খরগোসের মতো নরম চোখ জুড়ে আসে অপার আনন্দে, মন জুড়িয়ে যায়। চন্দনের জ্বালাহর প্রলেপে যেমন ব্যথিত বিস্ফোটক শীতল হয়ে আসে।

সুকোমলের বয়স বত্রিশের কাছাকাছি। অদ্ভুত ফর্সা, বাঙালীর বাড়িতে কদাচিৎ এমন পুরুষ চেহারা দেখা যায়। ও নাকি ছোটবেলায় যখন মিশনারী স্কুলে পড়তে যেতো, নীল ব্লেজার আর সাদা প্যাণ্ট পরে, গলায় বাঁধতো চকোলেট রঙের স্কার্ফ, তখন স্কুলের ইংরেজ শিক্ষক আর শিক্ষয়িত্রীরাও ওকে প্রথম দর্শনে ভাবতো কোন ব্লু ব্লাড ইউরোপীয়ানের ঘরের ছেলে।

ওর গায়ের রঙ সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেই সুকোমল হেসে ফেলে।

ওর মনে পড়ে যায় ছোটবেলাকার একটি ঘটনাঃ স্কুল থেকে ফিরছিলো কয়েকজন সতীর্থের সংগে। ট্রামে উঠতেই সামনের সীটের দুটি মেয়ে বিস্ময়ে ফিরে তাকালো সুকোমলের দিকে। আর এতই বিস্মিত হয়েছিলো তারা যে একজন স্পষ্ট করে বলে ফেললে, কি সুন্দর ভাই! অন্যজন বললে, মোমের পুতুলের মতো।

সেই থেকে সতীর্থরা ওকে বলতে শুরু করলে, মোমের পুতুল। ক্রমে সেটা সারা স্কুলে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

এই ঘটনাটাই কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সে সুশীলাকে বলে ফেলেছিলো, আর তারপর থেকে সুশীলা ওকে জামাইবাবু বলা ছেড়েছে। কখনো বলে, ডাক্তার সাহেব, কখনো মোমের পুতুল।

সুষমা চটে যায় বোনের বাচালতায়। প্রতিবাদ করে।

বলে, সুশী ইয়ার্কি ঠাট্টারও একটা সীমা আছে, হাজার হোক্ তোর গুরুজন।

সুশীলা বলে, তোমার গায়ে লাগে তাই বলো না।

—তোর চেয়ে কালো নই আমি।

—সুন্দরও নও আমার মত। বলেই সাক্ষী মানে সুকোমলকে, বলে, বলুন তো ডাক্তার সাহেব, আমি সুন্দর না দিদি?

সুকোমল হেসে বলে, সুশীটা বড় বোকা, দিদির সামনে একথা জিজ্ঞেস করলে সত্যিকারের উত্তরটা দেয়া যায়?

সুশীলা ঘাড় বেঁকিয়ে দিদির দিকে তর্জনী দেখিয়ে বলে, হ'লো তো। কেমন? বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুকোমল পিছন থেকে তার উদ্দেশে একটা ব্যঙ্গবাণ ছোঁড়ে, অজয় এসে বসে আছে বুঝি?

আসলে মা-বাপ-মরা মেয়ে সুশীলা ছোটবেলা থেকে বড় বেশী আদর আর আব্দারের মধ্যে মানুষ হয়েছে, স্নেহ আর প্রীতি পেয়েছে সুকোমল আর সুষমা দু'জনেরই কাছে।

আর তাই পথের আলাপী অজয়ের সঙ্গে যখন ওর ঘনিষ্ঠতা জমে উঠলো, তখন বাধা পেল না সে কারো কাছ থেকে।

অজয় সত্যিই এসে অপেক্ষা করছিলো। নীল গাড়িখানা হয়তো জানালা থেকেই দেখতে পেয়েছিলো সুশীলা, কিংবা কি জানি অজয়ের গাড়ির হর্নটাও হয়তো ওর চেনা।

সুশীলা বেণী দুলিয়ে খুশিনাচের তালে পা চালিয়ে এসে ড্রয়িং রুমে ঢুকলো। বললে, জামাইবাবু ঠিক বুঝতে পেরেছেন।

অজয় হাসলো। তারপর বললে, চলো, আজ আর ড্রয়িংরুমের অন্ধকূপ ভালো লাগছে না। ফাঁকা আকাশ দেখতে ইচ্ছে করছে।

—আমাকে নয়? দুষ্টুমিভরা হাসিতে গালে টোল খাইয়ে সুশীলা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

ঝর্ণার স্রোতের মত, বন্যার ঢেউয়ের মত তড়িৎবেগে গাড়ি ছুটছিলো। সুশীলার মন ছুটছিল আরো আগে।

মাটির পৃথিবী ছেড়ে কোন্ এক স্বর্গপুরীর দিকে যেন যাত্রা করেছে ওরা। কোন্ এক রত্নদ্বীপের সন্ধানে ছুটে চলেছে। হাওয়ায় উড়ে চলেছে যেন।

বাতাস-বিপরীতে ক্ষণে ক্ষণে সুশীলার আঁচল খসে পড়ছিলো, পাড় কাঁপছিলো। ও একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো অজয়ের দিকে। কামরাঙার শিরার

মত ধারালো নাকের ওপর অজয়ের তীক্ষ্ন আর তীব্র চোখের স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি ভেসে চলেছে পীচঢালা পথের ওপর দিয়ে। শান্ত সমুদ্রের জাহাজের মত সুশীলার মন বাতাসে ভাসতে থাকে, আলাদীনের উড়ন্ত শতরঞ্জির মত।

ও তাকিয়েছিলো অজয়ের কপালের দিকে। কিঞ্চিৎ তামাটে ধরনের কয়েকটি খুচরো হাল্কা চুল স্প্রিঙের মত কুঁকড়ে কপাল কামড়ে পড়ে আছে। পূর্ণযৌবন বলিষ্ঠ পুরুষের পাশে বসলে সব মেয়েরই মনে রোমাঞ্চ জাগে, চোখে স্বপ্ন নামে, প্রাণে অজস্র আনন্দের বোল ফোটে। সুশীলার মনের ওপরও একটা জ্বালাহর শীতল শান্তির আস্তরণ পড়লো।

—এই স্পীড কমাও, বাব্বা, গাড়ি চালাচ্ছে না ঝড় বইছে। স্পীড কমাও।

গাড়ি থামলো শহর-ছোঁয়া আধাগ্রাম শহরতলীর মাঠে।

সুশীলা বললে, চলো একটু হেঁটে বেড়িয়ে আসি। ঐ পুকুর ধারে।

অজয়ও নামলো। ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে হেঁটে চললো অদূরের শরবন আর কাশ ঝোপের পাশ দিয়ে, গাঙশালিকের দল যেখানে জ'লো শামুকের সন্ধান করছে।

পশ্চিমের আকাশে তখন, মাটির পৃথিবী যেন কোন এক অসূর্যম্পশ্যাকে হঠাৎ ধরে চুমু খেয়েছে। সূর্যের লাল গাল তাই লজ্জায় আরো লাল হয়ে উঠেছে। আর পূবের বাতাস হয়ে উঠেছে কালো। কিম্বা কালো নয়, নীল আকাশের স্পর্শ লেগে নীলাভ হয়ে উঠেছে বাতাস। বাড়ন্ত মেয়ের আঙুলের মত ফাঁপালো শরের বন, সাদা ফুলের শিষ, আর তার ওপর দিয়ে বয়ে যায় হাল্কা হাওয়ার হিল্লোল। মেঠো খরগোস তড়কে ওঠে ওদের পদধ্বনিতে। খয়েরী রঙের শঙ্খচিলের দল শূন্যে চক্র দিয়ে ফেরে।

হঠাৎ ওদের চোখে পড়লো একজোড়া শালিক দম্পতির বিশ্রম্ভালাপ।

অজয় আর সুশীলা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মৃদু হাসলো।

আশ্চর্য!

ওদের নিঃশব্দ হাসিতে গাংশালিকও বুঝি লজ্জা পেল। পাখা ঝটপট করে উড়ে পালালো দুজনে দুদিকে। পরিরম্ভাশ্রিত প্রেমিকযুগল যেমন অভিসার রাতে হঠাৎ ধরা পড়ে ছুটে পালায়।

ঘাটের কাছে ভাঙা পুরোনো কবেকার একটা বাঁধানো বেদী—কে জানে, আজ এটা মাঠের পুকুর হয়ে দাঁড়িয়েছে, হয়তো একদিন ছিলো এরই চারপাশে সুসমৃদ্ধ সবুজ গ্রাম, সোনার ধান আর সোনার গ্রাম হয়তো ছিলো এর চারপাশে, আসতো নবীনা প্রবীণা রসিকা আর গম্ভীরার দল, কাঁখে কলসী আর ক্রোড়ে কন্যার শ্রান্তি তাদের চোখে। হঠাৎ হাতছানি দিতো শিশুতরঙ্গের সারি, কচি চাঁদ আর তন্দ্রাক্রান্তা সূর্য একসঙ্গে দিতো সাঁঝের ডাক, আকাশ তার নিঃশব্দতায় জানাতো অপেক্ষার অধর-কম্পন। গ্রামীণার দল ছুটে চলতো ঘাটের দিকে। তাদের পায়ের শব্দে চমকে চোখ ঢেকে লুকিয়ে পড়তো মেঠো নেউলের দল—পাশের সফল ধানের জমিতে।

শূন্যাকাশের শঙ্খচিল যেমন অবিরাম চক্র দিয়ে ফিরছে, তেমনি অজয় আর সশীলাও চক্র দিয়ে ফিরলে পুকুরের ধারে। শহর কোলকাতার

মানুষ ওরা। তাই হয়তো শহরতলীর মধ্যে ওরা খুঁজে পেয়েছে রোমান্সের রস। ওদের কল্পনার বিশ্রাম নেই। একের স্বপ্ন আরেকজনের কথায় সম্পূর্ণতা পায়। চপলা নাগরীর ক্লান্তির মত সুশীলার চোখে তৃপ্তি নামে।

অদ্ভুত!

শহর কোলকাতার বাণিজ্য-ব্যস্ততার মাঝে কে জানতো এই রোমান্স রাজত্বের ঠিকানা।

আরেকটা পাক দিয়ে এসে ওরা বসলে সেই ভাঙা ঘাটের ক্ষয়িষ্ণু বেদীর ওপর। পাশাপাশি। পাশাপাশি বসলে ওরা গায়ে গা লাগিয়ে। অজয়ের কোলের ওপর লুটিয়ে পড়লো সুশীলার হাত। সুশীলার নরম মখমলের মত হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে চমকে উঠলো অজয়।

—একি, এত গরম কেন তোমার হাত? জ্বর হয়েছে নাকি?

—দূর। সুশীলা লজ্জায় চোখ সরায়।

—কাঁপছো কেন এমন করে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে সুশীলা।

—কি হাসছো যে?

—তুমি......। কথা শেষ করতে পারে না সুশীলা, আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে। —তুমি, তুমি সত্যি বড় বোকা।

—তা হবে।

সুশীলা কপট গাম্ভীর্যে বললে, সত্যি জ্বর হয়েছে নাকি আমার? দেখো তো কপালটা গরম কি না?

নিজেই সে অজয়ের মাথাটা টেনে এনে তার গালে কপালে স্পর্শ করায়। সুতৃপ্তিতে তার চোখের পাতা নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো। ধীরে। দুজনে আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

—এইখানে, এই চমৎকার—সত্যি এখানে এলে মনে হয় যেন পৃথিবী সত্যিই নীরস আর একঘেয়ে নয়। বড় খাপছাড়া কথা বলে অজয়।

—মনে হয়, এখানেই থেকে যাই।

—মনে করো, এই পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বাঁধলাম একটা ঘর, ছোট্ট একটা ছিটেবেড়ার পর্ণকুটীর বলতে পারো। তার মধ্যে দুটি প্রাণীর সাম্রাজ্য, তোমার আর আমার।

খিল খিল করে হেসে ওঠে সুশীলা।

—অমন অনেক কল্পনা তোমার আগে আরেকজন করেছিলো, কিন্তু কল্পনার কাব্য কোনদিন সত্যিকার রূপ পায়নি।

অজয় মৃদু হেসে বলে, আমারও আগে আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তোমাকে জয় করে গেছে, ভাবতে ভালো লাগে না।

—ভয় নেই, ঈর্ষায় জ্বলতে হবে না তোমার। একথা তো বলিনি যে, পূর্বের সেই মানুষটি তার কথাগুলো আমারই কানে ঢেলেছিলো।

—তবে? কে সেই মানুষটি, কাকেই বা উদ্দেশ্য করে বলেছিল সে?

—রক্তমাংসের পুরুষ নয় সে, বাতাসে গড়া আকাশের মত সে অবাস্তব। তার নাম হ'ল অমিট রায়।

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে অজয়।

সুশীলা বলে, তুমি হাসছো। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে, অমিটের মতই না শেষ অবধি আমাদের সম্বন্ধ মিইয়ে যায়।

—না, অতখানি রোমাণ্টিক নির্বুদ্ধিতা আমার নেই। রঙিন কথা বলি যখন, তখনো বুঝতে পারি, রঙ ফলানো হয়েছে কথাগুলোর ওপর। মরীচিকাকে মরুদ্যান ভাবি, তার কারণ জানি মরীচিকা মরুদ্যান নয়, কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে যে। রাত্রে আমার একক শয্যায় পড়ে যখন ছটফট করি, তখন বুঝি যে তুমি পাশে নেই, কিন্তু তবু কল্পনা করতে চেষ্টা করি, যেন তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি, পাচ্ছি তোমার হাতের স্পর্শ। জেনে-শুনেও আমরা ভুল করি, কারণ ভুল করেও একটা অদ্ভুত আনন্দ পাই।

এ যে অজয়ের চেয়েও সুশীলারই বেশী মনের সত্য।

সুশীলা বললে, সত্যি, রাতে ঘুম আসে না আমার।

রুগ্না স্ত্রীর মত দুর্বলতায় লুটিয়ে পড়লো সে অজয়ের কোলের ওপর।

সুশীলার নরম দেহটা তুলে ধরে অজয় বললে, আমারও।

তারপর চুপচাপ পাশাপাশি বসে রইলো ওরা। ভুলে গেল যে, এই স্বপ্ন সৌধে বসে বসে বাতাসে কাসেল রচনা করলে ওদের চলবে না। ফিরতে হবে বাস্তবের ব্যাঘাত যেখানে বাণিজ্য ব্যস্ততায় মানুষকে করে তুলেছে যন্ত্র। যন্ত্রের যন্ত্রণা যেখানে মানুষের বুকে দেয় অসহ্য অধীরতা।

নীরবতা নেমে এলো ওদের মাঝখানে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। নীলচে বাতাসে কালো রঙ ধরলো। এলো অন্ধকার। দূরের তাল আর শিরীষ আর অর্জুন গাছের মাথায় জমলো মেঘ, মজলো ময়লা বাতাস। দু-একটা করে তারার দীপ্তি দেখা দিলো আকাশের কোণে।

অজয় আর সুশীলা তবু বসে রইলো নিশ্চুপ।

কি একটা অজানা পাখি যেন ট্রা-ট্রা করে ডাক দিচ্ছে। পাখা ঝটপট করছে কাছের গাছের শাখায়, হয়তো কোনো মিথুনাবলম্বী প্রণয়ী বিহঙ্গ।

অজয় আর সুশীলা বসে থাকে নিশ্চুপ। পাশাপাশি, দেহে দেহের উষ্ণতা সঞ্চার করে।

দূরে কোথায় যেন বাঁশি বাজছে। সাঁওতালী বাঁশের বাঁশির সুর কঁকিয়ে কঁকিয়ে বেজে উঠছে, ভেসে আসছে মিঠে সুরের নিভাষ গান। বাঁশি বাজছে দূরে কোথায়।

আদরে গলে পড়ে সুশীলা হঠাৎ বললে, আমি যাবো না। ফিরতে ইচ্ছে করছে না আমার।

পরিচিতেষু,

সুকোমল, আজ সাত বছর পরে তোমাকে লিখছি এই চিঠি। কে জানে, চিঠির পায়ে যে নামটা লেখা আছে, সে নামের মানুষটাকে তুমি আজো মনে রেখেছো কি না। আজ খ্যাতি তোমাকে জনারণ্যের মধ্যে টেনে নিয়েছে,

আর যেটুকু বিশ্রাম তোমার আছে, জানি বিশ্রামের পরিধি তোমার অল্প, তবু যেটুকুও বা আছে, তাও আজ দখল করে বসেছেন তোমার স্ত্রী।

একটু সময় কি তোমার হবে না? সময় হবে না আমার এই অনেক চিন্তা, অনেক ভয় আর অনেক আশঙ্কায় লেখা চিঠিখানি পড়বার? সুকোমল, দোহাই তোমার, আজ আর রাগ ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিও না এ চিঠি, তোমার বাজে কাগজের ঝুড়িতে। প্রতিশোধ যদি নিতে চাও, তার তো অন্য উপায় আছে; শাস্তি যদি দিতে চাও, মাথা পেতে নেব।

আচ্ছা, ভেবে দেখো সেদিন কি আমি খুব ভুল করেছিলাম? গরিবের মেয়ে আমি, তাই জানতাম মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়ানো যায়, কিন্তু চাঁদকে ছোঁয়া যায় না; কোনদিন দেখাইনি যে, তোমাকে মনে প্রাণে ভালবাসি। যতবার তুমি এসেছো আমার কাছে, ভিক্ষুকের ভর্ৎসনাই জুটেছে তোমার কপালে। সে কি আমার প্রাণের অবজ্ঞা? তা নয়, আমি তোমাকে নীচে নামাতে চাইনি। বার বার উপেক্ষা করে গেছি, অজস্র অনুরাগ মেশানো তোমার কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কেন? তুমি হয়তো আজো মনে ভাবো, তোমার জন্য এতটুকু দরদ ছিল না আমার, এতটুকু প্রেম আর ভালবাসা ছিলো না! তখন তুমি বলেছিলে, আমার কাছ থেকে সামান্যতম ভালবাসা, প্রেমের একটা ক্ষুদ্র কণিকাও যদি পাও, তাহলে নাকি তুমি পাবে নতুন উদ্দীপনা, শক্তির জোয়ার আসবে তোমার দেহে। কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি, আমি জানতাম তোমাকে বড় হতেই হবে, আর সেই বড় হওয়ার পথ বাধার বাধায় বন্ধুর হয়ে উঠবে যদি আমার জীবনকে জড়িয়ে দিই তোমার জীবনের সংগে।

একটা কথা হয়তো জানো না, আমি যখন তোমাকে খুব ঘনিষ্ঠ করে কাছে পেতে চেয়েছি, তখন ভবিষ্যৎ আর যুক্তির দেয়াল এসে আমাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। আমি জানতাম, তোমাকে বিলেত যেতেই হবে তোমার বিদ্যা আর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ করতে। তাই এও জানতাম যে, একটি ধনী শ্বশুর তোমার চাই, চাই রাজকন্যে আর অর্ধেক রাজত্ব। তাই মাটির পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে চাঁদের নাগাল পাবার চেষ্টা করিনি।

অনেক বাজে কথা তো লিখে যাচ্ছি, এদিকে ভয় হচ্ছে, আমার নামটাও তুমি হয়তো ভুলে বসে আছো। চিঠির এতখানি এগিয়ে এসেও হয়তো কপাল কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করছো ঈষিতা মেয়েটা কে? আচ্ছা, সত্যি কি তুমি ভুলে গেছ আমাকে? যাকে সাত বছর আগে পরম আপনার জন বলে ভাবতে, তাকে কি তুমি সত্যিই ফেলে এসেছো বিস্মৃতির অতলে! কে জানে, কিন্তু আমি তো ভুলিনি একটা দিনের ক্ষুদ্রতম ঘটনাও। মেয়েদের মন হয়তো এমনি করেই পুষে রাখে অতীতের স্মৃতি, জন্ম জন্ম ধরে। কিন্তু পুরুষ মানুষের কি মনে থাকে অত কথা। তার যে কত কাজ, কত ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যে তাকে পথ করে নিয়ে চলতে হয়। সাধারণ পুরুষ মানুষের বেলায় যা সত্য, তোমার মত পুরুষের কাছে যে তা আরো সত্য।

দেখো তো, তবু আশা ছাড়তে পারছিনে। হয়তো বোকা মেয়ে বলে মনে করবে তুমি আমাকে, হয়তো ভাববে কে এই 'ঈষিতা' যে তার উদ্ধত

গর্ব নিয়ে বসে আছে আজো, ভাবছে আজো বুঝি তাকে আমি মনে করে রেখেছি। দেখো তো, তবু আশা ছাড়তে পারছিনে। কেবলই মনে হচ্ছে, তুমি আজো আমাকে ভুলতে পারোনি, মনে হচ্ছে আজো যদি তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ি, তাহলে হয়তো ক্ষমা পাবো তোমার কাছে থেকে।

দোহাই তোমার সুকোমল, তোমার মনের কোণে যদি এতটুকুও আমার জন্যে নির্বিবাদে পড়ে থাকে, ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করো না, ভুলে যাবার ভান করো না। আর যদি সত্যিই অপমান করতে চাও, নিরুত্তর অপমান আমাকে দিও না। আমার সামনে এসে, আমার সব কথা শুনে, তারপর যে শাস্তি তুমি আমাকে দিতে চাইবে, তাই মাথা পেতে নেব আমি। জানো তো ভালবাসার পাত্র যতই না রূঢ় আঘাত করুক, যতই না ব্যথা দিক, বেদনা দিক, যতই না অপমান অসম্মান কলংক ছড়িয়ে দিক, তবু যে মেয়ে ভালবেসেছে সে প্রেমিকের ওপর রাগ করে না। তার অনুরাগ সমানই থাকে। হয়তো শুধু অভিমানের অশ্রু নামে তার চোখে। আজ যদি কাছে থেকে তুমি দেখতে, দেখতে পেতে আমার কান্নার বাঁধ মানছে না, চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে এই চিঠি। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো না চিঠির পাতা, মাঝে মাঝে কি চোখের জলে চুপসে যায়নি লেখার কালি?

আজ তুমি আরেকজনের আন্তরিক আদর আর ভালবাসা হয়তো পেয়েছো, প্রয়োজন তোমার ফুরিয়েছে, কিন্তু আমিও কি আজ আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারি না সুখের ভবিষ্যৎ, আমিও কি দিতে পারি না আদর আর ভালবাসা, যা তোমার ক্ষতি করবে না এতটুকু, শুধু লাভের অংশই বাড়িয়ে তুলবে।

নির্লজ্জ ভাবছো হয়তো তুমি আমাকে, ভাবছো এ কোন্ দিশী মেয়ে, যে সাত বছর পরে আবার বিবাহিত প্রেমিকের কাছে প্রেম নিবেদন করতে আসে। ওগো, এই সাত বছরে বুঝেছি তুমি না হলে আমার চলবে না, আমার জীবনের বিষাদ ঘুচবে না তোমার কথা তোমার কণ্ঠস্বর না শুনলে।

ভয় নেই, তোমার কাছে যা পেতে পারতাম, তা আর চাইবো না, চাইবো না অনেক কিছু, শুধু বন্ধুত্বটুকু, দূরের বন্ধুত্ব নয়, নিকট বন্ধুত্বটুকু দাও, আর কিছু চাইবো না আমি। মাঝে মাঝে শুধু তোমার দেখা পাওয়াতেই আমার পরম তৃপ্তি।

তোমার চিঠির আশায় রইলুম। লজ্জায় আজ চিঠির পূর্বরাগ পাঠাতে হচ্ছে, ইচ্ছে ছিলো আজই ছুটে যাই তোমার দোরে। তাহলে কি আর ফেরাতে পারবে তুমি?

ওগো, সত্যি করে চিঠির উত্তর দিও, দেরি করো না আর, আর কষ্ট দিও না। ভালবাসা জেনো।

ইতি—ঈপ্সিতা

পুঃ—দিন পনেরোর মধ্যেই কোলকাতা রওনা হবো, তার আগেই যেন চিঠির উত্তর পাই।

নিজের মনেই হেসে ফেললে সুকোমল। বোকা মেয়ে। চিঠিখানা ছিঁড়ে

টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলে জানালা গলিয়ে. তারপর মৃদু পদক্ষেপে অন্দর মহলে ঢুকলো।

সুষমা বললে. তুমি কি বলো তো. এমনি করে শরীর নষ্ট করবে। দু-চারটে কেস না হয় কমই নিলে. কিংবা ফি'টা বাড়িয়ে দাও না. হাঙ্গামা অনেক কমে. তোমার টাকার আকাঙ্ক্ষাটাও চরিতার্থ হয়।

সুকোমল বুঝতে না পেরে বললে. কেন কি হ'ল।

—কি হ'ল? ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখো তো. এরপর কখনই বা স্নান করবে আর কখনই বা খাবে।

সুকোমল আত্মস্খালনের জন্যে করুণ রসের সঞ্চার করে সুষমার মনে। --জানো সুষমা; যে ডেলিভারী কেসটায় গিয়েছিলাম না. তার যন্ত্রণা দেখে সত্যি আমার মত ছুরি-কাঁচি চালানো ডাক্তারের চোখেও জল এলো।

সুষমা বললে. সত্যি? আহা!

—মাত্র ষোল বছরের মেয়ে. এর চেয়ে -

সুষমার চোখ ছলছল করে ওঠে। একটা ব্যথাও জাগে. আজ এতদিন বিয়ে হয়েছে তার. এখনো কোন সন্তানের মুখ দেখলো না। মাতৃত্বের গর্ব বোধ হয় তার কপালে জুটবে না।

তার ব্যথা-বেদনার ইতিহাস জানতে পারলে স্বামীও কম দুঃখ পাবে না!

তাই আবার মুখে হাসি ফিরিয়ে আনলে সুষমা।

মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বললে. অন্য মেয়েদের জন্যে তোমার এত দরদ. তার একটুকুও যদি আমার জন্যে থাকতো।

—কেন. তোমার ওপর নৃশংসতাই বা কি করলাম. মনে তো পড়ছে না।

—না, ক'দিন ধরে বলছি. একটা ভালো ডাক্তার দেখাও. আমার কলিকের যন্ত্রণাটা যেন কিছুই নয়।

—আমার ডাক্তারির ওপর অবিশ্বাস কেন. বাইরের লোকের কাছে তো আমিই বড় ডাক্তার। একেই ইংরেজীতে বলে ভ্যালেটের কাছে হিরো হওয়া যায় না।

—অবিশ্বাস হবে না কেন. তোমার এলাকার মধ্যে তো নয় এ-রোগ। এ পেটের ব্যথা, প্রসূতির ব্যথা নয়। তাহলে তো বাঁচতাম।

না. যে কথাটা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলো সুষমা, সেটা প্রকাশ না ক'রেও যেন শান্তি পায় না।

—বেশ আজ আনবো সুধীরকে, এসব দিকে ওরই একটু হাতযশ আছে।

—বেশ. সে পরের কথা পরে. এখন যাও তো চট্ করে স্নানটা সেরে এসো।

সুকোমল কাঁধে তোয়ালে ফেলে চুলে তেল ঘষতে ঘষতে কলঘরে ঢুকলো। একটু পরেই গা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো।

সুষমা বললে, হয়ে গেল তোমার কাকস্নান?

সুশীলা কোথায় ছিল. সামনে এগিয়ে এসে গালে হাত দিয়ে নাটুকে ভঙ্গীতে বললে, ও মা. কাকের ঐ রকম মোমের পুতুলের মত রঙ নাকি?

সুষমা বলে ওঠে, তুই চুপ কর সুশী।

সুশীলা বললে. বেশ। অপ্রিয় সত্য তো তোমার সহ্য হয় না।

সুকোমল বললে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অপ্রিয় সত্য বলিও না। ভগবান টগবানগুলোর কথা একটু মেনে চলাই ভালো।

ইতিমধ্যে চুল আঁচড়ানো হয়ে গেছে সুকোমলের।

আসন পেতে জলের গ্লাস এনে দিলো সুশীলা। সুষমা এলো ভাতের থালা হাতে। সামনে পাখা হাতে বসলে আহারের তত্ত্বাবধান করতে।

সুশীলা চলে যাচ্ছিল, সুকোমল তার হাতটা ধরে টেনে কাছে বসিয়ে বললে, বলেছি না মেয়েরা সামনে না বসলে আমার খাওয়া হয় না।

সুশীলা হেসে বললে, একজন তো রয়েছেন।

সুকোমল বললে, উনি তো' অন্য মানুষ নন, অর্ধাঙ্গিনী, অতএব আমারই অর্ধেক।

সুষমা চটে উঠলো, তোমার কি লজ্জা শরম বলে কিছু নেই, ঐ বাচ্চা মেয়েটার কাছে যা নয় তাই বলবে।

সুশীলা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, ওঃ ভারি তো দিদি, তিন বছরের বড়ো। সত্যি জামাইবাবু, মেয়েরা বিয়ে হলেই যেন মনে করে কত বড় হয়ে গেছে!

—তোমার তো বড় হবার দিনটা খুব বেশী দূরে নয়।

সুশীলা লজ্জায় মুখ নামায়।

সুষমা বলে, বাঃ রে, শোননি বুঝি? অজয় যে কি একটা স্কলারশিপ পেয়েছে বিলেত যাবার। দু বছর থাকবে অক্সফোর্ডে, ফিলজফি না কি পড়বে যেন।

সুকোমল—তাই নাকি? তাহলে তো সুশীর আর ঈর্ষা হবে না বলো, ডাক্তার না হোক ডক্টর স্বামী তো হবে।

সুশীলা—ওঃ ডাক্তারটা যেন কত বড় জিনিস, যত নোংরা ঘেঁটে বেড়ায়। আর দিন নেই রাত নেই কেবল ছোটাছুটি। প্রফেসরদের ন'মাস ছুটি, তা জানো?

সুকোমল আর সুষমা দুজনেই হাসলে।

অজয়ের বিলেত থেকে লেখা প্রথম চিঠিখানা পড়া শেষ করে সুষমাকে দেবার জন্য ভেতরে যাচ্ছিল সুকোমল। হঠাৎ বেয়ারা বললে, সাহাব, এক বাবু আপনার মোলাকাৎ মাংছে। বহুৎ জরুরী।

ঘড়িটার দিকে তাকালে সুকোমল। রাত এগারোটা। তবু যেতে তাকে হবেই। বেয়ারাকে বললে, নার্সকে রেডি হতে বল। যন্ত্রপাতি আর ওষুধের সরঞ্জামগুলো নিজেই গোছালে। ফরসেপটার এক জায়গায় মরচে ধরছে মনে হচ্ছে।

—নতুনটা বের করুন মিস্ ডাট্।

ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, এবার বললেন, নার্সের দরকার নেই, শুধু আপনাকে যেতে বলেছে। গাড়ি এনেছি।

সুকোমল—প্যেন ওঠেনি এখনো?

—না।

--তবে আজ থাক না, কাল সকালে যাবো।

—না দয়া করে চলুন, আপনি না গেলে তার কান্না থামবে না।

—বেশ চলুন।

নবাগতের পিছনে পিছনে গাড়িতে এসে বসলে সুকোমল।

গাড়িটা রাতের কোলকাতায় নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো একটা ছোট্ট গলির মধ্যে। রাত্রে সুকোমল ঠাওর করতে পারলে না জায়গাটা কোথায়।

চারদিকে নিঝুম, শুধু গ্যাসপোস্টগুলো দাঁড়িয়ে আছে মাথায় মণি জ্বালিয়ে। পীচঢালা রাস্তাটা চকচক করছে। দূরে কোথায় যেন দুটো প্যাঁচা ডেকে উঠলো। খুব আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিলেন ভদ্রলোক। কপাট খুললো। একটা বাচ্চা চাকর সেলাম করে পাশে দাঁড়ালো।

সুকোমল ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে ওপরে উঠলো। ওপরের ঘরের দরজাটা খুলে ধরে তিনি বললেন, ভেতরে যান।

চৌকাঠ পেরিয়ে খানিকটা গেছে, হঠাৎ দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সুকোমল বুঝতে পারলে বাইরে থেকে ভদ্রলোক কপাটে চাবি লাগিয়ে দিলেন। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

—এসো সুকোমল, সময়মত দরজা আপনিই খুলে যাবে।

চমকে ফিরে তাকালো সুকোমল। চারিদিকে তাকিয়ে প্রথমটা ঠিক করতে পারলো না নারীকণ্ঠের অভ্যর্থনাটা কোত্থেকে আসছে। তারপরই ওর চোখে পড়লো কুশনের হেলানির ওপর একগোছা মেয়েলি চুল।

বিস্ময় তখনো কাটেনি সুকোমলের। স্বপ্ন দেখছে, না, সত্যিকারের কোন ডিটেকটিভ গল্পের নায়ক হতে চলেছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলো ওর মনে। তবু ভয় আর আশংকা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই দেখা যায় মানুষের সাহস বাড়ে। সুকোমলের তাই হ'ল। অস্তগামী সূর্যের লালিমা বেশী, ভোর রাত্রে চাঁদের ঔজ্জ্বল্য সন্ধ্যাকালের চাঁদের চাকচিক্য ম্লান করে দেয়। বন্যার বেগে মানুষ যখন অসম্ভব রকমের নিষ্কর্মণ্য হয়ে যায় তখন—প্রবাদ যাই বলুক - খড়কুটো ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে না। সে তখন নিজেই বিস্মিত হয়ে বুঝতে পারে যে, সাঁতার না জেনেও সে সাঁতার কেটে চলেছে। ভয় আর আশংকা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই দেখা যায় দুর্জয় সাহস জুটছে বুকে। সুকোমলেরও তাই হ'ল।

ধীরে ধীরে সে শ্রুত স্বর আর চঞ্চল চুলের রাশ লক্ষ্য করে এগিয়ে এলো।

কুশনখানা তার দিকে পিছন ফেরানো ছিলো। একটু ঘুরে গিয়ে মেয়েটির সামনে দাঁড়ালো সুকোমল। চোখে তার উদ্ধত ক্রোধ।

হাতের পত্রিকাখানি ছোট্ট তেপায়াটার ওপর রেখে মৃদু হেসে মেয়েটি মুখ তুললো।—বসো, দাঁড়িয়ে কেন?

অজগরের চোখের সামনে নাকি হরিণী বশ খায়, আর মোহগ্রস্ত মৃগীর পালাবার পথ থাকে না। শোনা কথা, রূপক হয়তো। কিন্তু সুকোমল যেভাবে মেয়েটির কথায় ধীরে ধীরে গিয়ে কেদারাটার উপর বসে পড়লো তার তুলনা ঐ অজগর আর হরিণী।

অদ্ভুত আর অচেনা এই মেয়েটির দিকে স্থির চোখে তাকালে সুকোমল। সুন্দর? হ্যাঁ সুন্দরী নিশ্চয়। নিকষ কালো একখানা শাড়িতে সারা শরীর

তার ঢাকা। মেয়েটি যখন নড়েচড়ে বসলে, সাদায় কালোয় কল্কা-তোলা পাড়টা কেঁপে উঠলো, আর সুকোমলের মনে হ'ল যেন এক ঝড়ো রাতের বিদ্যুতের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

হ্যাঁ, অদ্ভুত সুন্দরী নিঃসন্দেহে।

মেয়েটি তাকালো শান্ত আর গম্ভীর হাসি মাখানো দুটি চোখ মেলে। বললে, চিনতে পারো?

ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির কানে হীরের দুলজোড়া নেচে উঠলো। বিজলী বাতির আলো লেগে হীরে জোড়া ঝকমক করে উঠলো। ধনীর দুলালী কেউ! সুকোমল তাকিয়ে দেখলে। কব্জি থেকে কনুই ঠেসে এসেছে চুড়ি আর কঙ্কণের শ্রেণী। গলায় সোনার রুদ্রাক্ষমাল। হাতের দুটো আঙুলে বড় বড় মুক্তো বসানো আংটি। তারই একটা সে বার বার খুলছিল আর পরছিল।

মেয়েটি বিচিত্র হাসি হেসে প্রশ্ন করলো, কি চিনতে পারো।

হ্যাঁ, চেনা চেনাই মনে হচ্ছিলো সুকোমলের। খুব বেশী চেনা, যেন এককালে অনেক অন্তরঙ্গ ছিলো এ মুখ।

মেয়েটি বললে, কথা বলছো না যে! নিজের থেকে আসবে না বলেই না ধরে আনতে হ'ল তোমাকে, মিথ্যার অভিনয় করে।

এতক্ষণে চিনতে পেরেছে সুকোমল। কিন্তু বিস্মিত হ'ল সে। মেয়েটির সিঁথিতে চওড়া সিন্দুর। একথা তো কোনদিন তার মনে হয়নি। ওর তো কোনদিন মনে হয়নি, ওর এই অনেক চেনা মেয়েটি বিবাহিতা। তারও স্বামী আছে, সংসার আছে, সমাজ আছে।

মেয়েদের এই একটিমাত্র চিহ্ন কত কথাই ভাবিয়ে তোলে।

তা হোক, সুকোমলের মনে হ'ল, এমন নির্লজ্জ মেয়ে কখনো দেখেনি। তবু, বিস্ময়ের ঘোর কাটছিলো না তার। যা ঘটছে আর যা ঘটেছে, তার কয়েকটা পরিচ্ছেদ যেন অবান্তরই নয়, অবোধ্য মনে হ'ল তার।

একটু রূঢ় হবার চেষ্টা করলে সুকোমল, কেন ডেকে এনেছো আমায়?

—বললুম তো, নিজের থেকে আসতে না, তাই।

—কিন্তু নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই।

—নষ্ট করার মত জীবনও আমার নেই।

—কি চাও তুমি?

—তোমাকে। খিল খিল করে মেয়েটি হেসে উঠলো। ধীরে ধীরে উঠে এসে সুকোমলের কেদারাটার হাতলের ওপর বসলে। চোখে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে তাকালো সুকোমলের দিকে, একটা হাত সুকোমলের কাঁধে রাখলে হাল্কা করে।

সুকোমলের সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এলো। ওর ইচ্ছে হ'ল না, কিংবা সাহস হ'ল না পিঠ থেকে হাতটা সরিয়ে দিতে।

—তাকাও আমার দিকে, আমি কি আগের মত সুন্দর নেই?

সুকোমল জবাব দিলে না।

হঠাৎ সুকোমলকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমোতে সুকোমলের

মুখটা ঢেকে দিলো সে। বুকের কাছে সুকোমলকে টেনে নিয়ে তার চুলে, কপালে, চোখে আর ঠোঁটে অজস্র চুম্বনে বিব্রত করে তুললে।

মেয়েটির ক্ষুধার্ত গ্রাস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সুকোমল উঠে দাঁড়ালো। তারপর অনুশীলনী অনুবীণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে মেয়েটির দিকে।

ক্রমে। অনেকটা সময় কাটার পর ক্রমে যেন চেতনা ফিরলো সুকোমলের। একটা মস্ত বড় সত্য তার চোখে ধরা দিলো। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার পাঁচ বছরের ডাক্তারি অভিজ্ঞতায় ধরা পড়লো একটা অত্যন্ত রূঢ় সত্য। সুকোমল দেখলে তার ফাঁপালো চেহারায় যেন শ্রান্তির আতিশয্য নেমেছে। উগ্রতাটা জোর করে আনা, আসলে তার চেহারায় এসেছে পরিপূর্ণতা। কাজলের প্রলেপ নয়, চোখের কক্ষে ক্লান্তির ছাপ। মাতৃত্বের সূচনা দেখতে পেল সুকোমল।

বললে, ভুল করেছো তুমি, সম্বন্ধ বজায় রাখার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। ইচ্ছে নেই নয়, ঘৃণায় আমি নিজেকে অশুচি মনে করছি।

কপাটের দিকে পা বাড়ালো সে।

—আমার আদেশ ভিন্ন বেরোনো সম্ভব নয় তোমার।

—আদেশ? ঘৃণার চোখে ফিরে তাকালো সুকোমল।

—হ্যাঁ। শোনো, এখানে এসো। আদেশের সুরেই সে বললে। তারপর চুপ করে রইলো।

অনেক পরে বললে, কাজের জন্যেই তোমাকে ডাকা হয়েছে। যার প্রতিদানে তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছিলাম, তা তুমি চাও না বুঝতে পেরেছি, তাহলে সত্যি কথাটা শোনো। ভালো তোমাকে আমি কোনদিনই বাসিনি। আজ সাত বছর পরে দায়ে পড়ে ভালবাসার অভিনয় করতে হয়েছে।

সুকোমল অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। - কি, কি কাজ আমার কাছে।

—কাজ? মৃদু হাসলে মেয়েটি। -- বুঝতে পারোনি এখনো কি কাজ? সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনে যে লজ্জা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে, তার থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো।

সুকোমল বিব্রত বোধ করে।—লজ্জা? কেন?

—আমার স্বামী আজ দুবছর নিরুদ্দেশ। সম্প্রতি চিঠি পেয়েছি, আর মাস খানেকের মধ্যেই নাকি তিনি ফিরবেন।

যে ঘটনার ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদগুলো অবান্তর অবোধ্য ঠেকছিলো সুকোমলের চোখে তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সুকোমল প্রতিবাদ করে উঠলো, না, না। এ অন্যায়। এ অন্যায়। পারবো না আমি। জীবন গেলেও না।

—পারতে হবে তোমাকে। ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি।

—না।

—টাকা পাবে। কত টাকা চাও তুমি? হাজার, দশ হাজার, কত টাকা চাও?

—টাকার লোভে অন্যায় আমি করতে পারবো না।

—অন্যায়? ঘৃণায় ঠোঁট কামড়ে তাকালো সে সুকোমলের দিকে। হোক

ন্যায়, হোক অন্যায়, তোমাকে ছাড়বো না আমি। কত টাকা চাও তুমি, বলো, বলো তুমি, কত টাকা চাও। যে টাকা সারা জীবনে পাবে না, যে অঙ্কের স্বপ্নও তুমি দেখনি—কত টাকা চাও তুমি।

আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সুকোমল। কিন্তু হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয় হ'ল তার। এখান থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। আর প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে সে পরিত্রাণ মিলবে না।

বললে, কত টাকা তুমি দিতে পারো?

—রানীবাঁধের বধূরানী আমি, টাকার অভাব হয় না কোনদিন যাদের। টাকা, টাকা। এত অজস্র ঐশ্বর্যের একমাত্র অধিকারী বলেই আজ স্বামী সংসার, সমাজ ভাসিয়ে চলে যেতে পারছি না। তা না হলে আজ তোমাকে ডাকতাম না।

সুকোমল বললে, বেশ আমি রাজি।

—ন্যায় অন্যায়ের বিচার কোথায় গেল তোমার এখন?

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এলো কপাটের দিকে। নির্লজ্জের মত স্থির চোখে সুকোমলের দিকে তাকিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কবে?

—এ সপ্তাহেই। লোক পাঠিও।

—আচ্ছা।

বাইরে থেকে কপাটের চাবি ঘুরলো।

খোলা আকাশের নীচে হাল্কা বাতাসের মাঝে নেমে এলো সে। গাড়ি ছুটলো আবার বাড়ির দিকে। সুকোমল দেখলে, তার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে।

ভয় আর আশঙ্কায় সারারাত ঘুম হ'ল না তার।

টাকা, টাকা, টাকা।

অজস্র টাকা, যা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারো না!

অন্যায়, আইনবিরুদ্ধ।

টাকা, টাকা, টাকা।

অজস্র টাকা, যা তুমি সারা জীবনেও রোজগার করতে পারবে না!

নীতি, ধর্ম, সমাজ, সংসার।

টাকা, টাকা, টাকা।

রানীবাঁধের বধূরানী আমি, টাকার অভাব হয় না যাদের।

ন্যায়, চরিত্র, সরল জীবন। নিষ্কলঙ্ক।

না, টাকা চায় না সুকোমল। টাকা চায় না। চায় বিশ্রাম, চায় শান্তি, চায় স্বস্তি। টাকা? প্রয়োজন মত টাকা তো সে পেয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যে থাকে, টাকা অনেক হবে তার। কিন্তু অন্যায়? না, একবার করলে সারা জীবনেও তা মুছে যাবে না।

সারা রাত ঘুম হ'ল না তার। অন্ধকার ঘরে পায়চারী করতে লাগলো। সারা শরীর তার কাঁপছে। ঘুম আসছে না, ঘুম আসবে না, ঘুম নামবে না তার চোখে।

মাসখানেক বাইরে ঘুরে এলো সুকোমল। ভয় আর আশঙ্কাটা অনেকখানি কেটে গেছে। ঈষিতার স্বামী নিশ্চয় ফিরে এসেছে ইতিমধ্যে,

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। চেম্বারে বসে চুরুট টানতে টানতে ভাবছিলো সুকোমল। চিঠির বাণ্ডিলটা টেনে নিলে। অজয়ের চিঠিখানা পড়লে। আরো খানকয়েক চিঠির ওপর চোখ বোলালে। একটা মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওল্টালে কিছুক্ষণ। আরেকখানা চিঠি! নাম নেই। শুধু এক লাইনের চিঠি। চোখ বুলিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেল সুকোমল। সত্যি?

সুইসাইড? আত্মহত্যা? না কোন অর্থপিশাচ চিকিৎসকের অপকীর্তি! কে জানে। নিজের মনেই সুকোমল বলে উঠলো, ডেড? আত্মহত্যা, না কোন স্বল্পজ্ঞানী অস্ত্রবিদের অনাচার।

মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে উঠলো সুকোমলের।

একদিন তো ঈষিতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো সে, এইটুকু উপকার করলে কিই-বা ক্ষতি হ'ত?

না। ন্যায়, নীতি, ধর্ম। সমাজ, সংসার, আইন। না।

চুরুটটা ট্রের ওপর নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ালে। চারিদিক অন্ধকার। আলো জ্বলেনি কেন এখনো?

আস্তে আস্তে অজয়ের চিঠিখানা হাতে নিয়ে শয্যাঘরে ঢুকলো সে। সুইচ টিপে আলো জ্বাললে।

—একি, অন্ধকার ঘরে বসে রয়েছো কেন?

কথা বলার পরক্ষণেই লক্ষ্য করলে কালো ছায়া পড়েছে সুষমার মুখে। গম্ভীর মুখে তার কিসের ছাপ? লজ্জা, ক্রোধ, বিস্ময়, ভীতি। থরথর করে কাঁপছে সুষমা, সুকোমল দেখতে পেল।

আর। আর নত লজ্জিত মুখে নির্বাক বসে রয়েছে সুশীলা। সুকোমলের কথা শুনেও মুখ তুললো না সে।

—ওগো। ডুকরে কেঁদে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো সুষমা।

সুশীলা ধীরে ধীরে তেমনি মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—কি, কি হয়েছে কি?

কথার জবাব দেয় না সুষমা। সশব্দ কান্না বাতাস কাঁপিয়ে ফেটে পড়ে।

—ওগো। আবার কেঁদে ডুকরে ওঠে সুষমা।

অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে উঠে বসে সে।

সুকোমল চোখ চেয়ে দেখে, অশ্রুতে ধুয়ে গেছে তার দু'গাল। কান্না বাঁধ মানছে না তার। কান্নার গলায় কথা বলার চেষ্টা করে সুষমা।—আমি, আমি মুখ দেখাবো কি ক'রে?

—কি হয়েছে বলো না।

—সুশী, সুশী, নিজের মুখ পুড়িয়েছে, আমাদেরও মুখ পোড়ালে।

—কেন, কি হয়েছে?

—এ কলঙ্ক আমি কেমন ক'রে বইবো গো। এর চেয়ে মরলো না কেন, মরলো না কেন ও। গলায় দড়ি দিলো না কেন?

সুকোমল চুপ করে থাকে।

—আমি বাঁচবো না, এত লজ্জা নিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না। মুখ-পুড়িকে তখুনি বলেছিলাম সাবধান হতে।

সুকোমলের বুকের ওপর একটা ভারি বোঝা যেন নেমে আসছে।

—যেখানে সেখানে বসে আর ঘুমিয়ে পড়ে, তখনি বুঝেছিলাম আমি।

সুকোমল এগিয়ে আসে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে হাতটা নিয়ে গেল, কিন্তু সেটা আর সুষমার পিঠে রাখতে পারলো না।

সুষমার কান্না থামে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে ও।

অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ কেটে যায়।

আস্তে আস্তে সুকোমল হাতটা সুষমার পিঠে রাখে। আদরের ভঙ্গীতে বলে, ওঠো। কাঁদে না। ওঠো।

তারপর। তারপর নিশ্চুপ কাটে কিছুক্ষণ।

হঠাৎ সুকোমল বলে, ভয় কি সুষমা, আমি তো রয়েছি।

বলেই চঞ্চল পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুকোমল। বাইরে ঠাণ্ডা আকাশ, বাইরে চমৎকার চাঁদ।

ন্যায়, নীতি, ধর্ম? আইন, সমাজ, সংসার?

ধ্যুৎ।

ততক্ষণে সে অন্ধকার অলিগলি পার হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে লাইটপোস্টের নীচে। দোকানগুলোয় ধীরে ধীরে আলো নিভছে, কপাট বন্ধ হচ্ছে। আলো-ঝলমল চৌরাস্তাটা হঠাৎ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। শুধু এপাশে ওপাশে দোতলার ছাদেজ্বলা নিয়ন আলোর রঙিন বিজ্ঞপ্তি থেকে কয়েক-উঁকি ম্লান জ্যোছনা এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে।

অন্ধকার অলিগলি থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিদিনই মেয়েটি দাঁড়ায় ঐ লাইটপোস্টের নীচে। চকিত চোখে আরেকজনকে খোঁজে। আর ঠিক্ তখনই চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে ছিমছাম চেহারার ছেলেটি। এপাশে ওপাশে চোরা চোখ ফেলে সোজা চলে আসে সে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে। চোখাচোখি হয়, ঈষৎ হাসির অভ্যর্থনা জানায় দু'জনেই। তারপর মেয়েটি দু'পা এগিয়ে আসে। ফিস্‌ফিস্ কথা শুরু হয়, পাশাপাশি হেঁটে যায় ওরা কালো ঘাসের জাজিম মাড়িয়ে। চাপা গলায় ক্রমশ চটুলতা দেখা দেয়।

অনিলেন্দু প্রথম যেদিন দেখেছিল নিরুপমাকে, তা থেকে চেহারার পরিবর্তন হয়নি ওর এতটুকু। আজও তেমনি খিলখিল করে হেসে উঠে হাতের পাতায় মুখ ঢাকে নিরুপমা। আগের মতই চোখে ভাসে ভয় আর কৌতুকের লুকোচুরি। সাদাসিধে একখানা রঙিন শাড়িতেই এখনো চমৎকার মানায় ওকে, এখনো ঘুঙুরবাঁধা রুপোরঙের কাঁটা পরে খোঁপায়। যখন এসে দাঁড়ায় ও ওদিকের ফুটপাথে, নিয়নের নীলাভ আলো নয়, যেন রহস্যের ছায়া নামে ওর ফর্সা মুখে। হাতে কয়েকসারি কালো রঙের গালার চুড়ি, একটি বোধহয় সোনার। আলোয় চিকচিক করে সে দুটো। দেখলে বেশ বোঝা যায়, এখানে আসার আগে নিরুপমা যে নিজেকে একটু আধটু সাজিয়ে না নেয় এমন নয়। চোখের কোলে এত হাল্কা করে কাজল টানে, মনে হয় যেন কাজল নয়, কালো চোখের ছায়া। কানের দু'পাশে কয়েকটা খুচরো চুলের উড়ু উড়ু ভাব। পা টেনে টেনে ক্লান্তভাবে ওরা যখন হেঁটে যায়, তখন অকারণেই নিরুপমা কখনো শাড়ির পাড়টা ঠিক করে দেয়, কখনো বা দেখে নেয় খোঁপায় গোঁজা রুপোলি কাঁটাগুলো ঢিলে হয়ে গেছে কিনা। হাসেও বোধহয় অকারণেই।

তারপর হঠাৎ একসময়ে বলে, পাড়ার লোক যদি জানতে পারে কি হবে বলো তো। বলেই হেসে ওঠে।

কি আবার হবে? একটু বিরক্তই হয় অনিলেন্দু। বলে, ভয় তো যত তোমারই।

—আহা, তোমার বন্ধুবান্ধবরা বুঝি বলবে না কিছু? না বাপু,

পাশের বাড়ির পূর্ণিমারা যদি জানতে পারে......ছি ছি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না।

অনিলেন্দু হেসে বলে, আমার বন্ধুরা যদি দেখে তো খুশিই হবে। তাদের সঙ্গে আড্ডা না দিয়ে যে সন্ধ্যেটা কাটাচ্ছি এমন একজনের সঙ্গে যার স্বামী থাকেন দূরদেশে, এ জানলে তো......

—আর বাকিটুকু যদি শোনে? মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে নিরুপমা।

অনিলেন্দু গম্ভীর হয়ে যায় একথা শুনে। চুপচাপ খানিকটা হেঁটে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে এক জায়গায়।

তারপর কথা আর হাসিতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে আসে দু'জনেই। অন্ধকার গলিটার মুখে এসে ফিস্‌ফিস্‌ দু'একটা কথা হয়, অনিলেন্দু চলে যায় ট্রাম স্টপেজের দিকে, আর নিরুপমা সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। শেষে অন্ধকার অলিগলি পার হয়ে বাড়িতে পেঁাছয়।

দূর থেকে আশপাশের ফ্ল্যাটগুলো দেখে নেয়, কেউ কোন জানালায় দাঁড়িয়ে আছে কিনা। তারপর দরজায় টোকা মারে আস্তে আস্তে।

মা এসে কপাট খুলে দেন, কোন প্রশ্ন করেন না। কপাট বন্ধ হয়।

নিরুপমাকে যত রাজ্যের প্রশ্ন শুনতে হয় পূর্ণিমাদের কাছে। সকালে আপিসে বেরুবার মুখেই কেউ না কেউ এসে বলবে, সারাজীবন কি চাকরিই করবেন নিরুদি?

তাই বলতে হয়, সময় তো কাটাতে হবে ভাই।

—বরের কথা ভাবলেও তো সময় কাটে নিরুদি। বলেই হেসে ওঠে ফাজিল মেয়েগুলো।

নিরুপমা হাসে। বলে, কোথায় পড়ে আছেন দিল্লীতে, ভাবনা পেঁাছয় না অতদূর।

ওদের আর নতুন কোন প্রশ্ন করতে না দিয়ে নিরুপমা চলে যায়। বিকেলে ফিরে আসতেই ঃ অনুর ইস্কুলের মাইনে দিয়ে যাসনি।

ক্লান্তিতে বিছানায় ঢলে প'ড়ে নিরুপমা বলে, সকালে চেয়ে নিতে ব'লো।

খানিক চুপ ক'রে থেকে মা আবার বলেন, মণ্টুদের কলেজ থেকে স্টিমার পার্টি যাবে......

—না, না ওসব হবে না। চিৎকার ক'রে ওঠে নিরুপমা। বলে, অত টাকা নেই আমার, শেষে ধার করতে হবে। তারপর নিজের মনেই বলে, ধার পাবোই বা কোথায়?

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, অনিলেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়?

ঘাড় নাড়ে নিরুপমা।

—কেমন আছে?

—ভালোই।

মা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, ওর কাছ থেকে কিছু কিছু নিলেই তো পারিস।

উত্তর দেয় না নিরুপমা। মনে মনে ভাবে যা রোজগার, নিজেরই চলে

না, আমাদের সাহায্য করবে! হাত পেতে না নিলে কি সাহায্য নেয়া হয় না নাকি? এই যে নিরুপমা চাকরি করে পুরো মাইনেটাই খরচ করছে মা আর ছোট ভাইবোনের জন্যে সে-তো অনিলেন্দুরই সাহায্য। মা কি বুঝতে পারেন না? নিজের জীবনের জন্যে কতটুকু সুখ রেখেছে নিরুপমা, কতটুকু আনন্দ! সারাদিনের খাটুনি, অসহ্য দুশ্চিন্তা, আর তারই ফাঁকে রাত আটটা তিরিশ মিনিটের অর্ধসমাপ্ত রোমাঞ্চ।

নিয়ন আলোর আবছায়া থেকে অন্ধকার পথ, তারপর জলের ধারে ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসা। জলের আয়নায় কোনদিন হয়তো ভাঙা চাঁদের ছায়া পড়ে, কোনদিন বা ওপারের আলোর সারিই আঁকে জলের সীমানা।

তারই ফাঁকে নিরুপমার দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় একসময়।

হঠাৎ বলে ওঠে, আর ভালো লাগে না।

অনিলেন্দু পায়ের কাছ থেকে একটা ঘাসের শিষ তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে দাঁতে কাটতে কাটতে বলে, সত্যি, এমনভাবে তো আর চলে না!

নিরুপমার গলার স্বর ভারি হ'য়ে আসে। বলে, কি করবো বলো, মা'র কুসংস্কার যে দূর হয় না কিছুতেই। সেই পুরোনো দিনের নিয়মকানুন কি আজকের দিনে চলে?

অনিলেন্দু পা ছড়িয়ে বসে তাকিয়েছিল ওপারের রেললাইনটার দিকে। বেশ খানিকটা শব্দ করে, হুইসল্ বাজিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল রাতের ট্রেন। অন্ধকারের গায়ে আলো-ঝলমল জানালার সারি আর জানালায় বসা যাত্রীদের ভাসাভাসা মুখগুলো কোন এক কল্পনার জগতের মানুষ যেন। শুধু চলছে আর চলছে, থামার ভয় নেই এতটুকু। এমনি চলার নেশা অনিলেন্দুরও ছিল একদিন। তারপর হঠাৎ থেমে পড়তে হ'ল। কিন্তু এমনভাবে কতদিন আর থেমে থাকা যায়!

অনিলেন্দু সেকথা ভেবেই বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমিই বা বাবা মাকে কি করে বোঝাই বলো? মাইনের টাকাটা নয় তুলে দিলাম ওদের হাতে, কিন্তু তোমাদের ওখানে গিয়ে থাকা সেও বড়ো লজ্জা করে। লোকে পাঁচ কথা বলাবলি করবে।

একথা নিরুপমা নিজেও জানে। আর জানে, অনিলেন্দু যদি ওদের বাড়িতে গিয়ে থাকে তা হ'লে সবচেয়ে বেশী লজ্জা পাবে নিরুপমাই। মুখ তুলে কথা বলতে পারবে না পূর্ণিমাদের সঙ্গে, কিংবা ওপাশের বাড়ির রানীবৌদির সঙ্গে। এমন কি সবকথা যদি স্পষ্ট করে বলে ফেলতে পারে তা হ'লেও ঠাট্টা করতে ছাড়বে না কেউ, আর সে-ঠাট্টার মুখে মাথা তুলতে পারবে না অনিলেন্দু।

কিন্তু মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না নিরুপমা। সেই পুরোনো দিনের অহমিকা নিয়েই বসে আছেন। কিছুতেই বোঝেন না যে দিনকাল বদলে গেছে। তবু, সাহসে ভর করে এসে দাঁড়ালো ও সেদিন, আরো একবার বলে দেখবে।

ছোট বোন অনুপমা কপাট খুলে দিতেই ফিসফিস স্বরে জিজ্ঞেস করলে, মা কোথায় রে অনু?

—শুয়ে আছে।

—ওঃ। মাথা ধরেছে বুঝি?

অনু কপাট বন্ধ করতে করতে বললে, না, এমনি।

বারান্দার আলো কিছুটা গিয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। সেই আবছা আলোতেই নিরুপমা দেখলে, মেঝের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আছেন মা।

পা ধুয়ে ধীরে ধীরে এসে বসলো ও মার কাছে, চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শান্ত গলায় ডাকলো, মা!

—কে, নিরু এলি?

—হ্যাঁ।

বলেই চুপ করে গেল নিরুপমা। মাও আর কোন কথা বললেন না। চুল থেকে কাঁধ আর কনুই বেয়ে এসে নিরুপমার হাত মার আঙুলগুলো ভেঁজে দিতে শুরু করলো।

মা বোধহয় বুঝতে পারলেন।—কিছু বলবি আমাকে?

—না।

এতকথা ভেবে রেখেও হঠাৎ সাহস হারালো নিরুপমা। বলি বলি করেও মুখে কথা গুছিয়ে নিতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থেকে শেষ অবধি বললে, মা, ও বলছিলো...

—দেখা হ'ল অনিলেন্দুর সঙ্গে? মা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন।—আসতে বললি একদিন?

চোখ বুজে শুয়ে না থাকলে, আর বারান্দার আলোটা আরো বেশী যদি ঘরে ঢুকতে পেত তা হ'লে হয়তো মা নিরুপমার ব্যথার হাসিটা দেখতে পেতেন।

নিরুপমা বললে, এই তো সে-বার থেকে গেল দিন কয়েক। তা ছাড়া বারবার এলে পূর্ণিমারা কি ভাববে বলো তো?

মা জবাব দিলেন না এ-কথার।

নিরুপমা আবার থেমে থেমে বললে, ও বলছিলো, খুব অসুবিধে হচ্ছে ওর, বাবা মাকে এ বয়সে দেখবার লোকও নেই কেউ......

এবারেও কোন জবাব এলো না। তাই, অভিমানে, চোখে তো দেখতে পেলেন না নিরুপমাকে, কিন্তু গলার স্বরটা তার ভিজে ভিজে শোনালো।

নিরুপমা বললে, দুটো সংসারেই তো অভাব মা। তার চেয়ে চলো না তোমরা, এক জায়গায় থাকলে তবু কিছুটা সুরাহা হবে।

মা যেন চমকে উঠলেন।—কি যে বলিস নিরু। জামাইয়ের বাড়িতে গিয়ে শাশুড়ি থাকবে? কস্মিনকালে এমন কথা শুনিনি আমি। তোর বাবা বেঁচে নেই বলে কি এমন বিষ হয়ে উঠেছি তোর চোখে?

এরপর কি আর কোন কথা চলে। চোখ ভিজে যায় নিরুপমার। অভিমানে, হতাশায়। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের সব ভার তো তুলে নিয়েছে ও নিজের কাঁধে। ইচ্ছে করলে কি সব বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে সুখী হতে পারতো না ও? তার বদলে শুধুই মিথ্যের মুখোশ এঁটে জীবন ক্ষয় করছে কেন, কার জন্যে? বাবা বেঁচে থাকতে যে সচ্ছল অবস্থা ছিল

ওদের, তা থেকে অনেকগুলো ধাপ নীচে নেমে এসেও যে ঘরের দৈন্য বাইরে প্রকাশ হ'তে দেয়নি, তার সবটুকু দামই তো নিরুপমা দিয়েছে। বিয়ের পর যখন পাড়াপড়শীদের কাছে ঘনঘন শুনতে হয়েছে নিরুপমা শ্বশুরবাড়ি যায় না কেন, তখন এত এত মিছে কথা কেন বলেছে ও? স্বামী বিদেশে থাকেন, বাড়ি পাননি, এই সব আজেবাজে কথা তো বলেছে ও মা ভাই বোন এদের জন্যেই। ইচ্ছে করলে কি দু'জনের রোজগারে সুখের সংসার গড়তে পারে না ওরা? মণ্টু পাশ করবে, বড়ো হবে, চাকরি করে নিরুপমার কাঁধ থেকে তুলে নেবে সংসারের ভার, তারপর ছুটি পাবে ও। কিন্তু তখন কি ঘর বাঁধার রোমাঞ্চ এতটুকুও অবশিষ্ট থাকবে ওর জীবনে?

অনিলেন্দুর আয়ের অঙ্কটায় লোভ নেই নিরুপমার। কিন্তু বুড়ো বাপ-মাকে ফেলে সে কখনো এসে থাকতে পারে এখানে!

একদিন ভুলে এমন কথাও বলে ফেলেছিল নিরুপমা।

আর অনিলেন্দু হেসে বলেছিল, পাড়াপড়শীরা কি ভাববে, এই লজ্জায় তো আমাকে বিদেশে পাঠিয়েছো, এমন কি মাঝেসাঝে যে যাবো তোমাদের ওখানে তারও রাস্তা রাখোনি। এরপর ঘরজামাই অপবাদ না দিতে পারলে বুঝি সুখ হচ্ছে না?

সে অপবাদ কি আর অনিলেন্দুরই, নিরুপমার লজ্জা নয়? কিন্তু পথ একটা খুঁজে বের করতেই হবে।

দুটো অভাবের সংসারকে এক করতে পারলে তবেই সচ্ছলতা আসবে কিছুটা আর নিরুপমাকেও এভাবে রাত সাড়ে আটটার গোপন রোমাঞ্চের মাঝপথেই দীর্ঘশ্বাসের দাঁড়ি টানতে হবে না।

নিরুপমার কোন কথাই তো অনিলেন্দুর কাছে লুকোনো নেই, তাই অনিলেন্দু নিজেও বোঝে। বোঝে বলেই মাঝে মাঝে অনিলেন্দু তার মাকে বলে, তুমি গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসো না। ওদেরও ব্যবস্থা হয়, তুমিও দেখাশোনার লোক পাবে।

অনিলেন্দুর মা চটে যান ছেলের কথায়। বলেন, তখনই বলেছিলুম, শুনলি না তো। ঘরের বৌ আবার কবে চাকরি করেছে?

অনিলেন্দু হেসে উঠে বলে, চাকরি না করলে ওদেরই বা চলতো কি করে বলো?

—দেশসুদ্ধ লোকের চলছে না? সবাই বুঝি চাকরি করছে? বৌমাকে তুই যত ভালো ভালো ভাবছিস তত ভালো সে নয়, বুঝলি?

অনিলেন্দু তবু হাসে।—আমি যা ভাবি তার চেয়েও ভালো সে। নিজের মা ভাইবোনদের জন্যে কোন্ মেয়ে এমন করে দেখাও তো?

—দেখেছি, খুব দেখেছি। জবাব দেন অনিলেন্দুর মা। বলেন, স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি এদের চেয়ে বড়ো হলো নিজের বাপের বাড়ি? চাকরি করুক না, তা ব'লে এখানে এসে থাকতে পারে না বৌমা? মাসে মাসে নয় গোটাকয়েক টাকা ফেলে দিয়ে আসবে তার মাকে।

অনিলেন্দু যেন চমকে ওঠে একথা শুনে। এতখানি স্বার্থপর হতে বলবে ও নিরুপমাকে? এতখানি নৃশংস? তার চেয়ে ভাববে, বিয়েই করেনি ও, রোমাঞ্চের কোন মধুলগ্নই আসেনি ওর জীবনে। হ্যাঁ, শুধু

একটু নিয়ন আলোর রহস্য, কালো ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, কথা আর হাসি, পাশাপাশি পা ছড়িয়ে অন্ধকারের জলে ভাঙা চাঁদের ছবি দেখা আর কৌতুকহাসিতে হঠাৎ ঢলে পড়ার ঈষৎ স্পর্শ। এইটুকু পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে ও। নিরুপমাকে বলবে, এই ভালো।

নিরুপমা শুনলো সব। অনিলেন্দুর কোন কথা কি ওর কাছে গোপন থাকতে পারে! তাই নিরুপমা শুনলো, শুনে যত না রাগলো অনিলেন্দুর মা'র ওপর তার চেয়ে বেশী নিজের পঙ্গু সংসারের ওপর বিতৃষ্ণায় ভরে গেল ওর মন।

সত্যিই তো। নিরুপমাকে নিজের থেকেই কি বলতে হবে নাকি? মা বোঝেন না কোন্‌টা উচিত-অনুচিত? টের পান না মেয়েব মনে কি ঝড় থমকে আছে?

বললেই তো পারেন। যেমনভাবে বলেন, অনিলেন্দু এসে থাকলেই তো পারে মাঝেসাঝে, তেমনিভাবে বলতে পারেন না, নিরু গিয়ে থাকলেই তো পারিস দিনকয়েক!

শেষ অবধি নিরুপমাকেই বলতে হ'ল।— ।......বলছিলাম......ও বলছিলো বাড়িতে অসুখ বিসুখ......দিনকয়েক গিয়ে থাকবো আমি?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মা'র দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলো নিরুপমা। মা বললেন, যা ভালো বুঝিস। তোর বাবা বেঁচে থাকলে কি......

অভিমানে কথা শেষ করতে পারেন না। আর সে অভিমানের স্বর বিদ্রূপের মতো শোনায় নিরুপমার কানে। কি আশ্চর্য, মা অবিশ্বাস করছেন, বেশ বুঝতে পারে নিরুপমা। ভয় পাচ্ছেন। নির্ঝঞ্ঝাট সুখের স্বাদ পেলে মেয়ে হয়তো সব ভার নামিয়ে দেবে মাথা থেকে। অথচ, বাবা বেঁচে থাকতে, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার জন্যে মা কতদিন ঝগড়া করেছেন। লুকিয়ে কখনো ডাকপিয়নের কাছে, কখনো অনুর কাছে জিজ্ঞেস করেছেন, নিরুপমার নামে কোন চিঠি এসেছে কিনা। আর যেদিন এসেছে তেমন চিঠি, সেদিন যেন খুশিতে দু'চোখ ভরে গেছে তাঁর, আদরে আনন্দে নিরপুপমাকে সামনে বসিয়ে চুল বেঁধে দিয়েছেন, নিজের দামী শাড়িটা বের করে পরতে বলেছেন, গলায় হার খুলে পরিয়ে দিয়েছেন নিরুপমার গলায়।

সেই মা আজ কিনা দেয়াল গাঁথতে চাইছেন নিরুপমা আর অনিলেন্দুর মাঝখানে। কিন্তু এ দেয়াল ভাঙতেই হবে। সেতু গড়তে হবে দু'টি জীবনের। তা না হলে কার মুখ চেয়ে বাঁচবে ও। কেন বাঁচবে?

অনিলেন্দুর কাছে শোনা একসারি রূঢ় কথা যেন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।—বৌমাকে তুই যত ভালো ভাবছিস, তত ভালো সে নয়, বুঝলি! কথাগুলো হাসতে হাসতেই বলেছিল অনিলেন্দু, দেখেনি নিরুপমার মুখের হাসিটা কত ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

না। স্বার্থ দিয়েই মা যখন ওকে বেঁধে রাখতে চান, তখন নিরুপমাও স্বার্থ দিয়েই নিজের পথ তৈরী করে নেবে। মা তো জানেন না যে, শক্ত দেয়ালটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে সেতুর ইশারা।

আর সে খবর মাকে জানাতে ভয় পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু অনিলেন্দুকে ভয় নেই তার। তার ছায়াতেই সব ক্লান্তি দূর হবে।

আজ বুঝি বা নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না নিরু, আজ বুঝি মাকে ক্ষমা করতে পারবে না। ক্রোধে হতাশায় কেঁপে উঠলো যেন। এতদিন তো নিয়ে যেতে চেয়েছে অনিলেন্দু। আজও কি বলবে না? তা হ'লেই তো সব ভার, সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে যেতে পারে নিরুপমা।

প্রতিদিনের মতোই নিয়ন আলোয়-ধোয়া ফুটপাথ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো ও লাইটপোস্টের নীচে। তারপর অন্ধকার পথ বেয়ে চাঁদ-চমকানো জলের ধারে পা ছড়িয়ে বসলো পাশাপাশি। অপেক্ষা করলো। তারপর, একসময় অনিলেন্দু প্রশ্ন করলো, যাবে?

এ প্রশ্ন বহুবার করেছে অনিলেন্দু আর প্রতিবারেই অসম্মতি জানিয়েছে ও। কিন্তু মায়া মমতা স্নেহ সব ধুয়ে-মুছে অনিলেন্দুর ছায়ায় নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে এসেছে আজ। বলতে এসেছে, যাবো যাবো!

অনিলেন্দু আবার প্রশ্ন করলো, যাবে?

একমুহূর্ত চুপ করে রইলো নিরুপমা। তারপর ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে অনিলেন্দুর হাতটা স্পর্শ করলো ও।

অনিলেন্দু টের পেল, থর থর করে কাঁপছে নিরুপমার হাত।

তারপর হঠাৎ একসময় কান্নায় ভেঙে পড়লো নিরুপমা, অনিলেন্দুর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, কি করে যাবো বলো? কি করে যাবো?

অনিলেন্দু ধীরে ধীরে একটা হাত রাখলো নিরুপমার পিঠে। কোন কথা বললো না।

চ ন্দ্র ভ স্ম

শীত নিশুতির কালো কালো মাটিতে নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। ঘামতেলে মাজা চকচকে সড়কটা সিধে আঁধারের বুকে মুখ লুকিয়েছে। মুখ লুকিয়ে ছুটে গেছে দূরের আলো ঝলমল শহর অবধি।

ঠাণ্ডা বাতাসের ঠোঁটের কাঁপনে বেজে উঠছে না এক ফোঁটা ভাঙা শিস্। ঘাসের ডগায় নিশীথ-কীটও নিশ্চুপ। নেই ঝিঁঝির ডাক, নেই ঝড়ের দাপট।

কিন্তু একটু আগেই এ পল্লীর এই ছোট দুনিয়াটাকে থমকে দিয়েছে পর পর কয়েকটা শব্দের ঝাঁকানি। যুগ্মমণির দীপ্তি নিভিয়ে হর্ন বাজিয়ে পাঁচিলে গা ঢেকেছে দুখানা মোটর বাস। খানিকটা চিৎকার, খানিক হাসি আর ফটক বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। হট্টগোল একটু রোজই হয় এমন সময়, তারপর ঝিমিয়ে পড়ে সবাই।

তন্দ্রাক্রান্ত পাতালপুরীর মত ঝিমিয়ে পড়ে ঐ পাঁচিল-ঘেরা বস্তিটা। প্রতিদিন।

পাঁচিলের ওপাশটা দেখবে? নিজের চোখে দেখতে চাও ওদের দৈনন্দিন জীবনের চলচ্চিত্র? ভাষা সংযত করো। ঠিক ওদেরই মত রসহীন, ঘা খাওয়া আর ঘেয়ো রুগীর ছবি ফোটাও তোমার ভাষায়। চাঁদ ওরাও দেখে—তা জানি। আকাশের কোণে শুক্লপক্ষের রাতে যে চাঁদ ভেসে ওঠে, আলোর প্রলেপ মাখানো বরফের চাকতির মত সাদা চাঁদ—ওরাও দেখে। কিন্তু বুড়ো রুখন তার পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখেছে, দেখেছে ওর পায়ের পাতার শ্বেতকুষ্ঠের চাকাগুলো আরো সাদা আর চকচকে। তাই বলচি, মর্মরশুভ্র মোমবাতির আলোয় যদি যুবতী মাংনার মুখ দেখতে চাও, আপত্তি করবো না। কিন্তু দোহাই তোমার, ওর চোখের তারা দুটো যেন তোমার চোখের নীল কাচের ভেতর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করো না।

বাস থামলো। লোহার ফটক পেরিয়ে গিয়ে। উথলে পড়লো এক ঝলকা গোলমেলে চিৎকার। যাত্রীরা নেমে গেল একে একে। এই দিন-যাত্রীর দলে নতুনের আগমন ঘটে খুব কম। পুরোনো দলের কেউ কেউ হয়তো ছিটকে অনুপস্থিত থেকে যায় কোনদিন। তেওয়ারীর কাছে দুটো কিলচড়, বিরতিবিহীন পাঁচ মিনিটের অশ্রাব্য কটূক্তি আর ধারালো ধমক জমা থাকে পরের দিনের জন্যে। তবু তারা ফিরে আসে।

গ্যারেজে বাস রেখে ড্রাইভার দুজন চলে যায় ছেঁড়া কোটের কলারে কান ঢেকে। বিড়ি টানতে টানতে। সশব্দে ফটক বন্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে আসে তেওয়ারী। আর খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে গজল্লা করে ওরা। অনেক অনেক মেয়ে-মরদ, কচি ছেলে আর কাণা বুড়োর দল জটলা পাকিয়ে গুলতান করে। মেয়েগুলোর হাসি থামে না। বুড়োদের মুখে অশ্লীল মন্তব্য শুনে অশ্লীলতর জবাবের দেমাক দেখিয়ে হেসে ওঠে তারা। তা বলে কলহাস্যের তুফান ওঠে না। ওদের গায়ে যে ছেঁড়া চট আর নোংরা

কানি। কালো রঙ মাখানো শণের নকল চুলের মত জট পাকিয়ে আছে মাথার ঝুঁটি। কাকলি নয়, ওদের কণ্ঠস্বরে সুরের কলঙ্ক। তবু। ওরা হাসাহাসি করে। হাসি-রঙ্গ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। হাসে না কেবল বাচ্চাগুলো। চোখ জড়িয়ে-আসা ঘুম হটিয়ে ক্ষিদেয় ট্যাঁ-ট্যাঁ করে। পুরুষগুলো রেগে টেঁচিয়ে ওঠে, ধমক দেয়। হ্যাঁ পুরুষই, জোয়ান না হোক, মরদ ওরা একশোবার। জোয়ারের বীজ আর জ'লো ডাল খেয়ে তো আর জোয়ান হওয়া যায় না!

তেওয়ারীর হাঁক শুনে সারি বেঁধে দাঁড়ায় ওরা। এটুকু নিয়মানুবর্তিতা মজ্জায় ঢুকেছে ওদের।

একটু পরেই বাঙালীবাবু জহর এসে হাজির হয়।

—ভিখুরাম।

—হাজির, দশ আনা।

নোট বই দেখে নাম ডাকতে শুরু করে জহর।

—তাহির আলি।

—হাজির, এক রুপিয়া ছ' পয়সা।

—পণ্ডা।

—হাজির, সাড়ে বারো আনা।

পর পর নাম ডেকে যায় জহর। ওরা একে একে সামনে এসে হাজরি দেয়। মুদ্রার অংকটা জানিয়ে তেওয়ারীর হাতে তুলে দেয় গুণে গুণে। জহর প্রত্যেকের নামের পাশে চিহ্ন দিয়ে টাকা-পয়সার পরিমাণটা লিখে রাখে। ক্ষুদ্রাকার ভিস্তির মত একটা চামড়ার থলেতে পয়সাগুলো জমা করে তেওয়ারী।

এবার মেয়েদের নাম ডাকা হয়।

—সন্কা।

—হাজির গো।

—কত? একটু রুখেই জিজ্ঞেস করে জহর। হোক মেয়েমানুষ, ঠিকুজী মিলিয়ে বয়সের দৌলতে হ'লই বা যুবতী, তা বলে ভদ্রবংশজাত শিক্ষিত জহর ওদের কথার সরস উন্মাদনাটুকু সহ্য করবে কোন্ রুচিতে। জহর তাই চটে ওঠে। ওদের হাল্কা রসিকতা আর কথা বাড়াবার প্রয়াসের মধ্যে জহর দেখতে পায় একটা অতি কুৎসিত অসম্মানের লোলুপতা।

তাই কঠোর স্বরে প্রশ্ন করে, কত ?

—গুণে তো দেখি নাই গো, দাঁড়াও দেখি। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে সন্কা, তারপর আস্তে আস্তে গুণতে থাকে হাতের পয়সাগুলো।

বলে, ছ' আনা দেড় পয়সা।

—তিরিক্ষি মেজাজে চেঁচিয়ে ওঠে জহর, এত কম?

—কম হইছে তো করবো কি।

নাকের ভেতর দিয়ে শুধু একটা শব্দ করে জহর।

তেওয়ারী বলে, কাল ফির কোম হোবে তো খানা বন্ধ্ হোবে।

উত্তর দেয় না সন্‌কা, ঠোঁট টিপে ভেংচি কেটে সরে পড়ে।

রুখন দিয়েছে মোটে তিন আনা, তবু অবিশ্বাস করেনি জহর। দু-এক পয়সা হয়তো চুরি করে। অমন সবাই করে। সে আর তেওয়ারীও তো রোজই কিছু না কিছু মারে ভাগাভাগি করে। যা জমা হয়, তার সবটাই তো আর তুলে দেয় না মুলচাঁদ মাড়োয়ারীর হাতে। কিন্তু মেয়েগুলোকে বিশ্বাস নেই। পুকুর চুরি করে ওরা। কমবয়েসী মাংনা মেয়েটা, দেখতে নেহাৎ খারাপ নয়। এক নোংরা, এছাড়া হাতে-পায়ে কোথাও নেই এতটুকু ঘা-ফোড়া। লোকে অন্তত দুবার ফিরে তাকাবে ওর দিকে। অথচ কোনদিন পাঁচ-ছ' আনার বেশী জমা দিলো না। সন্‌কা, রাউতী, মাংনা—ওদের কোনটাকেই বিশ্বাস করে না জহর। তবু করবার কিছু নেই। তেওয়ারীর মারফত দুটো বাক্‌বকুনি দিয়ে থেমে যেতে হয়। বেশী সন্দেহ ঘটলে তেওয়ারী নিজেই মেয়েগুলোর কোমরের ঘুনসিতে হাত বুলিয়ে দেখে নেয়। একদিন ছেঁড়া কাপড়টাই টেনে খুলে নিয়েছিল মাংনার, মেয়ে-মরদ সবার সামনে। ঝেড়ে-ঝুড়ে কাপড়ের খুঁটগুলো যখন দেখছিল তেওয়ারী, তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল জহর। অথচ মাংনা শুধু হেসে ফেলে কাপড়টা কেড়ে নিয়েছিল তেওয়ারীর হাত থেকে। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখেছিল জহর, তারপর নিজেরই ওপর ঘেন্নায় বিষিয়ে উঠেছিল তার মন। চাকরিটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল সেদিনই। কিন্তু। মুলচাঁদ মাড়োয়ারীর কাছ থেকে মাসের শেষে মাসোহারা, অদূরে নি-ভাড়া টালির ঘর, আর পর্যাপ্ত উপরির মায়া তো কম নয়।

মোম গলে গলে পীরিচ ভরে উঠছে তোমার। দীর্ঘ সুশুভ্র মোমবাতিটা খাটো হয়ে এসেছে অনেকখানি। মিছেই তিল তিল করে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে তুলছো ওকে। দাও, নিভিয়ে দাও বাতিটা। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় দেখতে পাবে দেড়শো ছায়াশরীর এগিয়ে চলেছে আবছা আঁধারে। মাটি-গোবরের ছিটে দেয়া চাঁচর আর চিকের প্রাসাদে ঢুকছে ওরা।

লম্বা উঠোনের মাটির মেঝেতে পাতা পড়ে গেছে সারি সারি। হলুদের ভ্যাপসা গন্ধ। চচ্চড়ির মত কি যেন দিয়ে যায় হাতা ভরে। মুলচাঁদ মাড়োয়ারীর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় ওরা। লোকটার মায়া-দয়া আছে, পেট ভরে খেতে দেয়। যত খুশি খেতে পারে ওরা।

পেট ভরে খাচ্ছিল রাউতী। মাংনার মানা না শুনেই খাচ্ছিল। হঠাৎ সারা গা তার কেমন কেমন করে উঠলো। বুক থেকে গলার নলী অবধি একটা বাষ্পগোলক যেন ওঠানামা করলো বারবার। পেট থেকে পেঁচিয়ে উঠলো একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ। নিজের নাকেই টের পেল রাউতী। অম্লকষায় অনুভব করলে জিভ আর মাড়ির পাশে। পাতের পাশেই বমি করে ফেললে যা-কিছু খেয়েছিল। মাংনা বসেছিল পাশেই। তার গায়েও লাগলো খানিকটা। তবু চটলো না সে। এমন তো প্রায়ই হয়।

একটু সহানুভূতির স্বরে বললে, খা রাক্ষুসি খা, পাঁচ মেসো পেট নিয়ে গিলতে তো ছাড়বি না।

রাউতী জবাব দিলে না, সে তখন নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে।
—আ ম'লো, বল্লাম ব'লে মাগীর আবার কান্না।
মাংনার কথায় ফিরে তাকিয়ে হেসে ফেললে রাউতী। আসলে বমি করতে গিয়ে এমন এক-আধ ফোঁটা জল আসেই চোখে। মাংনা তাই দেখে ভেবেছে রাউতী বুঝি-বা কাঁদছে।
—কাঁদিনি লো কাঁদিনি। হেসে জবাব দিলে রাউতী। তারপর পিঠের নোংরা কাঁথাটায় চোখ মুছে নাক ঝেড়ে নিলে সে। উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলো চৌবাচ্চার জলে। এসে সেই পাতাটাই পরিষ্কার করে বসলে।
আবার খাবি নাকি? মাংনা জিজ্ঞেস করলে।
বিস্ময়ের স্বরে রাউতী বললে, খাবোনি? যা খেইছিলাম, তাতো উল্টি হয়ে গেল।
—মাগী মরবি তুই মরবি। খানিক থেমে মাংনা আবার বললে, ছেলেটাকেও মারবি হতচ্ছাড়ি।
প্রথমে কথাটায় হেসে উঠেছিল রাউতী, তারপর হঠাৎ থমকে গেল যেন। একদৃষ্টে তাকিয়ে চেয়ে রইলে সে মাংনার দিকে।
বললে, তু এমোন কথা বললি মান্না?
মুখের গ্রাস থামিয়ে মাংনা বললে, বলেছি বেশ করেছি। তারপর কি ভেবে সান্ত্বনার স্বরে বললে, ও মরবার জাত লয় রে।
রাউতী ক্রোধে ভেংচিয়ে উঠলো, উ মরবার জাত লয় রে! তু বলবি কেনে?
মাংনা হাসতে হাসতে বললে, বেশ আর বলবো নি।
রাউতী হয়তো এত সহজে ছাড়তো না, কিন্তু ওদিকে তখন তুমুল ঝগড়া শুরু হয়েছে তাহির আলি আর রুখনের মধ্যে। খিঁচুড়ি মাখা হাতেই হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে দুজনে। ওদের ঝগড়া থামাবার জন্যে কেউ একটা কথাও বলছে না। এমন প্রায়ই হয় কিনা।
শুধু সন্কা তাহিরের উদ্দেশ্যে বললে, থামা দাও মিঞা ছায়েব, অ লাগরের সাথে নড়তে লারবে। উ আমাদের তালপাতার ছেপাই।
কিছুক্ষণ পরে আপনা থেকেই তারা হাতাহাতি ছেড়ে বাক্‌যুদ্ধে নেমে এলো, তারপর অভুক্ত খাদ্যের দিকে মন দিয়ে ক্রমে ক্রমে চুপ করে গেল।
একে একে খাওয়া হয়ে গেল সকলের। নিজের নিজের পাতা হাতে করে এক কোণে জমা করে রেখে চৌবাচ্চার জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। খেয়েও নিল সেই জল। তারপর লম্বা লম্বা কপার্টবিহীন ঘরের মাটিতে ছেঁড়া চাটাই পেতে শুয়ে পড়ে সকলে। এই স্বল্প সময় নিদ্রাশান্তির লোভে একে একে গা এলিয়ে দেয় তারা। ছেঁড়া কাঁথা নয়তো কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। জবাই করা মুর্গীর মত নেতিয়ে থাকে দেড়শো ছায়াশরীর।
চোখে ঘুম আসে না শুধু পণ্ডার। ও জানতো ওর চোখে আজ ঘুম আসবে না।
আর একজন। ঘুমিয়েছিল, এখনই জেগে উঠেছে। তাহির আলি।
—কি মিঞা, নিদ্ আসছে নাই?

ফিরে না তাকিয়েই তাহির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, না।

—কেন ছাহেব?

—শালার ঘায়ে রস কাটতিছে ভাই, বড় চুলুক চুলুক করতিছে। ঘা বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে সুড়সুড়ি দিতে থাকে তাহির। হাঁটু থেকে কুঁচকি অবধি দগদগে ঘা। শেয়ালে খাবল মারা খরগোসের মত লাল লাল মাংস ঝুলছে ঘা থেকে। পরনের ময়লা কাপড়টা ঘায়ের ওপর বুলিয়ে রস আর রক্ত চুপসে নেবার চেষ্টা করছে তাহির।

এদিকে পণ্ডা মনে মনে চটছিল তাহিরের ওপর।

বিফল মনে এবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলে সে। খানিকক্ষণ পড়ে রইলো চুপ করে। খস খস শব্দ হ'ল কিসের। চোখ চেয়ে তাকালে পণ্ডা। দেখলে একটা মেয়েলি চেহারা এগিয়ে আসছে তাহিরের দিকে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো পণ্ডা। সে যে জেগে আছে, তা কি টের পায়নি মেয়েটা?

—কিগো, জ্বালানপোড়ান লাগতিছে?

—হুঁ।

—শোও দিনি মানিক, আমি হাত বুলিয়ে দিছি।

তাহির চটে উঠলো এবার। নিজের জ্বালায় মরছে বেচারা, সে সময় সোহাগ ভাল লাগে না।

বললে, যা যা ভাগ। মানকামি করতি হবেনি তোরে।

সন্কা কিন্তু শুনলে না সে কথা। আস্তে আস্তে তাহিরের মাথাটা টেনে নিলে নিজের কোলের ওপর। তারপর তাহিরের ঘায়ের চারপাশে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, ঘুমাও মিঞা, ঘুমাও, রাত কেটে এলো।

পণ্ডা এই ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে এলো। কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে একটা থুরথুরে বুড়ি। গাল বেয়ে লাল পড়ছে তার। ল্যাললেলে হয়ে উঠেছে মাথার পুঁটুলীর একপাশ। তাকে ডিঙিয়ে পণ্ডা সটান চলে এলো মাংনার কাছে।

পেটের ভেতর হাঁটু সেঁধিয়ে শুয়ে আছে সে। পরনের কাপড়টা খাটো, স্বল্পতার জন্যে শরীরের অনেকখানি অনাবৃত, তাই শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে মাংনা। ঘুমের মাঝে কাঁপছে।

বুকের ওপর বরফের মত একটা ঠাণ্ডা হাতের হঠাৎ-স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল তার। চমকে চোখ চেয়ে চাপা গলায় বলে উঠলো, কে?

—আমি পণ্ডা। ফিসফিস করে উত্তর দিলে সে।

—কি?

এ কথার জবাব নেই। মাংনার বুকের ওপর থেকে হাতখানা তুলে নিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

মাংনার ঘুমটা ইতিমধ্যে ভালভাবেই ছেড়ে গেছে। পণ্ডার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মিষ্টি করে বললে সে, কি বলছিস কি?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাথানেড়ে পণ্ডা শুধু বললে, না।

চুপচাপ বসে রইলো সে বহুক্ষণ। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তোর নাম মাংনা কেন হ'ল রে?

ক্ষেপে গেল মাংনা। মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে আর বলবার মত কথা পেল না মিনষে।

বললে, তোর নাম পণ্ডা কেন?

—বাপ দিয়েছিলো তাই। মুখ কাচুমাচু করে বললে পণ্ডা।

মাংনা বললে, আমারও তাই।

নিরুপায় হয়ে পণ্ডা উঠে দাঁড়ালো।

নিজের মনেই ঠোঁট টিপে হাসলে মাংনা। তারপর হঠাৎ উঠে বসে পণ্ডার হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে পাশে বসিয়ে দিলে তাকে।

বললে, মাগনায় পেয়েছিল কিনা আমায়, তাই মা নাম রেখেছিল মাংনা।

পণ্ডার সাহস বাড়লো। বললে, ইখানটা বেশ গরম তো।

কি, রুচিতে বাধছে তোমার? এখানকার এই ছোট পৃথিবীটা ঘৃণ্য মনে হচ্ছে? মনটাকে একটু সজীব করে তোল, দেখবে এদের এই ছোট দুনিয়াটা তোমার পৃথিবীর চেয়ে কম লোভনীয় নয় এদের কাছে, আরাম আর আনন্দ এরাও পায় শীতের রাতের উষ্ণতায়। এদের আকাশেও ওঠে চাঁদ, যে-চাঁদ ঢেলে দেয় ইন্দ্রনীলার জ্যোতি তোমার শিয়রে। অজস্র তারকা আকাশের দিকে তাকিয়ে এরাও রোমাঞ্চ অনুভব করে। কিন্তু তোমার মত আলস্যের গ্রন্থিতে হাত বেঁধে পড়ে থাকতে পায় না। পূর্বদিগন্তে রূপালী রশ্মির আলো চমক দেবার আগেই উঠে পড়ে ওরা।

মোটর বাসের হর্ন বাজছে।

ধরমর করে উঠে পড়ে সকলে। হাতের চেটোয় চোখ কচলায়। অন্ধকার ঘোচেনি তখনও। ওরা চীৎকার আর হল্লা করতে করতে বেরিয়ে আসে। ড্রাইভার দুজন মোটা কম্বলের কোটে গা ঢেকে বসে আছে নিজের নিজের গাড়িতে। কমফর্টার জড়িয়ে কান আর মাথা ঢেকেছে। কোটের লম্বা হাত থেকে দুটো আঙুল বের করে বিড়ি টানছে। এদিকে তেওয়ারী আর বাঙালীবাবু জহরও এসে হাজির।

একে একে খাতা দেখে নাম মিলিয়ে দেড়শো কঙ্কালসার ছায়াশরীরকে তুলে দিলো তারা মোটরে। গা ঝাড়া দিয়ে নড়েচড়ে যাত্রা শুরু করলে দুখানি বাস। লম্বা পীচঢ্যালা পথ ধরে শহরের দিকে এগিয়ে চললো তারা।

ভোরের রাতের দূর শহরে গ্যাসদীপের কৃত্রিম জ্যোছনা। আর অজস্র আলো বিজলী বাতির ফাঁকে ফাঁকে দু-এক টুকরো সাঙ্কেতিক নীলিমা। সড়কের মোড়ে মাথায় রেড লাইটের সাবধানী।

পথের কোণে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক নেমে যায়। এই বিরাট শহরের অতিচঞ্চল জনারণ্যের মাঝে মাঝে। পথে পার্কে, দোকানের সামনে আর সিনেমার দরজায়, কলেজের গেটে আর মন্দিরে দরগায় মুলচাঁদ মাড়োয়ারীর দেড়শো জীবন্ত মুদ্রাচুম্বক নেমে যায়।

ষোল বছর বয়স হ'ল পিলুয়ার। অথচ চেহারা দেখে মনে হয়. এমন দশটা শীতও যায়নি ওর ওপর দিয়ে। মাথায় একটা ভেলভেটের লাল টুপী, নর্দমার ময়লা লেগে একটা দিক কালো হয়ে গেছে। ওপরের ঠোঁটটা কাটা, জিভ দিয়ে চাটে বারবার। এহেন পিলুয়া নামে সকলের আগে। সঙ্গে থাকে তার চারচাকায় বসানো কাঠের একটা ট্রলী, তার ওপর বসে আছে কিংবা শুয়ে আছে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে একটি সজীব মাংসপিণ্ড। মাথাটা সুবৃহৎ, কাঁধটা চওড়া, বুকটা যে কোন ব্যায়ামবীরের সমান। কিন্তু ব্যস্, ঐ অবধি। কোমরের নীচে থেকে পা পর্যন্ত সরু আর লিকলিকে। পাঁচ মাসের শিশুর চেয়েও সরু পা তার। পক্ষাঘাত বা অন্য কোন কারণে নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ। তাই জীবটিকে কাঠের ট্রলীতে বসিয়ে গলি গলি টেনে নিয়ে বেড়ায় পিলুয়া। একটা বিশ্রী আর্তনাদ করতে করতে পিলুয়া ভিক্ষে করে।

শহরের কলিজার মধ্যে সবচেয়ে সচ্ছল অংশটিতে মাংনা দাঁড়ায় তার দেহের লোভানি মেলে। রুখন ভিখুরাম তাহির পণ্ডা সকলেরই এক-একটা বাঁধা জায়গা আছে, সন্‌কা রাউতী সাবিয়া মাংনা—তাদেরও আছে বাঁধা জায়গা। সবাই ভিক্ষে করে, কেউ কানা চোখ আর ভাঙা পা দেখিয়ে, কেউ বা তাজা চোখ মাজা মুখ দেখিয়ে।

সিধু দপ্তরীর গলিতে একটা সরাইখানা আছে মুলচাঁদ মাড়োয়ারীর। যখন মাঝ আকাশে উঠবে দিনের সূর্য, খানিকটা বা ঢলে পড়বে পশ্চিমের দিগন্তে, তখন খাবার সময় হবে ওদের। একে একে এসে সরাইখানায় জড়ো হবে, গলার নম্বরি চাকতি দেখিয়ে খেতে পাবে ডাল আর ভাত।

সরাইখানায় বিনিপয়সায় খানা খেয়ে আবার যে যার জায়গায় ফিরে যায়। ভিক্ষে করে সেই রাত দশটা অবধি। তারপর আসে মোটরবাস, নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজায়। ওরা আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকে। বারতিনেক হর্ন বাজিয়ে যার পাত্তা মেলে না, সে পড়ে থাকে পিছনে। মোটরবাস আর সেদিন অপেক্ষা করে না তার জন্যে।

পিলুয়া তাই পিছনে পড়ে রইলো সেদিন। বাস ধরতে পারলো না। ফুটপাথের পাশে একটা ময়রার দোকানের বড় উনুনটা বেশ নিভে গেছে তখন। হাতড়ে হাতড়ে ভেতরের ছাইগুলো দেখলে পিলুয়া। না, হাত-পা পুড়ে যাবার ভয় নেই। বড় উনুনটার মুখে ছাইয়ের গাদায় বেশ আরাম করে কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়া যাবে। ব্যাঙাচি আর ব্যাঙাচির কাঠের ট্রলী টেনে তুললো রোয়াকের ওপর। তারপর শুয়ে শুয়ে পরদিন তেওয়ারীর কাছে প্রাপ্য চড়চাপড়ের আতঙ্ক অনুভব করতে শুরু করলে। কি কুক্ষণেই বায়োস্কোপের নেশা ধরেছিল তার। কাছের বায়োস্কোপটার। একটা পার্কের কোণে মাটি খুঁড়ে চুরির পয়সা জমা করে রাখছিল এতদিন। আজ কয়েক আনা জমেছে দেখে ছবিটা দেখতে গিয়েছিল পিলুয়া। তাই মোটর ধরতে পারে নি।

পর্দার গল্পটা এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। ওর চেয়ে বছরখানেকের বড় ছেলেটা কি কেরামতিই না দেখালে। একটা পুল উড়িয়ে দিলে বোমা দিয়ে, ট্রেন লুঠ করলে, ঝাঁপ দিলো তিনতলা থেকে, বুড়োটাকে খুন

করে তার মেয়েকে নিয়ে পালালো। সাবাস্, সাবাস্। সকলের সঙ্গে পিলুয়াও হাততালি দিয়েছে ঘন ঘন।

ওদের মধ্যে বায়োস্কোপের নেশা ধরেছে আর একজনের। পণ্ডা। একটা ইংরেজী সিনেমার সামনে রঙিন ছবি একটি মেয়ের—নেশা ধরিয়ে দিয়েছে পণ্ডার। যেমন করে হোক পয়সা বাঁচিয়ে দেখবেই সে। পোস্টারের ছবিটা দেখেছে সে। পরীর দেশের ছবি, পরীদের চেয়েও সুন্দরী এক মেমসাহেব, শুধু বুকে কোমরে একটুকরো মলমল। ও-ছবিটা দেখবে পণ্ডা দিনকয়েকের মধ্যেই। টিকিটঘরটা কোথায়, জেনে নিতে হবে। পিলুয়াটা জানে ওসব। পণ্ডা খুঁজছিল তাই পিলুয়াকে, কিন্তু নাম ডাকের সময় দেখলে পিলুয়া ফেরে নাই।

—কি রে, খুঁজছিস কোন্ পেয়ারের মাগীকে? কথার শেষে হেসে উঠলো মাংনা।

চমকে ফিরে তাকিয়ে পণ্ডা বললে, তুমাকে লয় গো, তুমাকে লয়।

হাজরি খতম হয়ে গেছে তখন। রাউতীকে ইশারায় দূরে ডেকে নিয়ে গেল বাঙালীবাবু জহর। আড়চোখে দেখে হাসলে মাংনা। আসুক আজ মুখপুড়ি, দেখবে সে একচোট। এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল তার কাছে?

খাবার সময় পাশে এসে রাউতী বসলো। মাংনা একটা ঠেলা দিলে তার গায়ে।

—কি বললে রে তোর লাগর?

—কে?

—কেন ঐ হাজ্‌রেবাবু, জানি না নাকি কিছু।

প্রতিবাদ করে উঠলো রাউতী, না, মাইরি না। ও অন্য কথা কইছিল।

—কি কথা?

ফিস ফিস করে একে একে সব খুলে বললে রাউতী। ও যে আসন্নপ্রসবা তা মুলচাঁদ মাড়োয়ারীর কানেও নাকি রটে গেছে। বাঙালীবাবু জহর জানিয়েছে তাকে, সে যদি এখন থেকে রোজ এক টাকা করে জমা দিতে পারে, তাহলে বাকী যা লাগবে মুলচাঁদই দেবে—দিয়ে তার ছেলেকে মানুষ করবে তারা। লেখাপড়া শেখাবে। ভদ্রলোকের জায়গায় ভালোভাবে থাকতে, খেতে দেবে, অনেক বড় চাকরি করে দেবে তার ছেলের। বড় হবে তার ছেলে, ভদ্রলোক হবে।

রাউতীর কথা শুনতে শুনতে মাংনার চোখেও স্বপ্ন নামলো। সেও যদি এমনি একটা ছেলে পেত, তাকেও হয়তো লেখাপড়া শেখাতো। সেও বড় হত, মানুষ হত। আহা, ঠিক ঐ হাজরিবাবুর মত যদি দেখতে হয় তার ছেলেকে। পণ্ডা? না, অমন কাঙালীর মত চেহারা না হওয়াই ভালো।

মাংনা বললে, পারবি তুই রোজ এক টাকা করে দিতে?

—খু-উ-ব। টেনে টেনে মিটমিটে হাসি হেসে বললে রাউতী।

সত্যি করেই পরের দিন থেকে এক টাকা করে জমা দিতে শুরু করলে রাউতী। মাঝ থেকে চুরিটা বন্ধ হ'ল এই যা। তা হোক, কি-ই বা দরকার? পয়সা জমিয়ে করবেই বা কি সে। একদিন তো খেতে না পেয়ে এখানে এসেছিল, যা দু-চার পয়সা পেয়েছে, তাই জমা দিয়েছে। তার জন্যে এক-

হাতা কম খিঁচুড়ি তো খেতে হয়নি কোনদিন। অসময়ে মূলচাঁদ মাড়োয়ারী সরে দাঁড়াবে না। ঠিক খেতে দেবে। মিঠাইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতে হবে না। শীতের কাঁপুনি আর বর্ষার জল সহ্য করে ফুটপাথে পড়ে থাকতে হবে না। আর, আর ছেলে বড় হবে। মানুষ হবে।

মোমবাতিটা আবার জেবলেছো? ভাবছো, কাহিনী আমার শেষ হয়ে গেছে? না, এর পর আছে ওদের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক। শেষ দৃশ্যটা দেখতে চাও তো চলো এগিয়ে চলো। দুটো বছরকে রাখো পিছনে ফেলে। ওদের ঘুম ভেঙে যাবে, আস্তে পা টিপে টিপে এসো, দেখবে এসো। রাউতীর ঘুম ভাঙিও না। একবার জেগে উঠলে আর ঘুম নামবে না ওর চোখে। ভাববে. তার ছেলের কথা। কোন্ সুদূরে নাকি মানুষ হচ্ছে তার ছেলে। বহুবার বাঙালীবাবু জহরের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে সে। তার ছেলেকে শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখতে চেয়েছে। প্রায় ছ' মাস হ'ল তার দেড় বছরের ছেলেকে নিয়ে গেছে তারা। মানুষ করবে তাকে, জহর বলেছে। রাউতী বিশ্বাস করেছে সে কথা, তা বলে তুমিও যেন বিশ্বাস করো না। চলো দেখবে চলো। ঐ যে তেওয়ারীর কুঠরী থেকে খানিক দূরে আর একখানা ঘর. ওখানে কেউ যেতে পায় না। এই ছোট দুনিয়ার নিষিদ্ধ দেশ ওটা। দেখতে পাচ্ছো. কপাটে ঝুলছে একটা তালা? ও-তালার চাবি আছে এক তেওয়ারীর কাছে। ওখানে ঢুকতে পায় শুধু মূলচাঁদ মাড়োয়ারীর অর্থপুষ্ট কয়েকজন উড়ে চাকর। কি আছে জানো ওর ভেতর? খোলা জানালায় উঁকি মারো, মোমবাতিটা তুলে ধরো গরাদের পাশে। কি, ভয়ে পিছিয়ে আসছো কেন? ওরা মানুষ হচ্ছে। হাঁড়ির আকারের বড় বড় জালার ভেতরে বসে রয়েছে ওরা। হাঁড়ির কানাটা চেপে রয়েছে প্রত্যেকের কোমরে। কোমরের ওপর থেকে সমস্ত শরীরটা বেড়ে উঠেছে ওদের নিয়মিত পানাহারে। শুধু কোমরের নীচের অংশটার নেই পরিবর্ধন। বারো বছর পরেও ওদের পা দুখানা থাকবে বারো মাসের শিশুর। লিকলিকে। অবশ নিম্নাঙ্গের জন্যে ওরা বসতে পারবে না, শুতে পারবে না, দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু পথিকের করুণা উদ্রেক করতে পারবে।

ভবিষ্যতের অনেক অনেক পিলুয়ার কাঠের ট্রলীতে ব্যাঙাচির অভাব হবে না।

আর। মূলচাঁদ মাড়োয়ারীর চামড়ার থলিটা জলভরা ভিস্তির মত ফেঁপে ফুলে উঠবে।

বৌ রা নী

বৌরানী একা ফিরলেন না।

সঙ্গে এল দাসদাসী, বাজার সরকার অক্ষয়বাবু, কোলে এক বছরের বাচ্চা মেয়ে বেবি।

তবু আমার কেমন যেন মনে হ'ল বৌরানী বুঝিবা একাই ফিরলেন। সত্যি, মেয়েদের জীবনে একজনই শুধু একটি পৃথিবী, আর তাকে হারালেই নিঃসঙ্গ একাকিত্ব।

খবরটা শুনে অবধি আশা-ছোঁয়া-অবিশ্বাস পুষে রেখেছিলাম ঃ হয়তো টেলিগ্রাফের ভাষাটায় কোন ভুল রয়ে গেছে, হয়তো দুর্জনের রসিকতা।

এদিকে মা-মণির অসুখ তখন বাড়াবাড়ি, ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। একশো-খানা দশ টাকার নোট বাজার সরকার অক্ষয়বাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলাম গুণে গুণে, বলেছিলাম, এই ট্রেনেই চলে যাও। তবে, আমার বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না।

ছোটবাবু নেই .....একথা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

ছোটবাবু! সেই এক ফোঁটা রাঙা টুকটুকে ছেলে মা-মণির। কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। যে বারে ইস্কুলের পড়া শেষ ক'রে পরীক্ষায় পাস দিল ছোটবাবু, সেদিন কি আনন্দ এই বাড়িতে। কর্তা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন বাজার ক'রতে, ছোটবাবুর জন্যে কি না কিনলেন সেদিন! মা-মণির জন্যে একজোড়া লালপেড়ে কড়িয়াল শাড়ি, আর নিজের জন্যে জরির কাজ করা চটি জুতো একজোড়া। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন ক'রে পাঁচ শ' লোক খাওয়ানো হ'ল।

কলেজে ঢুকলেন ছোটবাবু, একটা পাসও দিলেন। তারপর একদিন শুনলাম, ছোটবাবুর বিয়ে।

সিঁদুরগোলা মাখনের টুলটুলে একখানি মুখ, পরীর মত রূপযৌবন, লক্ষ্মীঠাকরুনের মত লাজুক লাজুক চোখ। বৌরানী এলেন, রোশনচৌকী বসলো, চিৎপুরের দোকান থেকে ফুলশয্যার সাজ এল হাজার টাকার এক পাই কম নয়। দরিদ্রনারায়ণের সেবা হ'ল সামনের উঠোনে, এক হাজার কাপড় বিলি ক'রলাম কাঙালীদের।

কর্তা হাত ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেলেন আমাকে, বললেন, ছেলে-বৌকে আশীর্বাদ ক'রে যান নায়েব মশাই।

বললাম, আজ্ঞে ছোটবাবু হ'লেন রাজপুত্তুর, দুদিন বাদে উনিই রাজা হবেন, আমি আজ্ঞে আশীর্বাদ ক'রবো, সে কেমন কথা।

মা-মণি বললেন, ও কথা বলবেন না নায়েব মশাই, ছেলের মত কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন আপনি।

তারপর ইশারা করতেই ঢুপ করে একটা প্রণাম করলেন ছোটবাবু

আর বৌরানী। আর পাশাপাশি যখন গিয়ে বসলো দু'জনে, ঠিক যেন হরগৌরী।

মনে মনে বললাম, দীর্ঘজীবী হও, সুখী হও।

কে জানত, আশীর্বাদের একটাও ফলবে না। কে জানত মাস কয়েকের মধ্যেই কর্তা সব ভার এই বুড়োর ঘাড়ে চাপিয়ে বৈতরণী পার হবেন।

কর্তা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, বৌ পছন্দ হয়েছে তো নায়েব মশাই?

বলেছিলাম, দুধের সরটুকু তুলে এনেছেন হুজুর, পছন্দ হবে না কেমন কথা।

এতদিন বাদে, বৌরানীর দিকে চোখ পড়তেই, সে কথাটা মনে পড়ল আবার।

দুধের সরই বটে।

দামী দামী রঙিন শাড়িতে সদাসর্বদা ঝকমক ঝকমক করে ঘরময় ঘুরে বেড়াত যে, নাকে হীরের নাকছাবি, কানে হীরের দুল, আর গায়ে এক গা সোনা ঝলমল করত যার, হঠাৎ যেন দুধের সরের মতই সাদা ধবধবে মোটা একখানা থান উঠেছে তার শরীরে।

গাড়ি থেকে নামলেন বৌরানী। বৌরানী তো নয়, যেন শাপগ্রস্ত কোন অপ্সরী নেমে এলেন স্বর্গ থেকে।

অন্দরমহলে মা-মণি তখনও ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। আর-আর লোকজন কে কি বলবে, কথা না খুঁজে পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঘাড় হেঁট ক'রে, শুধু জ্ঞানদা ঝি চোখ মুছছে বার বার।

দুটি ফর্সা ধবধবে হাত, একফালি চুড়িও নেই সে হাতে, নাক থেকে নাকছাবি, কানের দুল, গলার হার সব সরে গেছে ইতিমধ্যেই। শুধু একখানা সাদা থান বৌরানীর অপ্সরীর মত সুন্দর চেহারায়।

বৌরানীর চোখে কিন্তু জল দেখলাম না, মুখে শক্ত সমর্থ ভাব। কোথাও এতটুকু ভেঙে পড়ার চিহ্ন নেই। তবু কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারলেন না। মাথা হেঁট ক'রে সটান অন্দরমহলে ঢুকে গেলেন।

বৌরানীর চোখে কি কান্না নেই?, আমরা সবাই একটু বিস্মিত হলাম। বলা-কওয়া করলাম আমি আর অক্ষয়বাবু।

বিধবা হ'লেই কি এমন কঠিন হতে হয়? মা-মণিকেও দেখেছি। কর্তা মাবা যাওয়ার পরেও দু' চার মাস পাড়ওয়ালা শাড়ি পরতেন। কিন্তু কাঁদতেন দিনরাত।

আর বৌরানী ভরাযৌবনের বয়সে বিধবা হয়েই কিনা থান পরতে শুরু করলেন। আবার এদিকে এত কড়া নজর যদি তো কাঁদেন না কেন?

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে নিজের মনে কাঁদেন কিনা বুঝতে পারতাম না আমরা, বুঝতাম শুধু এইটুকুই যে বৌরানী আর হাসবেন না।

কাজে অকাজে দেখা করতে হ'ত বৌরানীর সঙ্গে।

মেঘ থম-থম মুখের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যেত না, তাই দু'চার কথার পরেই সরে আসতাম।

মা-মণি মাঝে মাঝে সখেদে বলতেন, বৌমা বোধ হয় বেশীদিন আর বাঁচবে না নায়েব মশাই।

দীর্ঘশ্বাসের সায় দিতাম এ কথার। ভাবতাম, এমন কিছু একটা ঘটে না, যাতে আবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে বৌরানীর? হঠাৎ একদিন এসে হাজির হ'তে পারেন না ছোটবাবু? বলতে পারেন না, তোমরা কেন এমন মুখ ছমছম করে আছ, আমি তো বেঁচেই আছি।

না। ছোটবাবু যেখানে গেছেন সেখান থেকে মানুষ ফেরে না। ফিরিয়ে আনতেও পারে না কেউ। সে যত বড় সতীসাধ্বীই হোক না কেন। আমি জানতাম। আমরা সবাই জানতাম।

তবে এও জানতাম বৌরানীর মুখেও হাসি ফিরে আসতে পারে। আসতে পারে এক অমিয়বাবু এলেই।

কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। বুঝলাম যেদিন অমিয়বাবু দেখা করতে এলেন বৌরানীর সঙ্গে। সেই অমিয়বাবু, যিনি বনেদী জমিদার ঘরের ছেলে ছোটবাবুকে পুরোদস্তুর সাহেব করে তুলেছিলেন।

অমিয়বাবুকে আমরা চিনতাম বৌরানীর ভাই হিসেবেই। কি রকম ভাই তা খোঁজখবর নিয়েও বুঝে উঠতে পারি নি। তবে বৌরানীর বাপের বাড়িতেও তাঁর আদর আপ্যায়ন কম ছিল না।

বিয়ের পর অমিয়বাবুর আনাগোনা এ বাড়িতে একটু বেড়েই গিয়েছিল। আর বৌরানী যে সমাজের মানুষ তাতে এটা এমন কিছু দৃষ্টিকটু ছিল না।

আলিপুরের বেশ ফ্যাশানদুরস্ত বাগানওয়ালা বাড়িটা ছিল বৌরানীর বাপের। বাপ ছিলেন ব্যারিস্টার, ষোল আনা সাহেবী কায়দা-কানুন তাঁর। মেয়েকে প্রথমে কনভেণ্ট না কি বলে সেখানে পড়িয়েছিলেন। তারপর কোন একটা খ্রীস্টানী কলেজে। মেয়ে পুরুষ নাকি একসঙ্গে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতো সে কলেজে। শুনে তো আমাদের চোখ কপালে উঠল।

কর্তার সঙ্গে সে একবারই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি কি ইয়া এক কুকুর নিয়ে বাগানে পায়চারি করছে একটি মেয়ে। আর যা তার পোশাক, তাকাতেও লজ্জা হয়।

প্রথমটা তাই চিনতেও পারি নি।

বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে কাগজ পড়ছিলেন ব্যারিস্টার বেয়াই। আমাদের দেখেই বসতে বলে ডাকলেন, লিলি ডার্লিং!

লিলির মানেও জানতাম না, ডার্লিং কার নাম তাও না।

দেখি কি, সেই ধুমসো কুকুরটাকে টানতে টানতে একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এল মেয়েটি।

চিনতে পারলাম। আমাদের বৌরানী।

শ্বশুরকে প্রণাম করা তো দূরের কথা। সামনের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন বৌরানী। ভাবলাম, বিয়ের পর থেকেই কেন এত মন কষাকষি

বোঝা গেছে। মা-মণিকে জানাতে হবে কর্তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তাই এমন বাড়িতে বিয়ে দিয়েছেন ছেলের। আর কি আশ্চর্য। এমন মেয়েকে বৌভাতের দিন মনে হয়েছে লক্ষ্মী ঠাকরুণ!

টেবিলে বসে খানা-পিনা। মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে। আমার সামনে বসলেন বৌরানী, কর্তার পাশে ছোটবাবুর শাশুড়ী।

কর্তা মারা যাওয়ার আগে অবধি তাই বৌরানী আর এ বাড়ির চৌকাট মাড়াতে পান নি।

কর্তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছোটবাবুর শ্বশুর অবশ্য এসেছিলেন। বিলিতী দর্জির তৈরি দামী কোট প্যাণ্ট পরে। গল্প করতে করতে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের ক'রে ছোটবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

ফর্সা ধবধবে রঙ ছিল ছোটবাবুর। স্পষ্ট দেখতে পেলাম ছোটবাবুর কান দুটো লাল হয়ে উঠল। রাগে নয়, লজ্জায়। রাগ ছোটবাবুর শরীরে আদপেই ছিল কিনা সন্দেহ।

দিন কয়েক পরেই বৌরানীও এলেন। কোথায় সাহেবিয়না? একেবারে কনেবৌ, আধ হাত ঘোমটা। পায়ে আলতা।

সবাই খুশী হলাম। অখুশী হলাম ছোটবাবুর ওপর। তার চেয়েও বেশী চটলাম ঐ অমিয়বাবুর হাবভাব দেখে।

গরদ নয় তো আদ্দির পাঞ্জাবী। জরি পাড় ফিনফিনে ফরাসডাঙ্গা আর পায়ে চকচকে পামসু। এই ছিল ছোটবাবুর পোশাক। হাতে হীরের আংটি ঝলমল ক'রত। ল্যাণ্ডো ছাড়া এক পা নড়তেন না। আস্তাবলের নামে পেশোয়ারী দানার হিসেব বসাতাম হাজার টাকা বছরে, ঘোড়া দুটোও ছিল তেজী আর জোয়ান। চকচক করতো কুচকুচে কালো গা, চুমকি বসানো মখমল দিয়ে ঢাকা থাকত তাদের পিঠ। আর রাস্তায় যখন এবাড়ির গাড়ি বের হ'ত, দু'পাশের লোক চেয়ে থাকত সেদিক পানে।

অথচ অমিয়বাবু এসে ছোটবাবুর কানে মন্ত্র পড়তেন অন্য। মোটর গাড়ির নামের তো ছড়াছড়ি, সে সব কি জানি ছাই আমি। তবু বুঝতে পারতাম দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় বসে বসে কি গল্প হচ্ছে দুজনে। বৌরানীও মাঝে মাঝে এসে যোগ দিতেন, হাতে বই নিয়ে বসতেন ওদের সামনে।

মজিলপুর তৌজীর গণ্ডগোল মেটাবার চিঠিটা আসতেই ছোটবাবুর কাছে খবর পাঠালাম। মোক্ষদা ফিরে এসে বলল, বৌরানী ওখানে নিয়ে যেতে বললেন চিঠিটা।

গেলাম দোতলার বারান্দায়, আর গিয়ে দেখলাম খিলখিল শব্দ করে হাসছেন বৌরানী। কর্তা বেঁচে থাকতে এ বাড়ির মেয়েরা, হাসতো নিশ্চয়ই, কিন্তু সে হাসি শুধু দেখাই যেত, শোনা যেত না। তাই মনটা মুষড়ে গেল এক মুহূর্তে। কিন্তু তারপর যে কথাটা শুনলাম, সে কথা কোনদিন শুনতে হবে ভাবিনি।

বৌরানী হাসতে হাসতে ছোটবাবুকে বললেন, তোমার ঐ ছ্যাকরা গাড়িটা বিদেয় কর। একটা মার্সেডিজ কেনো ওর বদলে।

কথাটা নতুন শুনলেও বুঝতে বাকি রইল না ওটা মোটর গাড়ির নাম। মন বিষিয়ে উঠল তাই।

বললাম, বৌরানী, এ বাড়ি হ'ল রাজবাড়ি। রাজা খেতাবটাই নেই, সম্পত্তির দিক থেকে বনেদীয়ানায় কত রাজা মহারাজাও চুল বিকিয়ে বসে আছে ছোটবাবুর কাছে। ল্যান্ডো ছেড়ে কি দুদিনের-টাকা-হওয়া ঠিকেদারদের মত মোটর চড়তে পারেন ছোটবাবু, ইজ্জতে বাধবে যে।

ইজ্জৎ! হাসলেন, না ধমক দিলেন অমিয়বাবু, ঠাহর হ'ল না। বললেন, ঐ ছ্যাকরা গাড়ির জন্যেই ইজ্জৎ থাকছে না এ বাড়ির; লোকে কৃপণ ভাবছে।

কৃপণ? একখানা ল্যান্ডোর পিছনে যা খরচ তাতে যে দু-তিনখানা মোটর রাখা যায়! ভাবলাম মনে মনে, বলতে সাহস হ'ল না। কারণ তার আগেই ছোটবাবু বলে বসলেন, শ' পাঁচেক টাকা দেবেন তো নায়েব মশাই, অমিয়দা'র সঙ্গে যাব আজ স্যুটের অর্ডার দিতে।

স্যুট? অর্থাৎ কোট প্যান্ট? তবে আর বলে লাভ কি, ছোটবাবুর মনই যখন ভিজেছে?

দিন কয়েক পরেই শুনলাম ছোটবাবু এটর্নির পড়া পড়বেন, তারপর হাইকোর্টে বেরুবেন পাস করে।

বললাম, তা হ'লে জমিজমা বিষয় সম্পত্তি কে দেখবে? আর হাইকোর্টে গিয়ে ডুমুর কুড়োনোর দরকারটাই বা কি ছোটবাবুর?

উত্তর দিলেন বৌরানী। বললেন, টাকাটাই সব নয় নায়েব মশাই। শিক্ষাদীক্ষাটারও দরকার, আর পাঁচজনের সঙ্গে মেশবার জন্যে একটা পরিচয়ও থাকা চাই।

চুপ করে রইলাম। বৌরানীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে পরিচয়? কর্তার সঙ্গে যে এই বাড়িতেই বসে রাত কাবার করেছে কত জজ ম্যাজিস্ট্রেট। এই বাড়ির মামলা তদারক করেই তো অর্ধেক উকিল মোক্তার গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়েছে, দোতলা তুলেছে হরিশ এটর্নি।

কিন্তু কে শোনে সে কথা। বৌরানী যখন পণ করেছেন ছোটবাবুকে ঢেলে সাজবেন, রুখবে কে?

মাঝে মাঝে সেরেস্তায় এসে বসতেন ছোটবাবু। দু-চারটে গল্প গুজব করতে করতে হঠাৎ হয়তো কোনদিন বলতেন, আপনাদের বৌরানীর মত শিক্ষিত মেয়ে কিন্তু খুব কম আছে নায়েবমশাই।

বলতাম, তা তো বটেই। কেমন বাড়ির মেয়ে দেখতে হবে।

ছোটবাবু খুশী হয়ে হাসতেন।—সত্যি শ্বশুর মশায়ের আদবকায়দা হাবভাব একেবারে সাহেবদের মত। গভর্নরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব। আর আপনার বৌরানী সেদিন ইংরেজীতে কথা বললো হাটন সাহেবের সঙ্গে। আমি তো আশ্চর্য। আবার ফরাসী শিখেছিল নাকি কলেজে পড়বার সময়।

ছোটবাবু গুণগান করত ও-বাড়ির, আর আমি মনে মনে ছোট হয়ে

যেতাম। এতদিনের বনেদী বংশ, এমন প্রতিপত্তি—সেসব কিছুই নয়? শোবার ঘরে গায়ে একটা মখমলের আলখাল্লা চাপানই সব?

বুঝতাম, এর মূলে শুধু বৌরানী আর অমিয়বাবু।

ছেলে-বৌয়ের হাবভাব দেখে কোণের ঘরে বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন মা-মণি, আর নাম জপ করতেন।

এক একদিন সখেদে বলতেন, এ বাড়ি যে উচ্ছন্নে গেল নায়েব মশাই, চোখে দেখতে পান না? চোখ ছলছল করতো মা-মণির; আর আমি বলতে পারতাম না যে চোখে দেখতে পেলেও কিছু করবার নেই আমার। মেজদিদিমণি একবার এসেছিলেন পুজোর সময়, যাবার সময় শুধু ছি ছি ক'রে গেলেন।

এ বাড়ির হালচাল তখন বদলে গেছে, রেওয়াজ শুরু হয়েছে টেবিলে খাওয়ার। বড় ঘরের দেয়াল থেকে রাজা-রানীর বড় অয়েল পেণ্টিং দু'খানা সরে গেছে, তার জায়গায় এসেছে দু'খানা বিলিতী ছবি—যার দিকে চোখ তুলে তাকান যায় না, যে ছবি শুধু কর্তার বাগানবাড়িতেই মানাতো।

এদিকে বৌরানীর পোশাক পরিচ্ছদও বদলে যাচ্ছিল, হাবভাব কথা-বার্তাও। তার জন্যে অবশ্য বৌরানীকে দোষ দিই নি।

ফিরিঙ্গিয়ানার মধ্যে মানুষ হলেও এ বাড়িতে এসেছিলেন তিনি বৌরানী হয়ে। গরদের শাড়ি পরলে মানাত তাঁকে, আরো সুন্দর দেখাতো হীরের দুল পরলে।

কিন্তু ছোটবাবুর মনে তখন নেশা ঢুকেছে। রীতিমত হাইকোর্টে যাতায়াত শুরু করেছেন। কোটপ্যাণ্ট পরে, মোটর গাড়ি হাঁকিয়ে। ল্যাণ্ডোর চাকায় জং ধরে গেল কিনা খোঁজ নিতেন না একদিনও।

বৌরানী তো ছোটবাবুকে ঢেলে সাজলেন, তারপর শুরু হ'ল মনোমালিন্য।

দিনে দিনে একদিকে যেমন ছোটবাবু বনেদী ঘরের সব চালচলন আচার-বিচার ত্যাগ করে ফিরিঙ্গিয়ানার পিছনে ছুটছিলেন, তেমনি বৌরানী আবার ক্রমশ হয়ে উঠছিলেন পুরোদস্তুর হিন্দু ঘরের বৌ। ঘোমটা টানতে টানতে নাক অবধি নামিয়ে ফেলেছেন তখন, আর মা-মণির হাসি হাসি মুখের উপদেশ শুনে শুনে বৌরানীও রীতিমত শনি-মঙ্গলবার করতে শুরু করেছেন। আজ ব্রত, কাল উপবাস, তারপর দিন মা ষষ্ঠীর পুজো দেয়া।

অর্থাৎ বাইরে যতই আদবকায়দার চাকচিক্য থাক না কেন, বৌরানী এটুকু ভুলবেন কি করে যে তিনি শুধু বৌ হয়েছেন, মা হন নি।

তাই ছোটবাবুর মন যত বাইরে ছুটতে শুরু করলো, বৌরানীও তত্ই অন্দরমহলে ঢুকতে চাইলেন। মা-মণির পুজোর ঘরেই কাটাতে লাগলেন সারাটা দিন। আজ মাদুলী, কাল তাবিজ, তারকেশ্বরে ধর্না দেওয়া লেগেই রইল। আর তাই নিয়ে খুঁটিনাটি বাধতো ছোটবাবুর সঙ্গে।

ছোটবাবু হয়তো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করে ফিরলেন, আর বৌরানী বেঁকে বসে বললেন, তুমি যাচ্ছ যাও না, আমি ঘরের বৌ কোথায় যাবো হৈ হৈ করতে।

ছোটবাবুর শখ হ'ল সিনেমা দেখতে যাবার, বৌরানী বাদ সাধলেন। বললেন, সিনেমা আমার ভাল লাগে না। মা-মণি বলছিলেন 'অহল্যার অভিশাপ' থিয়েটারটা নাকি খুব ভাল, যদি হয় কোনদিন জানিও।

শুনে সারা শরীর জ্বলে যেত ছোটবাবুর, বেশ বুঝতে পারতাম। একদিন বৌরানীই ঠাট্টা করতেন ছোটবাবুর থিয়েটার দেখার রোগ নিয়ে, আর আজ বলছে কিনা...

এমনি ধারাই চলছিল বছরের পর বছর। ছোটবাবুকেই বা দোষ দোব কি, তাঁরও তো মানুষের শরীর। তাই ফরাসী শেখাবার জন্যে যে কচি বয়সের মেমসাহেবটি আসতো তাঁর কাছে, ক্রমশ কেমন সন্দেহ হতে শুরু হ'ল তার সঙ্গে যেন বড় বেশী মাখামাখি শুরু করেছে ছোটবাবু। তা করুক, বনেদী ঘরের জমিদার, যার যা রক্তে সয়। তা ব'লে দিনে হাজার টাকা চাই বলে হুকুম দিলেই তো হাজার টাকা আসে না। জমিদারী টিকবে কেন তা হ'লে।

বললাম সে কথা। শুনে কড়া গলায় ধমক দিলেন ছোটবাবু। কোলেপিঠে করে যাকে মানুষ করেছি সেই কিনা ধমক দেয়। লজ্জায়, রাগে মুখ তুলতে পারলাম না।

এদিকে বাইরের সারেঙ্গীখানায় নতুন আসবাবপত্র এল, এল সেই ফরাসী মেমের জিনিসপত্তর। তারপর শুনলাম বিদ্যেধরী সেখানেই থাকবেন।

ছোটবাবুকে আগে তবু কোর্ট থেকে ফিরে অন্দরমহলে একবার ঢুকতে দেখতাম, বিদ্যেধরীর আগমনের পর থেকে গাড়ি থেকে নেমেই ছোটবাবু সটান চলে যেতেন সারেঙ্গীখানায়। বেয়ারা, বাবুর্চি সে ঘরের পৃথক, খানাপিনার ব্যবস্থাও। রাত এগারটার ঘণ্টা বাজতো দেউড়ীতে, সেরেস্তার খাতাপত্র গুটিয়ে যখন ঘরের আলো নেভাতো শশি চাকরটা, তখনও টুং টুং পিয়ানোর শব্দ আসতো মেমসাহেবের ঘর থেকে।

ভাবতাম, বৌরানী কি এসব দেখেও দেখেন না?

দেখতেন সবই। যেটুকু দেখতে পেতেন না, অমিয়বাবু সেটুকুও পূরণ ক'রে যেতেন।

আর এই অমিয়বাবুই এসে বললেন একদিন, আপনার চোখের সামনে এসব কি ঘটছে, দেখতে পান না?

বৌরানীও শেষ অবধি ডেকে পাঠালেন আমাকে।

আড়াল থেকে বললেন, আপনি শক্ত না হলে যে সব ধসে পড়বে নায়েব মশাই।

আর মা-মণি দাঁড়িয়ে শুধু আঁচলে চোখ মুছলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। কে শোনে কার কথা।

এমনি সময় শুনলাম বৌরানী অন্তঃসত্ত্বা। এত এত মাদুলী, তাবিজ, ধর্না দেওয়ার ফল ফলেছে। আর তাই শুনে বৌরানীর বাপ আর অমিয়-বাবু এসে জোর করে নিয়ে গেলেন বৌরানীকে।

এদিকে সারেঙ্গীখানায় মদের বোতল যা জমছিল তাতে সারা বাড়িটায় রেলিং দেওয়া চলে।

এমনিভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে চলছিল। ধরেই নিয়েছিলাম, বৌরানী আর এ বাড়িতে ফিরবেন না।

এমন সময় হঠাৎ ডাক পড়লো মা-মণির।

একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে মা-মণি বললেন, পড়ে দেখুন।

পড়ে দেখতে হল না, মা-মণির হাসি হাসি মুখ দেখেই বুঝলাম, সুখবর।

বললেন, বেয়াই মশাই চিঠি পাঠিয়েছেন, মেয়ে হয়েছে।

খুশী হয়ে বললাম সত্যি? এইবার ছোটবাবুর ঘরের দিকে মন পড়বে, না মা-মণি?

মা-মণি হাসলেন। বললেন, গাড়ি বের করতে বলুন। যাব না নাত্নীকে দেখতে?

ছোটবাবুকে বললাম, গাড়ি জুড়ছে ছোটবাবু, তুমি না গেলে কি চলে?

ছোটবাবু বিরক্তির স্বরে বললেন, আপনাদের বৌরানীর মেয়ে হয়েছে? তা তার মেয়ের মুখ দেখবার জন্যে তো অমিয়বাবু আছেন।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। তা হ'লে সবকিছুর মূলে এই সন্দেহ? এত অসন্তোষ, এত মনোমালিন্য অমিয়বাবুকে ঘিরে?

ইচ্ছে ছিল আভাসে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বৌরানীর কানে তুলব। কিন্তু পারলাম না।

মেয়েকে নিয়ে সে যে কি স্ফূর্তি, কি আনন্দ বৌরানীর, ব'লে বোঝাতে পারবো না। সেই হাসি হাসি মুখের ওপর কি ব্যথার ছাপ লাগাতে ইচ্ছে হয়।

এসে ছোটবাবুকে বললাম, মেয়ে একেবারে তোমার মত ছোটবাবু, ছোটবেলায় ঠিক যেমনটি ছিলে। যাও গিয়ে বৌরানীকে নিয়ে এস, ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসুক।

না, ছোটবাবু নয়, অমিয়বাবুই দিয়ে গেলেন বৌরানীকে, দিন কয়েক পরেই। বৌরানীর মুখে হাসি ফিরে এলো, ফাঁকা বাড়িতে যেন নতুন প্রাণ এল।

কিন্তু সুখ শান্তি দেখবার জন্যে কি আর এ বাড়িতে নায়েব করে পাঠিয়েছে ভগবান। সারেঙ্গীখানা থেকে ছোটবাবুর কাশির শব্দ ভেসে আসতো মাঝরাতে, শরীরও দেখতাম ভেঙে পড়ছে। তবু সন্দেহ হয়নি কোনদিন।

হঠাৎ ভোর বেলায় সেদিন বাবুর্চিটা খবর দিলে, মেমসাহেব পালিয়েছে।

সে তো সুখবর। কিন্তু কেন?

কেন? কাল কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠেছিল ছোটবাবুর। আর তাই দেখে রাতারাতি বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে সরে পড়েছে মেমসাহেব।

জীবনে অনেক বড় বড় মামলা মকদ্দমা চালিয়েছি, আদায়ে বাগড়া দিচ্ছে শুনে মহল তদারকে গিয়েছি নিজেই, জজ ম্যাজিস্ট্রেট দেখে

ভড়কাইনি কোনদিন। কিন্তু ছোটবাবুর অসুখ শুনে নিজেকে অসহায় মনে হ'ল।

খবরটা চাপা রইল না, কি ক'রে যেন বৌরানীরও কানে গেল।

আর তাঁর কাছ থেকে শুনলেন অমিয়বাবু।

এতদিন এই অমিয়বাবুকে কেন যে বিষ নজরে দেখতাম। মানুষ চেনা সত্যিই বোধ হয় সহজ নয়। এতটুকু ভয়ডর নেই, কি অক্লান্ত সেবা। দিন নেই, রাত নেই, সব সময় কাছে কাছে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ খাওয়ানো। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর হয়তো অমিয়বাবু ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন আরাম কেদারায় আর বৌরানী এসেছেন ছোটবাবুর কাছে সেবাযত্ন করবার জন্যে, অমনি লাফ দিয়ে উঠেছেন অমিয়বাবু। স্বামীর সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলার পরই সরিয়ে দিয়েছেন বৌরানীকে।

আমার তখন প্রধান সহায় অমিয়বাবু।

মা-মণিও বলতেন, অমিয়র মত ছেলে হয় না।

ডাক্তার সেই সময় বললে, ছোটবাবুকে হাওয়া বদলের জন্যে কোথাও পাহাড়ী জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। ছোট দিদিমণি, মেজদিদিমণিকে লিখলাম চিঠি। তাঁরা এসে দিন কয়েকের জন্যে দেখাও করে গেলেন, যাবার আগে কাঁদলেন প্রচুর, কিন্তু ছোটবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কোন লোক পাওয়া গেল না।

শেষ অবধি ঠিক হ'ল বাজার সরকার অক্ষয়বাবু আর বৌরানী যাবেন। তবু মন কেমন সায় দিচ্ছিল না। অক্ষয়বাবু কি আর ডাক্তার ডাকা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পারবে ঠিকমত।

অমিয়বাবু বললেন, ঠিক আছে আমিও যাব।

তারপর আমি আর মা-মণি স্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এলাম ওদের। ছোটবাবুর সঙ্গে গেলেন অমিয়বাবু, অক্ষয়, বৌরানী আর এ বাড়ির দুটো ঝি।

বেশ কয়েক মাস পরে ফিরলেন বৌরানী।

বৌরানী একা ফিরলেন না।

সঙ্গে এল দাসদাসী, বাজার সরকার অক্ষয়বাবু, কোলে এক বছরের বাচ্চা মেয়ে বেবি।

তবু কেন জানিনা মনে হ'ল বৌরানী বুঝিবা একাই ফিরলেন। বিধবার বেশে, নিঃসঙ্গ একা।

শুনলাম অমিয়বাবুও ফিরেছেন। ফিরে একেবারে বাসায় চলে গেছেন।

বৌরানী ফিরে আসার পর সমস্ত বাড়িটার কেমন যেন ছমছমে ভাব। কারো মুখে হাসি নেই, ডুকরে ডুকরে পুজোর ঘরে অবিরতই কাঁদছেন মা-মণি।

এদিকে অমিয়বাবুও আসেন না, যে আগের মত হাসিগল্প করে বৌরানীর মনের ভার হাল্কা করে দেবেন।

ছোটবাবুর শেষ দিনগুলোর খবরও ঠিক পেলাম না। সবই ভাসা ভাসা। ঝি চাকর, অক্ষয়বাবু বোঝেন কতটুকু যে বলবেন। বৌরানী

বলতে পারতেন, কিন্তু তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করাও যায় না।

তাই ভাবছিলাম অমিয়বাবুকে খবর দিই একদিন।

অথচ শ্রাদ্ধের তোড়জোড় করতে গিয়ে মনেও থাকে না ঠিক সময়।

হঠাৎ দেখি অমিয়বাবু নিজেই এলেন। এসে অন্দরমহলে যেমন সটান ঢুকে যেতেন তেমনি ঢুকে গেলেন।

আর বিস্মিত হ'লাম কিছুক্ষণ পরেই অমিয়বাবুকে ফটক পার হয়ে চলে যেতে দেখে।

বেশ মনে হ'ল অমিয়বাবুর চোখে মুখে অপমানের ছায়া।

জ্ঞানদা ঝিকে ডেকে বললাম, কি ব্যাপার বলতো?

জ্ঞানদা ফিক্ ক'রে হেসে ফেলেই আঁচলে মুখ ঢাকলো।

—হাসছিস কেন, কি ব্যাপার বল না?

জ্ঞানদা গম্ভীর হয়ে বললে, বড়বাড়ির কীর্তি, ও আর শুনে কি হবে।

ধমক দিলাম ওকে।—কি যাতা ব'লছিস?

—যা তা নয়গো, যা তা নয়। বৌরানী অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে অমিয়বাবুকে।

তাও কি সম্ভব? ভাবলাম মনে মনে। যে অমিয়বাবু ছোটবাবুর জন্যে এত করলো তাকেই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে?

জ্ঞানদা বললে, বৌরানীকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিল অমিয়বাবু, বৌরানী খেদিয়ে দিয়েছে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন ক'রলাম, কেন?

জ্ঞানদা আবার ফিক্ করে হাসল।

বললে, বিধবা হয়ে সতী হয়েছেন গো।

বুড়ি ডিহিঙের সাঁকো

অয়েল-টাউন ডিগবয় এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে। ওদিকে লিদু আর বড় গোলাই—খনি-শহর। আর তারও ওপারে লামডিং চা-বাগান। এদিকে ডিগবয়, ডিগবয় পার হয়ে বোগাপানির গার্ডেনস্। মাঝখানে এই মার্ঘেরিটা, খনি শহরের আপিস-আদালত, বাণিজ্যের দপ্তর। সারা শহরটার এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড়ো ঢিবি-ঢাবা, পাহাড় আর টিলা। বাতাসে-ওড়া রুপোলী রিবনের মত এঁকে-বেঁকে নেমে গেছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা-নদী, বুড়ি ডিহিং। আর এই বুড়ি ডিহিং-এর বুকে কংক্রিটের সাঁকো বাঁধবার জন্যে গাঁথনি উঠছে ধীরে ধীরে। উপেক্ষিত পৃথিবীর বুকে ছোট্ট এক টুকরো বসতি, গড়ে উঠেছে নতুন-জাগা এক উপনিবেশ।

খোলিহামারি থেকে লামডাং অবধি একটা ঘুরন্তি রাস্তা। পাহাড়ের গা বেয়ে, পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে। কাঁচা-পাকা পাথুরে পথ, কোথাও কাদা কাঁকর, কোথাও বা চিকণ অ্যাশফল্টের চকমকি। কিন্তু বুড়ি ডিহিং-এর বাঁকে মুখ ঘোরাতে হয় মোটর লরিকে, দু'-চার মিনিট জিরিয়ে নেবার লোভে যতি পড়ে বাস আর ট্রাকের গতিতে।

তাই একটা চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে এখানে। ছিটে-বেড়ার দেয়াল, টালির ছাদ। গত বৃষ্টিতে হয়তো ধসে পড়েছে একটা দিক, কাঠের কপাট আগল আঁটে না ঠিকভাবে। লোক-চলাচলে সামনের উঠোনে কাদা চপ-চপ করে। তবু তারই ওপর দু'টো কাঠের বেঞ্চি আর একটা চেয়ার পাতা আছে। টিনের চেয়ারটা খালি থাকলেও কেউ বসে না। ওটার অধিকারী একমাত্র আব্রাহাম লখিন্দর কাঁকই। এ তল্লাটের নাম-করা গাইয়ে, কবিয়াল। রুক্ষু বাবরি চুল ঘাড় অবধি, কালো পাঁশুটে রঙ, কপালে একটা দাগ। লম্বা আর রোগা। গায়ে থাকে একটা নীল ডুরে-কাটা ফতুয়া, পায়ের ট্রাউজার ভাঁজাভাঁজিতে দোনালা হয়ে গেছে বহুদিন। কিছুই বদলায় না লখিন্দরের, না চেহারা না বেশ-বাস। বদল হয় শুধু হাতের যন্তরটির। কোন দিন থাকে ব্যাঞ্জো, কোন দিন বা গীটার।

গানের গলা ওর বংশগত, বাজাতে শিখিয়েছিল ডিগবয় মিশন ইস্কুলের মাস্টার আর্থার মলোনি। গীটার আর ব্যাঞ্জো ও-দু'টোই আইরিশ চার্চের পাদ্রী রেভারেন্ড ওয়াটকিংসের দান। খ্রীষ্টান হওয়ার পর দু'টো বছর পাহাড়ী গির্জায় স্যাবাথ ডে'র গানে সুর ঢেলে এসেছে ও।

আজ পাঁচ বছর ধরে বুড়ি ডিহিং-এর জল কাঁপছে ওর গীটারের বোলে। আর মার্ঘেরিটার বাতাস দুলে ওঠে ওর গলার সুরে। দূরে দূরে টিলার কপালে কুয়াসা জমা হয়। আর, আর সামনে মাধবী লতা জড়ানো বাঁশের বাখারি-বাঁধা ফটকে হাত রেখে দাঁড়ায় যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর বেজবড়ুয়ার মেয়ে দময়ন্তী। গগইদের ছোট মেয়ে রুক্মিণী আর কুঞ্জ

চালিয়াও কখনো সখনো সংগে থাকে। টুকি-টাকি কিছু একটা কিনতে এসে কাজ ভুলে যায় ওরা।

দোকানটা শুধু চায়ের নয়। ছোট-খাটো একটা মনোহারী দোকানও। খানা হোটেলের ব্যবস্থাও আছে। নেই শুধু রাত কাটাবার ঘর। যেটা আছে সেটা শুধু লখিন্দরের। দেয়ালে তার কালি দিয়ে লেখা অপটু হাতের বিজ্ঞপ্তি—এহানে চা পাওয়া যায়। আর কাঠকয়লায় লেখা আঁকা বাঁকা অক্ষরের একটা—সাইনবোর্ডই বলতে হয়। নীচে একটা ছাপা পোস্টার—এচপ্রো জ্বর আরু বিষ গুচায়। কিন্তু ওরা বলে, জ্বর আর বিষ যদি কেউ ঘোচায়, তো তা ঐ আব্রাহাম লখিন্দরের ব্যাঞ্জোবাদন, ওর সুরেলা হাতের গীটারের মিঠে বুলি।

সত্যি! লখিন্দর যখন গীটার বাজায়, ওর নিজের বাঁধা গানের কলিতে সুর ঢালে, তখন লোক জমা হয়ে যায় দোকানের সামনে। স্তব্ধ হয়ে কান পেতে শোনে সবাই। যত দূরেই থাক, দয়মন্তীও ছুটে আসে। পিছনে পিছনে রুক্মিণী আর কুঞ্জ! মাতাল খাসিয়া ছোকরা তিনটেও জুয়ার ঘুঁটি চালতে গিয়ে থমকে থামে।

লখিন্দর গান গায়, গীটার বাজায়। আর চোখ থাকে ওর দময়ন্তীর দিকে। দময়ন্তী! ষোল বছরের সমর্থ শরীর ঘিরে পূর্ণ-জোয়ার যৌবনের উচ্ছ্বাস। সারা দেহে লাল মেঘের ঈষৎ লালিমা। টানা-টানা চোখ-জোড়ায় অসহায় সারল্য, আর আপেল-লুকানো গোলগাল নিটোল গাল। করমচার মত কচি আর গোলাপী মুখ। তিন রঙের দেহবাস, তিনটি পৃথক্ স্পষ্ট রঙের দেহাবরণ যেন আরো উজ্জ্বল করে তোলে ওকে। আরো কমনীয়। পায়ে কোমরে টান-টান করে বাঁধা কমলা রঙের আঁচলি। হাঁটুর নীচে সুডোল এক জোড়া পায়ের চঞ্চলতা। বুকের পূর্ণিমা গোলাপী মলমলের কাঁচলি দিয়ে বাঁধা। লম্বা আর সুস্পষ্ট কালো চুলের বেণী দুটোকে ঘিরে বুকে এসে পড়েছে আসমানি ওড়না। ফিকে নীল ওড়নার ছায়া ওর চোখে, চোখের তারা নীলার মত নীল। আর নারেংগী ঘাগরার নীচে দুটি নরম আর সুশুভ্র পায়ে রক্ত-কমলের আভা।

এমনি এক অপরূপ দেহের সহজ সারল্য নিয়ে এসে দাঁড়ায় দময়ন্তী। চিক আর চাঁচরে ঘেরা ছোট ছুটকো বাগান, বাগানের মুখে বাঁশের বাতা আর বাখারির ফটক। মাধবী লতায় ঢাকা পড়ে গেছে একটা দিক। সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দময়ন্তী, বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। তন্ময় চোখ মেলে গান শোনে লখিন্দরের।

দিন কাটছিল এমনিভাবেই। লখিন্দর গান গায় আর দেখে, দময়ন্তী দেখা দেয় আর গান শোনে। এমন সময় হঠাৎ একদিন বাধা পড়লো। আব্রাহাম লখিন্দর কাঁকই, এ তল্লাটের সেরা গাইয়ে আর কবিয়াল, আশি মাইল দূর থেকেও অধিকারীরা যার কাছে ছুটে আসে যাত্রার পালা লিখিয়ে নিতে, সেই লখিন্দরের সুর ভুল হ'ল, তাল কেটে গেল গানের।

লামডিং-এর ওপারে, টিকক পাহাড় থেকে তখন নেমে আসছে নাগাদের

দল। টিকক পাহাড়ের নাগা নাগার দল। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে পিল-পিল করে নেমে আসছে ওরা, সমতলের দিকে, উপত্যকার নিচু মাটিতে লক্ষ্য রেখে। দূর থেকে পিঁপড়ের সারির মত দেখায়। একপাল পঙ্গপালের মত।

খবর পৌঁছে গিয়েছিল এখানে। আর দু'চার দিনের মধ্যেই সারা শহরটা ছেয়ে যাবে উলঙ্গশরীর নাগা নারী-পুরুষে। হাতির দাঁতের টুকি-টাকি, মোষের শিঙের রামশিঙা, নীল গাইয়ের খুর, কালো হরিণের চামড়া, চিকণ চামরের রাশ নিয়ে পথে-পথে হেঁকে বেড়াবে ওরা, হাট বসাবে।

প্রতিবারেই তাই এ সময়টায় ডিগবয় থেকে কয়েকটা আমদানি-রপ্তানির আপিস উঠে আসে এখানে। মাল কিনতে। দেহাতী আহোমদের মধ্যেও সাড়া পড়ে যায়।

ব্যবসা জেঁকে ওঠে।

নাগারা নেমে আসছে এ খবর রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবুদেরও ভিড় জমলো এ শহরে। এখানে-ওখানে দেখা গেল দু'-চারটে সুন্দর সুন্দর পুরুষ মুখ, শোনা গেল দু'-একটা দুর্নামী রটনা।

লখিন্দরের কিছু যায়-আসে না তাতে। রূপসই দময়ন্তীর শীতল চোখের মধ্যেই ওর পৃথিবীর শেষ। ওর যা কিছু স্বপ্ন, যত কল্পনা সব ঐ দময়ন্তীকে ঘিরে।

কিন্তু। কে জানতো লখিন্দরের সুর ভুল হবে, গীটারের তাল কাটবে!

প্রতিদিনের মতই টিনের সবুজ চেয়ারটায় শরীর এলিয়ে ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিল লখিন্দর। আর মাধবীলতার ফটকে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল দময়ন্তী। এপাশে-ওপাশে কুঞ্জ আর রুক্মিণী, দুই সখির ফিসফিসানির কৌতুকে লাজুক হাসি হাসছিল ঠোঁট টিপে-টিপে। এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টি বাজলো। ফটকের সামনে ঝপাং করে নামলো একটি ছোকরাবাবু। ঠেলে ঠেসিয়ে রাখলে বাইকটা, বেড়ার গায়ে। দ্রুত আর চঞ্চল ভঙ্গী। গায়ে নীল রঙের একটা হাফসার্ট, ট্রাউজারের প্রান্ত গোড়ালিতে ক্লিপ দিয়ে আঁটা। বাইকটা রেখেই চট্ করে এগিয়ে এলো, দময়ন্তীর পিঠে হাল্কা করে হাত রেখে পথ করে নিলো। ঢুকলো ভেতরে, দ্রুত মার্জিত পদক্ষেপ। কিনলে দু' প্যাকেট সিগারেট। খুচরো ফিরতি পয়সাগুলো হাতে বাজাতে বাজাতে মেয়ে তিনটের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দৃষ্টি স্থির করলো দময়ন্তীর মুখের ওপর। একটু চটুল অর্থ-পূর্ণ হাসি হেসে আঙুলের টোকায় একটা আধুলি ছুঁড়ে দিলে দময়ন্তীর গায়ে, তার পর শিস্ দিতে দিতে বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল। বাইক চালিয়ে দিলে পর-মুহূর্তেই।

দময়ন্তী তখনও বোকা-বোকা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়া আধুলিটার দিকে ওর চোখ নেই দেখে টুপ করে সেটা তুলে নিলো কুঞ্জ, তার পর একেবারে আঙিয়ার ফাঁকে রেখে দিয়ে এক ছুট।

মেয়েগুলো কেউ কিছু বুঝলো কি বুঝলো না, কে জানে। শুধু ওদিক থেকে কে একজন বললে, ঘরে ভাত নেই এখানে এসে ফুটানি মারছে।

আব্রাহাম লখিন্দর কাঁকই কিছু বললো না, কিছু শুনলো না। শুধু তাকিয়ে রইলো। সুর কেটে গেল, তাল ভুল হ'লো।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে সন্ধ্যের সময় ডিবেটা জ্বালছে মাধব, এমন সময় দময়ন্তী এলো আবার। কিছু একটা কিনতে হয়তো।

লখিন্দর ডাকলে হঠাৎ।—দময়ন্তী!

লজ্জায় থর-থর করে কাঁপতে-কাঁপতে কাছে এলো দময়ন্তী।

—বসো। চৌকির একটা পাশে বসতে বললে লখিন্দর।

জড়ো-সড়ো হয়ে এক কোণে বসে পড়লো দময়ন্তী।

একটু চুপ করে থেকে লখিন্দর বললে, ও বাবুদের কাছে যাস্ না দময়ন্তী, ওদের মনে শুধু পাপ।

লজ্জায় নুয়ে পড়লো দময়ন্তী। নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, থাক্ ওসব কথা, একটা গান শোনাও বরং।

কথা পেয়ে যেন বেঁচে গেল লখিন্দর। অস্বস্তি কেটে গেল। বললে, গান শিখবে দময়ন্তী? বাজাতে শিখবে?

হাসি চেপে ঘাড় কাৎ করলে ও। লখিন্দরও খুশী হয়ে উঠলো।

গীটারটা হাতে তুলে দিলো ও দময়ন্তীর। বললে, এসো, এখানে এসো।

আরো কাছে এসে বসলে। দময়ন্তীর কোলের ওপর রাখলে গীটারটা। তারপর ওর নরম হাত দু'খানা ছুঁয়ে দেখিয়ে দিলো কিভাবে বাজাতে হয়। আঙুলের কাঁটাগুলো খুলে খুলে পরিয়ে দিলে দময়ন্তীর নরম আঙুলের ডগায়। অদ্ভুত এক স্পর্শানুভূতিতে টলে উঠলো ওর মন। সামান্য একটু স্পর্শে এতখানি রোমাঞ্চ! লখিন্দরের হাতও যেন কেঁপে উঠলো। গীটারের কাঁটা নয়, এ যেন মন-দেয়া-নেয়ার অঙ্গুরী পরিয়ে দিলে ও দময়ন্তীর আঙুলে। গীটারের ভ্যাম্পে এক-একটা বেতালা টঙ্কার দেয় দময়ন্তী, আর হেসে লুটোপুটি খায়। বাঁ হাত চালাতে পারে না, প্রতি-বারই খসে পড়ে নিকেলের পাতটা। এত ভারী আর এত মসৃণ, হাতে থাকে কখনও! দময়ন্তী অনুযোগ করে। বলে, দু'হাত দু'রকম কাজ করে না। কেন করবে না? হেসে জিজ্ঞেস করে লখিন্দর। দময়ন্তী মাথা হেঁট করে লজ্জায়, দুটো মনের মানুষ তুমি, আমার মন এক দিকেই।

মুখে ওড়না চাপা দিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে দময়ন্তী।

—হাসছো কেন?

হাসি চেপে দময়ন্তী বলে, তুমি বিয়ে করো নি কেন, সুন্দর বৌ মেলে নি বুঝি?

লখিন্দর হেসে উত্তর দেয়, তোমার অপেক্ষাতেই তো আছি, তুমি রাজি হ'লে তবে তো।

লজ্জায় জড়িয়ে যায় দময়ন্তী, কথা পাল্টায়।—গান শোনাও একটা।

ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো ওরা দু'জন। দময়ন্তীর চোখ থেকে বিস্ময়ের দৃষ্টি দূর হ'ল। এলো অন্তরঙ্গ আবেশ। সকালে যখন সবুজ টিনের

চেয়ারে বসে লখিন্দর গান গায়, তখন আর আগের মত দূরে সরে থাকতে পারে না দময়ন্তী। কাছে এগিয়ে আসে, এসে দাঁড়ায় লখিন্দরের পাশে নয় তো পিছনে। মাথা নেড়ে-নেড়ে গান গায় লখিন্দর, গীটার বাজায়। আর মাঝে মাঝে হাসি ছড়ায় দময়ন্তীর শরম-নরম চোখে। দময়ন্তীও হাসে। গান থেমে যায় লখিন্দরের। কিশোর-কৌতুকে, কখনো অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকে দময়ন্তীর দিকে। লজ্জায় কান লাল হয়ে ওঠে দময়ন্তীর, আশ-পাশের লোকদের সশব্দ হাসি আরও লজ্জিত করে তোলে ওকে। উপায় খুঁজে পায় না ও, চাপা হাসির মুখে ঝুঁকে পড়ে লখিন্দরের পিঠের ওপর, নিজেই দু'-একটা টঙ্কার দেয় গীটারের তারে। বলে, থামলে কেন, বাজাও না।

মাথা নাড়ে লখিন্দর।—উঁহু। মন ভাল নেই ওর।

এমনিভাবেই দিন কাটছিল, দিন কাটতোও হয়তো।

বুড়ি ডিহিঙের সাঁকোর পাশে বালির বালিয়াড়িতে দেখা হয় ওদের।

লখিন্দরের সকালের কীর্তি স্মরণ করিয়ে দেয় দময়ন্তী। বলে, লজ্জা-শরম তোমার কি একেবারেই নেই?

লখিন্দর মাথা নাড়ে। না নেই। শুধু কি তাই, দময়ন্তীরই বা লাজলজ্জা থাকবে কেন ওর কাছে। দময়ন্তীকে কাছে টেনে নিলো লখিন্দর, ওর মুখের ওপর মুখ নামালে।

—লখিন্দর ভাই!

চমকে ফিরে তাকালো ওরা দু'জনেই। কিন্তু কুঞ্জ ততক্ষণে তর-তর করে দূরে সরে গেছে।

আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে যায় দু'জনের মুখ।

কুঞ্জ। কুঞ্জ কি প্রতিশোধ নিতে ছেড়ে দেবে। ওর চোখে একদিন আগুন দেখেছিল লখিন্দর, সে কামনার আগুন আজ প্রতিশোধের রূপ নিয়ে দেখা দেবে নিশ্চয়। দময়ন্তী যখন লজ্জায় দূরে-দূরে থাকতো, কিছুতেই কাছে এগিয়ে আসতে পারতো না, তখন এই কুঞ্জ এসে আদরে-আহ্লাদে গড়িয়ে পড়তো ওর গায়ে। ওর রুক্ষ চুল এলোমেলো করে দিয়েছে কুঞ্জ, কাঁধ-ঝাঁকানির কপট কৌতুকে দেহের স্পর্শ দিতে চেয়েছে, কানে-কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলতে এসে গালের পাশে গাল নামিয়ে এনেছে। তাই বড়ো ভয় ছিল লখিন্দরের, কুঞ্জকে ভয় পেত ও।

সে আশঙ্কা বুঝি সত্যি হ'ল।

পরের দিন, তার পরের দিন, তার পরের আরো অনেকগুলো দিন কেটে গেল। কিন্তু দময়ন্তীর দেখা পেল না লখিন্দর। ভোর না হ'তেই কিসের নেশায় টিনের চেয়ারটায় এসে বসে লখিন্দর, আশায়-আশায় পথ চেয়ে থাকে। কিন্তু দময়ন্তীর দেখা মেলে না।

কুঞ্জ অনুরোধ করে, গাও না লখিন্দর ভাই, গাও না একটা গান।

গান গায় না তবু লখিন্দর। শুধু জিজ্ঞেস করে, দময়ন্তী আসে না কেন কুঞ্জ?

খিল-খিল করে হেসে ওঠে ও। —দময়ন্তী! ঐ বাবুটার সঙ্গে পীরিত হয়েছে ওর। দময়ন্তী বলে।

মনে-মনে হাসে লখিন্দর। ভাবে, হিংসে হয়েছে কুঞ্জর।

কিন্তু মিথ্যে নয় ওর কথা, একেবারে মিথ্যে নয়।

কুঞ্জর কাছ থেকে সব শুনেছিল যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর বেজবড়ুয়ার কাছ থেকে শুনলো দময়ন্তীর মা জৈন্তা দেবী। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে দময়ন্তী, বেজবড়ুয়া-ঘরের মেয়ে। আর লখিন্দর, আব্রাহাম লখিন্দর পাদ্রীর জল নিয়েছে মাথায়, গির্জেতে গিয়ে ধর্ম বদলেছে। খৃীষ্টান ও। তা ছাড়া, কি আছে লখিন্দরের? না রূপ, না রূপো। জানে শুধু বাউল ভাটিয়ালদের মত গান গাইতে। তাও যদি যাত্রার পালা লেখার দিকে মন থাকতো, পেতো দু পয়সা। না, এ কখনো হতে পারে না। দময়ন্তীর মাকে সাবধান করে দিলো যজ্ঞেশ্বর; জৈন্তা দেবী সতর্ক করলেন মেয়েকে। মাধবের দোকানে যেতে পাবে না ও, শুনতে পাবে না লখিন্দরের গান।

দময়ন্তী হয়তো কাঁদলো; হয়তো লজ্জায় কুঁকড়ে গেল ও। কিন্তু দময়ন্তীর সহজ চোখে কামনার কাজল এঁকে দিয়েছিল লখিন্দর। ওর মেয়ে-মনকে জাগিয়ে দিয়েছিল নরম ছোঁয়ার মোহাবেশ। তাই, নিষেধ উপেক্ষা করে ছুটে আসতে চেয়েছে দময়ন্তী, ফিকির খুঁজেছে একটি বারের জন্যে, একটি মুহূর্তের জন্যে লখিন্দরকে কাছে পাবার আশায়। কিন্তু এতখানি পথ লুকিয়ে চলে আসা কি সম্ভব?

তবু সাহসে ভর করে এক নির্জন দুপুরে পথে বেরিয়ে পড়লো ও। আঁকা-বাঁকা লম্বা কাঁকরের রাস্তা চলে গেছে সিধে, মাধবের দোকান অবধি। শুধু বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে আরেকটা রাস্তা, বুড়ি ডিহিং-এর তীরের দিকে।

দ্রুত পায়ে তর-তর করে হেঁটে চলেছিল দময়ন্তী। এপাশে-ওপাশে চোরা চোখে তাকাতে তাকাতে। না, কেউ কোথাও নেই। এ দুপুর রোদে কে বেরুতে যাবে পথে, এক দময়ন্তী ছাড়া!

দ্রুত পায়ে হেঁটে যেতে-যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো দময়ন্তী, পিছনে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ শুনে।

সেই ছোকরাবাবু। বাইক থামিয়ে একটা পা মাটিতে ছুঁইয়ে কাৎ হয়ে দাঁড়ালো লোকটি। একেবারে দময়ন্তীর পাশে।

মুচকি হেসে বললে, কোথায় যাবি রে মেয়ে? চল পেঁাছে দেবো তোকে। কোথায় যাবি?

ভীতি-বিহ্বল বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকালে দময়ন্তী।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসলে লোকটি ওর ভয়-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার পর হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় ওকে কাছে টেনে আনলে। একেবারে বাইকের সামনে টেনে তুললে ওকে। ভয়ে-লজ্জায় থর-থর করে কাঁপছে তখন দময়ন্তী। অভিভূতের মত উঠে বসলো ও, কথা বলতে পারলো না।

—কোথায় যাবি? চল্ পেঁাছে দোব।

—মাধবের দোকান। কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে অস্ফুটে বললে দময়ন্তী।

মনে ভাবলে, ভালই তো, তাড়াতাড়ি পেঁৗছে যাবো। আর মনকে সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না তখন।

কিন্তু মাধবের দোকানে পেঁৗছতে পেল না দময়ন্তী। বাঁ দিকের রাস্তার বাঁক নিয়ে দ্রুতবেগে বাইকটা এসে থামলো নদীর পাড়ে। নামলো দময়ন্তী। লজ্জায় আর আশঙ্কায় ঠোঁট কাঁপছে তখন ওর থর-থর করে! অনুনয়ের আবেগে ভেঙে পড়লো ও, চোখ ঠেলে জল এলো। শুধু অস্ফুটে বললে, মাধবের দোকান, মাধবের দোকান যাবো।

ওর কথায় কানও দিলো না লোকটি। বাইকটা বালির ওপর ফেলে রেখে পকেট থেকে বের করলে কয়েক গাছা রঙিন কাচের জলচুড়ি। এক-খানা সবল সমর্থ হাতে দময়ন্তীর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে কাছে, বুকের একান্তে টেনে নিয়ে চুড়িগুলো পরিয়ে দিতে গেল।—না, না। দু'হাত নেড়ে শঙ্কিত প্রতিবাদ জানালে দময়ন্তী। হাত লেগে কয়েকটা চুড়ি ভেঙে গেল বুঝি বা। তবু ঘন আশ্লেষে কাছে টেনে এনে ওর চোখের কাছে মুখ নামিয়ে আনলে লোকটি।

ফিসফিস করে বললে, নাম কি তোর?

জবাব দিলো না দময়ন্তী, ঝড়ো পাখির মত পাখা ঝাপটালে ছাড়া পাবার আশায়।

লোকটি ফিসফিস করে ওর কানের পাশে বললে, এত সুন্দর মেয়ে তুই, আর পথে-পথে ঘুরে বেড়াস্ এখনো? তোকে রানী করবো আমি, বিয়ে করবো আমি তোকে, তুই আমার রানী হবি। কি নাম তোর?

—দময়ন্তী। আধো আধো স্বরে বললে ও।

—দময়ন্তী? বাঃ বেশ মিষ্টি নাম তো। আমি তোকে বিয়ে করবো, বুঝলি? তোকে নিয়ে যাবো আমাদের দেশে। অনেক বড়ো বাড়ি, অনেক জামা-কাপড় পাবি। গয়না দেবো সোনার। যাবি তো?

দময়ন্তী আবার পাখা ঝটপট করলে।

লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে কয়েকটা নির্ঘুম রাত কাটলো দময়ন্তীর। যে মন লখিন্দরের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল, সে মন আবার যেন পৃথক হয়ে যায়। লখিন্দরের কাছে যেতে পায় না ও, পথে বের হবার ভরসা পায় না। সেই একটি বিভ্রান্ত মুহূর্তের কথা মনে পড়ে যায়। সমস্ত দেহ শিউরে ওঠে, অশুচি মনে হয় নিজেকে।

তা ছাড়া, লোকটা এখনো মাঝে-মাঝে ঘুরে বেড়ায় ওদের বাড়ির আশে-পাশে। হাতছানি দিয়ে, কখনো বা চোখের ইশারায় ডাক দেয় দময়ন্তীকে। কপাটের আড়াল থেকে, জানালার ফাঁক থেকে দেখে সরে এসেছে দময়ন্তী। বাগানে গাছের চারায় ঝাঁঝরির জল ছিটোতে-ছিটোতে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে ঘরের ভেতর। ভয়ে-আশঙ্কায় থর-থর করে কেঁপেছে ওর নরম বুক।

রাত্রির গভীরতায়, নিঃশব্দ অন্ধকারে পড়ে-পড়ে কত দিন রোমাঞ্চ এসেছে ওর দেহে। একদিকে একটি ছোট গ্লানিময় ইতিহাস মনে পড়েছে, নিঃসহায় আত্মধিক্কারে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছে ওর। অন্যদিকে মনে পড়েছে, লখিন্দরের গানের সুর ভেসে এসেছে ওর কানে, গীটারের মিঠে বোল শুনেছে জাগর-স্বপ্নের অনুভূতিতে। উৎস্মাদন উত্তেজনায় শরীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে ওর, উষ্ণ রক্তের উত্তাপে জ্বালা ধরেছে ওর দেহের প্রতি অঙ্গে। অভিমানে আক্রোশে ফেটে পড়েছে ও লখিন্দরের ওপর। চোখের জল মুছে ভেবেছে, লখিন্দর কাপুরুষ, লখিন্দর ভীতু। ঐ ছোকরাবাবুর মত সাহসে ভর করে কেন এগিয়ে আসে না লখিন্দর, আচ্ছুরিতক আলিঙ্গনে কেন বুকে টেনে নেয় না ওকে।

বিহুপরবের দিন এগিয়ে আসছে তখন। দিন কয়েক পরেই শুরু হবে উৎসব। ঐ দূরের মাঠে ঘর তৈরি হচ্ছে। ও ঘর আগুনে জ্বলে উঠবে বিহুপরবের দিনে। আকাশ ছুঁয়ে দুলে উঠবে আগুনের শিখা। সমস্ত পল্লীটা গভীর নিশীথের অন্ধকারেও রাঙা হয়ে উঠবে আগুনের রক্তিমাভায়। আর সারা শহরের অহোম মেয়েপুরুষ নাচবে-গাইবে ঐ আগুনকে ঘিরে। হাততালি দিয়ে গান গাইবে, নাচবে। আর চক্র দেবে ঐ আগুনকে। দেহের প্রতিটি অঙ্গে লীলা-চপল যৌবনের ছন্দ বাজবে, নাচবে, প্রতিটি ভঙ্গীতে বাজবে কামনার নূপুর। সেদিন, সেদিন হয়তো দেখা হবে লখিন্দরের সঙ্গে। ওর গীটারের তারে বিহুপরবের সুর ঢালবার জন্যে হয়তো লখিন্দর আসবে। একান্তে মিলতে পাবে ওরা দুটি প্রাণী। কল্পনার কথালাপ আর দেহালাপের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায় দময়ন্তী। আনমনে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। একেবারে চাঁদ-ধোয়া বাগানের শীতলতায়।

ফর্সা আকাশ আর তারাদের ঝিকিমিকি। শুক্লাতিথির আলোয় অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ রাত; শুধু একটা ময়নার ডাক আসছে থেকে থেকে।

আব্রাহাম লখিন্দর। হঠাৎ মনে পড়ে গেল দময়ন্তীর, লখিন্দর খ্রীষ্টান। আশার বেলুনটা হঠাৎ যেন চুপসে গেল। তা হ'লে কি বিহু-পরবের দিনেও দেখা পাবে না লখিন্দরের। গান গাইতে দেবে না লখিন্দরকে? কে জানে।

দময়ন্তীর ইচ্ছে হল এই রাতে, এই অসতর্ক ঘুমের ফাঁকে ছুটে যায় ও। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লখিন্দরের বুকে। আনন্দে, হতাশায়।

হঠাৎ সামনের পথটার দিকে চোখ গেল ওর। কি একটা শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে গাছের নীচে দাঁড়ানো মূর্তিটার ওপর দৃষ্টি পড়লো। গাছের গুঁড়িতে বাইকটা ঠেস দিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাতছানি দিয়ে ডাকছে, প্রতিদিনের মতই।

কিন্তু। ভয়ে কেঁপে উঠলো দময়ন্তী। অথচ অদ্ভুত এক রোম-শিহরণ জেগে উঠলো ওর সারা দেহে। এই রাতের নিঃসঙ্গতায় বুঝি উপেক্ষা করা যায় না ও হাতছানি।

লোকটা কি যেন বলে উঠলো হঠাৎ।

নিজের অজান্তেই ঠোঁটের ওপর আঙুল চাপলে দময়ন্তী।—চুপ।

নতুন-আসা আপিসগুলো নেমে গেল ডিগবয়ে। নাগাদের দলও একে একে টিকক পাহাড়ের দিকে রওনা হ'ল। নতুন মুখ বাবুগুলোর দেখা মেলে না আর। জন-কল্লোলে জেগে-ওঠা মার্ঘেরিটা আবার যেন মিইয়ে পড়লো আগের মত।

জৈন্তা দেবী হঠাৎ একদিন বুঝতে পারলেন অনভিজ্ঞ-যৌবন মেয়ের জীবনে অভিশাপ নেমেছে।

ক্রোধে ফেটে পড়লেন জৈন্তা দেবী। যজ্ঞেশ্বর বুঝলো, বেজবড়ুয়া-বংশে কলঙ্কের কালিমা পড়েছে। কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পেলেন না জৈন্তা দেবী। নীরব নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলো দময়ন্তী, উদাস চোখ মেলে। ওর বড় বড় ব্যথা-কাতর চোখ বেয়ে শুধু ব্যর্থতার অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। কোন উত্তর দিতে পারলো না ও।

জৈন্তা দেবী তবু প্রশ্ন করেন, কে এ অভিশাপ আনলে। কার কাছে শিখেছিস এ পাপ?

দময়ন্তী নিরুত্তর। সব কথা যেন হারিয়ে গেছে।

কি বলবে ও, কি-ই বা বলবার আছে? শেষে জৈন্তা দেবী নিজেই উত্তর দিলেন, বুঝেছি, লখিন্দর! কুঞ্জ আগেই বলেছিল।

যজ্ঞেশ্বরও ভাবলো, লখিন্দরই বুঝি দায়ী!

মাধবের দোকানের আঙিনায় দাঁড়িয়েছিল লখিন্দর। মাটি-ঝলসানো দুপুর রোদে বাতাস কাঁপছে তখন। চোখে চিরিক লাগে। আঙিনার ঠাণ্ডা ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকিয়েছিল। শান্ত নির্জন দুপুর। শুধু ফটকের বাইরে পিঠে ছেলে নিয়ে বসে আছে নাগা মেয়েটা। আর উলঙ্গশরীর পুরুষটা বাঁশের চোঙায় চা নিয়ে কাঠি নেড়ে নেড়ে আফিং মেশাচ্ছে। সেদিকেই তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল ও।

হঠাৎ দেখলে, যজ্ঞেশ্বর আর পিছনে পিছনে কুঞ্জ এগিয়ে আসছে।

লখিন্দরের সামনে এসে দাঁড়ালো যজ্ঞেশ্বর। ক্রোধে ফেটে পড়লো না, কোন অনুনয়-বিনয় করলো না। শুধু গম্ভীর স্বরে বলল, দময়ন্তীকে বিয়ে করতে হবে তোমাকে।

বিস্মিত হয়েছিল লখিন্দর, তবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। অবোধ্য চোখে চেয়ে রইলো শুধু।

যজ্ঞেশ্বর চলে যাবার পরও কুঞ্জ দাঁড়িয়ে রইলো। বললে, না লখিন্দর ভাই। দময়ন্তীকে বিয়ে করো না.ও পাপে ডুবে আছে। সেই ছোকরাবাবুটা ওকে পাপ শিখিয়েছে।

লখিন্দর হাসলে, সে হাসির অর্থ বুঝতে পারলো না কুঞ্জ।

বুড়ি ডিহিং-এর জলের মত স্বচ্ছ মন ছিল দময়ন্তীর। বিয়ের পর সে মন ঘোলাটে হয়ে গেল। অনভিজ্ঞ কিশোর মন ওর, তার একদিকে ব্যর্থতা,

ভয়, হতাশা। আরেক দিকে অসীম লজ্জা। নিরুপায় দুর্বলতার আতঙ্ক। একটি কথাও বলতে পারলো না ও, প্রতিবাদ করে উঠতে পারলো না।

কুঞ্জ শুধু কানে কানে একবার জানিয়ে গেল, ভয় নেই। লখিন্দর মানুষটা নাকি বড় বোকা।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসেছিল কুঞ্জ, আর অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল দময়ন্তী।

বিয়ের পরেও সে দীর্ঘশ্বাস মুছে ফেলতে পারলো না ও। চোখের জল চাপতে পারলো না। আগের মত আর সহজভাবে হাসতে পারলো না, চোখের দৃষ্টিতে রইলো না সেই সারল্যের ছায়া। সব সময়েই একটা শঙ্কিত সন্ত্রাস। আশংকা আর লজ্জা। বুকে অসম্পূর্ণতার ব্যথা, আত্মধিক্কারের গ্লানি। লখিন্দরের সংগে এমন এক অবাধ মিলনের স্বপ্ন দেখেছে ও কতদিন.. কত না জাগর রাত ক্ষয়ে গেছে, চোখে কল্পনার রামধনু এঁকে। অথচ, আজ সেই স্বপ্ন-সার্থক মিলনের মাঝেও কি এক অনপসরণীয় বিভেদ, দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যেন হঠাৎ ওদের দুজনের মাঝখানে। ওদের দুজনকে দুই তীরে ছিটকে ফেলে রেখে মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বুড়ি ডিহিংএর জল। কৌতুকাশ্লেষের সব মুগ্ধ হাসি যেন বোবা হয়ে গেছে একটি সম্ভব-শিশুর কান্নায়।

দিনের পর দিন কেটে যায়, তবু সহজ হতে পারে না দময়ন্তী। লখিন্দর গান গায়, বোল ফোটায় গীটারের তারে। কিন্তু পুরোনো দিনের সে অনুভব, সে তন্ময়তা যেন হারিয়ে ফেলেছে দময়ন্তী। লখিন্দরের গানে ও শুধু বিরহের ব্যর্থতার সুর খুঁজে পায়। প্রতারণার, প্রবঞ্চনার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে যেন সে গানে। দয়িতার বঞ্চনায় ব্যথিত একটি আত্মা যেন অসহায় অবস্থায় ফেটে পড়ে। কে জানে এ সবই হয়তো দময়ন্তীর কল্পনায় গড়া, অনুশোচনার আত্মনিপীড়ন।

তবু। তবু বড়ো অশান্ত হয়ে ওঠে দময়ন্তী। শীতল শয্যার স্পর্শেও দেহের জ্বালা মুছে ফেলতে পারে না। নিস্তব্ধ নিশীথে লখিন্দরের ঘুম-ভাঙা অকস্মাৎ সংবাহনে ভয়ে আশংকায় শিউরে ওঠে দময়ন্তী, রোমে রোমাঞ্চ জাগে না।

দিনের পর দিন শুধু একটিমাত্র চিন্তা হিংস্র ভীমরুলের মত ওর চার-পাশে ঘুরে বেড়ায়, যে কোন মুহূর্তে বুঝি হুল ফোটাবার জন্যে উন্মুখ।

হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেল দময়ন্তীর। কি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে। সারা শরীর ওর ঘামে ভিজে গেছে। গলা শুকিয়ে গেছে তৃষ্ণায়। বিছানার ওপরই উঠে বসলো ও, বিছানা থেকে নামলো। হ্যাঁ, লখিন্দর ঘুমিয়ে আছে, নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে। শান্তিতে, স্বস্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর মুখখানা। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে দময়ন্তী। একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখের ওপর।

এই জ্যোৎস্না-ভেজা নিস্তব্ধ রাতেই সব প্রতারণা, সব প্রবঞ্চনা শেষ হয়ে যাক্। সমগ্র শরীরে আগুন জ্বলে উঠলো দময়ন্তীর। এ-আগুন বুঝি

বুড়ি ডিহিং-এর জল ছাড়া আর কেউ নেভাতে পারবে না।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল দময়ন্তী। একেবারে পথের মাঝে। বুড়ি ডিহিংএর তীরের দিকে, নতুন বাঁধা সাঁকোটার দিকে পা বাড়ালো ও।

কিন্তু! লখিন্দরের হয়তো ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

দ্রুত অপসৃয়মান দময়ন্তীর ছায়াশরীরটা দেখতে পেল লখিন্দর।

রাতের আকাশে তখন স্পষ্ট চাঁদ, তারার জোনাকি। নির্জন নিস্তব্ধ পথ। বেরিয়ে এলো লখিন্দর। বিস্ময়ে অনুসন্ধিৎসায় দ্রুত পায়ে অনুসরণ করলে ও দময়ন্তীর।

বুড়ি ডিহিং-এর জলে পা ছুঁইয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো দময়ন্তী। কিন্তু। বড়ো ভয় হয়। মায়া হয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি অনাগত শিশুর হাসি-হাসি মুখ। নিবিড় করে বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে হয়, সোহাগ-মধুর মাতৃত্বের আলিঙ্গনে।

না।

দ্রুত পায়ে সাঁকোটার ওপর উঠলো ও। এখানে-ওখানে জ্যোৎস্নার প্রলেপ মাখানো ধোঁয়াটে টিলা আর পাহাড়ের চূড়া। দূরে দূরে দু-একটা গাছ আর পাতার জানালা। রুপোর পাতের মত নিথর নিস্পন্দ বুড়ি ডিহিংএর জল, মাছের আঁশের মত চিক চিক করছে শিশু-তরঙ্গের সারি। আর নদীর বুকে শীর্ণ সাঁকোর কাঁচুলি।

তরতর করে সাঁকোর ওপর উঠে গেল দময়ন্তী। নীচে তাকিয়ে দেখলে। নীচে, অনেক নীচে বুড়ি ডিহিং-এর জলস্রোত। কালো আর ঠান্ডা।

না, মিথ্যে মাতৃত্বের লোভে প্রবঞ্চনার জাল বুনবে না ও।

চোখ বুজে লাফিয়ে পড়লো দময়ন্তী।

তাই কি? না। লখিন্দরের সমর্থ বাহু তার আগে ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকালো ও লখিন্দরের মুখের দিকে। মৃদু মৃদু হাসি লখিন্দরের মুখে।

—মা হয়ে সন্তানকে মেরে ফেলতে চাও, দময়ন্তী?

—না, না। বাঁচতে চাই না আমি, বাঁচাতে চাই না আমি ওকে। কান্নায় ভেঙে পড়লো দময়ন্তী।

ওদের দুজনের মাঝে এ মিথ্যার প্রাচীর রাখতে চায় না ও। এ ব্যবধান দূরে সরিয়ে রেখেছে ওকে, লখিন্দরের কাছ থেকে।

দময়ন্তীর জলে-ভাসা মুখের দিকে তাকালো লখিন্দর। আরো ঘনিষ্ঠ করে বুকের কাছে টেনে নিলো ওকে। প্রাচীর! ব্যবধান।

হাসলে লখিন্দর। আলতোভাবে ওর চিবুক তুলে ধরলে লখিন্দর ওর মুখের কাছে। বললে, এপার আর ওপার মিলিয়ে দিতো কে, সাঁকো না থাকলে? বেজবড়ুয়াদের মেয়ে তুমি, এমন রূপ তোমার! আর আমি? কি আছে আমার? না রূপ, না রুপো। তবে? কে মিলিয়ে দিতো আমাদের?

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালো দময়ন্তী। তারপর শ্রান্তিতে, শান্তিতে লখিন্দরের বুকে মুখ লুকোলে।

ম দি রে ক্ষ ণা

বাঙালীর ঘরে মেয়ের নাম সীতা! এ দুঃসাহসের জবাব দেবার জন্যই যেন সীতা মল্লিকের অভিশপ্ত জীবন।

অথচ ওর চোখের হাসি, ঠোঁটের কৌতুক দেখে কোনদিন সন্দেহ হয় নি, এ হাসি হাসি নয়, এ কৌতুক করুণাশ্রিত।

সীতাকে প্রথম যেদিন দেখলাম, সেদিন সীতাকে আমি দেখিনি। ওর কাকা ছিলেন আমাদের আপিসের জর্দাদা। বড়বাবু থেকে বেয়ারাটা অবধি সবাই ডাকতো ঐ নামে। বয়সে বেশী নয়, দেখাতো পঁয়ত্রিশের ডবল। পাঁচ বছর কেরানীগিরি করার পর সকলের ক্ষেত্রেই যেমন বয়সটা রাতারাতি ডবল হয়ে যায়। গলাবন্ধ একটা কোট পরতেন, যে-কোটটার দিকে চোখ পড়লেই যে-কেউ তাঁর পায়ের দিকে তাকাতো এবং পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো জোড়া দেখতে পেলেই মাথার উত্তর মেরুতে কি যেন খুঁজতো। অর্থাৎ টিকি। শুধু টিকিই নয়, বগলে ছাতাও থাকতো না তাঁর। হিসেব কষে বুঝিয়ে দিতেন তিন দিন জলে ভিজে জ্বর হওয়া এ বাজারে ছাতা হারানোর তুলনায় রীতিমত মিতব্যয়িতা। ছাতা ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক না হলেও পানের কৌটো ভুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। পানের কৌটোর চেয়েও কিন্তু জর্দার কৌটোটার ওপরই বেশী দৃষ্টি থাকতো তাঁর। বলতেন, জীবনে একটাই তো বিলাস, এই জর্দা। দামী না হোক, খুঁজে বেছে ভাল কাশীর জর্দা জোগাড় করতেন তিনি, আর আপিসের যে-কোন লোক, বেয়ারা থেকে বড়বাবু, এসে পান চাইতো তাঁর কাছে, জর্দাও। বলতো, সত্যি এমন জর্দা কিন্তু খাইনি কখনো, আর এমন পান সাজতেও পারে না আমাদের গিন্নীরা। জর্দাদা খুশী হতেন, লাল লাল দাঁতের পাশ দিয়ে হাসি দেখা দিতো আত্মতৃপ্তির। যারা পান জর্দা ছুঁতো না, তারাও এসে হাত পাততো তাঁর কাছে, আর জানালা গলিয়ে সেগুলো লুকিয়ে ফেলে দিয়ে এসেও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'তো। হেসে গলে পড়তেন জর্দাদা,বলতেন, 'ঠিক আছে, স্যালারি বিলটা আমি চেক করে দোব, ইস্টবেঙ্গলকে দু'গোল ঠুসিয়ে দিয়ে এসো।' কিংবা, 'সতেরোর লেজারটায় ফাইন্যাল ফিগার্সগুলো তো? ঠিক আছে, যাও তিনটের মধ্যে না গেলে সেবাসদনে পেঁছতে পারবে না।' অর্থাৎ পান আর জর্দার প্রশংসা করে জর্দাদাকে সন্তুষ্ট করতো সবাই। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম আমরা, জর্দাদা তো নয় জ্বরদাদা। জ্বরজারি যাই হোক না কেন, বাঁচাবার জন্যে একটিই দাদা আমাদের।

এই জর্দাদার সঙ্গে একদিন এলাম তাঁর বাড়িতে। আর, তাঁর বাড়িতে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবলাম না, কোলকাতা শহরে এমন একটা বাড়ি থাকতে পারে।

জর্দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সীতা মল্লিক অনেক পিছিয়ে গেছে। কপাটের আড়ালে চলে গেছে সীতা, হয়তো বা স্মৃতিরও। এরপর যদি জর্দাদার বাড়িটার বর্ণনা দিতে বসি তা হ'লে হয়তো সীতার মত মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করার ইচ্ছে হবে না। আর কী আশ্চর্য, সীতার মত মেয়েকে দু'চোখ মেলে না দেখলে মনে হয় কিছুই যেন দেখা হল না এ পৃথিবীর। দু'একটা কথালাপ, তারও যদি সুযোগ না জোটে, তা হ'লে মনে হবে সংসার-মন্থনে শুধু গরল উঠলো।

কিন্তু সীতা মল্লিককে দেখতে হলে জর্দাদার বাড়িটাও দেখতে হবে। কারণ, জর্দাদার বাড়ির মত বাড়ি না থাকলে সীতা মল্লিকের মত মেয়ের খোঁজ মিলতো না।

শ্যামবাজারের ট্রাম লাইনের কোন একটা স্টপেজে নেমে ডান দিকের একটা রাস্তা ধরে, এবং তারপর অনেকগুলো অলিগলি পার হয়ে দু'পাশে নতুন দু'খানা চারতলা বাড়ির মাঝখানে যে পুরোনো একতলা বাড়িখানা—সেটাই জর্দাদার।

জর্দাদার বাড়ি বলতে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ভাবার কারণ নেই। ও বাড়ির একটা অংশের ভাড়াটে তিনি, বাসিন্দে। অর্থাৎ পশ্চিমের অংশটা জর্দাদার বাসা। কিন্তু বাসা আর বাড়ি শব্দ দুটোর পার্থক্য এমনিতেই অনেকে বোঝেন না, তার ওপর ও পাড়ায় জর্দাদার বাড়ি এতই লোকবিখ্যাত যে হঠাৎ যদি কাউকে জর্দাদা না বলে তাঁর পিতৃদত্ত নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন, ভদ্রলোকের বাসা কোনটা, তা হ'লে বিমূঢ় দেখাবে লোকটিকে। আর 'জর্দাদার বাড়ি' বলুন, যুধিষ্ঠিরের পথ-প্রদর্শকের মত মাটির গন্ধ শুঁকে নির্দেশ দিয়ে দেবে গন্তব্যের।

কোলকাতা শহরেরই একটি গলির ওপর জর্দাদার বাড়ি। এক নাগাড়ে তিরিশ বছর, অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়েস থেকে এ বাড়িতে বাস জর্দাদার। সুতরাং শুধু বর্তমানটাই নয়, অতীতটাও বিংশ শতাব্দীতে পড়ে। কিন্তু জর্দাদার বাড়ির ভেতর ঢুকলে মনে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে এলাম। দেয়ালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবিটা না থাকলে কোনক্রমেই অষ্টাদশ শতাব্দীর পর এক পাও বাড়ানো যেত না।

শুধু শতাব্দীই নয়, শহরটা ভুলতে হয় এ বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে। বাইরে থেকে এতখানি পচা-ধ্বসা মনে হয় না, কিন্তু সদর আর খিড়কির এই পার্থক্য দেখে হঠাৎ আঁৎকে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

একতলা একখানা ছোট বাড়ি। সদরের দেয়ালে খড়ি দিয়ে কত কি লেখা। কতগুলো বেশ স্পষ্টই পড়া যায়, হাসি পায়, আর কয়েকটা পড়া গেলেও পড়া যায় না। পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড।

জর্দাদার একতলা বাড়ির ছাদে ওঠবার একটা সিঁড়ি আছে, ভাঙা নড়বড়ে একটা চতুর্দিক খোলা কাঠের সিঁড়ি। মই বললে নেহাৎ বাঁশ বোঝায়, তাই সিঁড়ি বলতে হয়। সিঁড়িটার কিন্তু প্রয়োজন অনেকখানি। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য যে কোন সময়ে অতিথি-বন্ধুর আগমন ঘটলে তাকে সরাসরি ছাদে নিয়ে গিয়ে বসান জর্দাদা। শুধু ছাদে কেন, সামনেই রাস্তা পড়ার দরুণ ঘরের

ভেতরও বেশ হাওয়া আর আলো পাওয়া যায় তাঁর বাড়িতে।

বাড়িতে আলো হাওয়ার বিশেষণ দুটো আছে বলেই যে জর্দাদার বাড়িটা কোলকাতা শহরের বাইরে মনে হয়, বা শতাব্দীটা ঊনবিংশ বলে ভুল করতে হয়, তা নয়।

আসলে কোলকাতা শহরে বোধ হয় এই একখানাই বাড়ি, যে বাড়িতে কলের জল ঢোকে না, ইলেকট্রিকের আলো নেই, রোগ শয্যায় পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাৎরায় না একজনও। এ বাড়িই জর্দাদার বাড়ি! এ বাড়িতেই সীতা মল্লিকের মত মেয়ে থাকতে পারে।

জর্দাদার সঙ্গে গল্প করতে করতে যখন তাঁর বড়িতে এসে পেঁছিলাম, তখন গলির মোড়ে গ্যাসবাতিটা জ্বলে উঠেছে, আবছা আবছা অন্ধকার চারপাশে, চারতলা নতুন বাড়ির জানালায় ধরা-বয়সের বৌ আয়নায় দাঁড়িয়ে খোঁপার বেণী বাঁধছে, যে বেণীর দাঁতে চাপা কালো ফিতে গালের ওপর চেপে বসেছে কানের নীচে থেকে ঠোঁট অবধি, যে বৌয়ের চোখ হাসছে এপাশে ওপাশে, একতলা বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো সীতা মল্লিকের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু তখন জানতাম না ওটাই জর্দাদার বাড়ি, জানতাম না যে ও বাড়িতে সীতা মল্লিকের মত মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে না-কার্নিস একতলার ছাদে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে, ভয়ে ভয়ে, ধীর পায়ে অনুসরণ করছিলাম জর্দাদাকে, কিন্তু জর্দাদা এতটুকু টলে পড়লেন না, এতটুকু সাবধানে পা ফেললেন না। যত অন্ধকারই হোক, এ পথ যেন তাঁর নিজের পথ।

কপাটের কড়া নাড়লেন জর্দাদা। খুটখাট কি সব শব্দ হ'ল। কে যেন এগিয়ে এলো কপাটের কাছে। কোন প্রশ্ন করলো না, কোন কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। শুধু খুট করে খিলটা খুলে দিয়ে একটি শাড়ির বিদ্যুৎ সামান্য পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। আড়চোখে আমি তাকালাম একবার তার দিকে, কিন্তু আবছা একখানা শাড়ি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

বুঝলাম, আলো নিয়ে আসা, আলো দেখানো এ বাড়ির রেওয়াজ নয়। যে যার নিজের নিজের পথ চিনে নেয়। আমার দুর্দশাটা হয়তো জর্দাদার চোখে পড়লো হঠাৎ। বললেন, লণ্ঠনটা নিয়ে আয়।

মেয়েটি এগিয়ে গেল একটু, আর সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সামান্য এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় একটা কুয়ো থেকে জল তুলছেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা। কুয়োর ধারে টিমটিম করে জ্বলছে একটা হারিকেন লণ্ঠন।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ফিরে এলো মেয়েটি, আর সেই সুযোগে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম একটি করুণ কালো বিষণ্ণ মুখের ম্লানিমা।

লণ্ঠন হাতে দুলিয়ে আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মেয়েটি। হঠাৎ মাঝপথে একবার থমকে দাঁড়ালো। বললে, মেঘ উঠেছে। জর্দাদা একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ। এর পরের কথাগুলো বোধ হয় অপ্রয়োজনীয় বলেই কেউ কোন কথা বললো না। মেয়েটি একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে ঢুকলো; ঢুকতে বললো যেন আমাকে আলোর ইশারায়। টুলের ওপর নামিয়ে রাখলো লণ্ঠনটা। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। জর্দাদার মত মানুষ না থাকলে এমন বাড়িও থাকতো না, আর জর্দাদার বাড়ির মত বাড়ি না থাকলে এমন কালো করুণ ম্লান মুখের পরিচয় পেতাম

না কোনদিন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, জর্দাদার বাড়িতে এমন একটি মেয়ে না থাকলে সীতা মল্লিকের মত মেয়ের খোঁজ পাওয়া যেত না।

লণ্ঠনটি টুলের ওপর রেখে মেয়েটি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন বুঝতে পারলাম, ঘরে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। জর্দাদা আমার পিছন থেকে কখন সরে পড়েছেন। বুঝলাম, যতক্ষণ না জর্দাদা ফিরে আসছেন, সম্ভবত হাত-পা ধুয়ে, ততক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতে হবে। কারণ, ঘরের মেঝেটা পরিষ্কার তকতক করলেও মেঝের ওপরে বসে পড়া চলে না। অথচ বসবার মত কোন কিছুই খুঁজে পেলাম না ঘরে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটার তল্লাশ নিলাম। একদিকের দেয়ালে দেখলাম ক্যালেণ্ডার-কাটা মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবি, আর একদিকের ফটোয় একটি বৃদ্ধের মৃতদেহ ঘিরে অনেকগুলি নারীপুরুষের মুখ। এক কোণের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি, আর এক কোণে একরাশ বিছানা স্তূপ করা। শাড়ির পাড় জুড়ে বানানো আচ্ছাদন তোরঙ্গের ওপর।

জর্দাদার বাড়ির মত বাড়ি না থাকলে এমন একখানা ঘরের পরিচয় পেতাম না কোনদিন, আর এমন একখানা ঘরের পরিচয় না পেলে সীতা মল্লিকের মত মেয়ের দেখা পেতাম কি করে!

ঘরখানার চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে আনতে দু'মিনিটও হয়তো যায় নি, হঠাৎ কপাট খোলার শব্দ হ'ল। জর্দাদা গামছায় হাত-পা মুছতে মুছতে ঢুকলেন, আর তাঁর পিছনে পিছনে আবার সেই শাড়ির বিদ্যুৎ। কিন্তু বেশ বুঝলাম, এ শাড়ি সেই আগের শাড়ি নয়, এ বিদ্যুৎ হিরণ্য-উজ্জ্বল।

মেয়েটি ঘরে এলো একটি মাদুর হাতে নিয়ে, একপাশে মাদুরটা বিছিয়ে দিলো, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। ইচ্ছে থাকলেও তার মুখের দিকে তাকাতে ভুলে গেলাম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম মাদুরের ওপর, আর ভাবলাম সীতা মল্লিক নিশ্চয়ই আবার আসবে।

সীতা মল্লিক আসবে, এ-কথা অবশ্য ভাবিনি। কিন্তু তার মুখের দিকে না তাকিয়েও মনে হয়েছিল, এমন মেয়ে এক জর্দাদার বাড়িতেই থাকতে পারে। আর এমন মেয়ে এক সীতা মল্লিকই হ'তে পারে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, উদগ্রীব হয়ে রইলাম, কিন্তু দেখা পেলাম না আর।

বাধ্য হয়েই জর্দাদার বাড়িতে আবার আসতে হ'ল।

দ্বিতীয় দিনে সীতাকে খুব স্পষ্ট চোখে দেখলাম। দুটো কাঁসার গ্লাসে করে চা দিয়ে গেল ও, থালায় মুড়ি আর লঙ্কা। চোখ তুলে সেদিনই আমি প্রথম দেখলাম। দেখলাম অদ্ভুত সুন্দর একখানি মুখের করুণিমা। অথচ সারা দেহে যৌবনজোয়ার। চোখের তারা হরিণের চোখের মত কালো, শিশুর মত কৌতুকে উচ্ছল। কিন্তু কোথায় যেন ব্যথাতুর।

জর্দাদা বললেন, এই সীতা। বললেন সীতা চলে যাবার পর।

বললাম, নামটা যেন মুখের ওপরই লেখা রয়েছে! কে হয় আপনার?

—সীতা মল্লিক। কাকা বলে আমাকে, হয় না কেউ।

ব্যস্। চুপচাপ। আর কোন কথা বললেন না জর্দাদা। আর আমার মনে হ'ল কোন কথা বলার প্রয়োজনও নেই।

কিন্তু সীতার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলাম আমি। মনে হ'ল, সীতার মত মেয়ের পরিচয় না পেলে, সীতার মত মেয়েকে না দেখলে জীবন ব্যর্থ হতে পারে, আর সীতার মত মেয়েকে দেখা পেয়েও কথা বলতে না পেলে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

সুতরাং জর্দাদার বাড়িতে ঘন ঘন আসতে শুরু করলাম আমি। আর এই ঘন ঘন আসার ফলে সীতার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠও হয়ে উঠলাম। বুঝলাম, সীতাকে না দেখে যেমন আমি অধৈর্য হয়ে উঠি, তেমনি সীতাও।

জর্দাদার বাড়িতে ছিল মান্ধাতা আমলের একখানা পুরোনো গ্রামোফোন। আমি পিন কিনে আনতাম, আর নতুন নতুন রেকর্ড। সীতাও রবিবারের দিন গুনতো।

জর্দাদাকে বলতাম কখনোসখনো।—সত্যি মেয়েটিকে আমার বেশ লাগে।

—মায়া হয়। জর্দাদা বলতেন। কিন্তু আর কিছু বলতেন না।

সীতা খুব ভাল উল বুনতে পারতো। উল কিনে আনতাম আমি কখনোসখনো। উল কেনার পয়সাটা যে কত চেষ্টায় বাঁচাতে হ'ত, তা জানতো না সীতা। আমার জন্যে একটা নতুন সোয়েটার বোনাতেই ওর আনন্দ।

জর্দাদাকে বলতাম, সত্যি, সীতার মত এমন তাড়াতাড়ি উল বুনতে দেখিনি কাউকে।

—কোন গুণই তো কাজে লাগলো না। দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন জর্দাদা।

কিন্তু আর কিছু বলতেন না।

কিছু বলতেন না, কিছু বুঝতেনও না জর্দাদা। কিন্তু জর্দাদার ছোট বোন মালতী, সেই প্রথম দিন যে কপাট খুলে লণ্ঠন দেখিয়ে এসেছিল ঘর অবধি, সে বুঝতো সবই, বলতোও। অবশ্য জর্দাদার অনুপস্থিতিতে।

মালতী মুখ ফুটে যত না বলতো তার চেয়ে হাসতো বেশী, আর ওর হাসি এমন অনেক কথা বলতো, যে-কথা মুখ ফুটে বলা চলে না। কোন এক রবিবারে হয়তো বিশেষ কোন কাজে আটকে পড়ে গেলাম, সকালে কিংবা দুপুরে, আর গিয়ে শুনলাম জর্দাদা বাজারে বেরিয়ে গেছেন অথবা থিয়েটারে, দেখতে নয়, রিহার্সালে এবং আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন। অপেক্ষা করার তাগিদটা যত না জর্দাদার তার চেয়ে ঢের বেশী আমার, যত না আমার তার চেয়ে ঢের বেশী সীতা মল্লিকের মত মেয়ের, আর যত না সীতার, তার চেয়ে অনেক বেশী তাগিদ মনে হ'ত মালতীর।

হাসিতে শরীরটাকে দোপাটির ঝাড় বানিয়ে, কৌতুকহিল্লোলে রজনী-গন্ধা, মালতী এসে মাদুর বিছিয়ে বসতে বলতো। পাতা ওল্টাবার জন্যে এনে দিতো বইপত্র, সারাক্ষণ পাশের ঘরে ঠুং ঠাং আওয়াজ করে সান্ত্বনা জানাতো, বসুন চা হচ্ছে। কিন্তু একবারও ও আসতো না এই সময়টায়, কারণ এ সময় ছিল সীতা মল্লিকের সময়।

সীতা আসতো, নেহাৎ যেন কাজের আহ্বানে, ঘরের এদিকে ওদিকে কি যেন খুঁজতো, ঝিনুক নয়তো চিরুনি, কিছু একটা খুঁজতেই এসেছে যেন, তারপর বিছানার স্তূপগুলো খোঁজাখুঁজি করতো, শাড়ির পাড় দিয়ে

বানানো ট্রাঙ্কের ঢাকাটা খুলতো আর লাগাতো এবং হঠাৎ এক সময় একটা কোন কথা বলে ফেলতো আমার উদ্দেশে। সারা ঘরখানা তন্ন তন্ন ক'রে সীতা কি খুঁজছিল তা জানতে বাকী থাকে না আমার, বুঝতে পারি, কথা খুঁজে পাওয়া কত শক্ত ওর পক্ষে। দয়ার শরীর আমার, বিশেষ করে সীতার জন্যে আমার করুণার সীমা নেই। আমি তাই কোন কোনদিন নিজেই কথা ধরিয়ে দিতাম, আর কখনো বা এম্‌ব্রয়ডারি করা এক টুকরো কাপড় এনে সীতা দেখাতো আমাকে, বলতো, কেমন হয়েছে বলুন। আবার কখনো হয়তো সাদা এক টুকরো কাপড় আর পেন্সিল এনে বলতো, একটা কিছু ডিজাইন এঁকে দিন, এম্‌ব্রয়ডারির ডিজাইন নেই আমার কাছে। পেন্সিল আর কাপড় নিয়ে শুরু হ'ত আমার কসরত। শেষ অবধি কিছুই আঁকা হ'ত না, অর্থাৎ যা আঁকা হ'ত তা আর সুতো খরচ ক'রে নক্সা করার যোগ্য নয়। তাই কাপড়টা চেয়ে আনতাম আমি, বলতাম, 'বাড়িতে বসে বসে আঁকবো ভালো করে এবং কাল জর্দাদাকে দিয়ে দেবো আপিসে।' শুধু আমি কেন, সীতাও জানতো শেষ অবধি আঁকা হবে না, তবু অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চলতো, হিজিবিজি পেন্সিলের দাগ পড়তো কাপড়ের ওপর।

আমার বাড়ির পাশেই থাকতো একজন আর্টিস্ট বন্ধু, কালীঘাট পার্কের ওপারে সতীশ মুখুজ্যে সড়কে। তাকে না পেলে ঢাকুরিয়ার লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত চলে যেতাম, প্রহ্লাদ কেবিনের দোতলায়। যেদিন ভাগ্য অপ্রসন্ন, দু'জনই নিখোঁজ, সেদিন যেতে হ'ত ডি জে কীমারে চাকরি-করা অন্য এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছে। শেষ অবধি যেমন করে হোক ডিজাইনটা আঁকিয়ে এনে নিজের বলে চালিয়ে দিতাম সীতা মল্লিকের কাছে।

তা সত্ত্বেও সীতার সামনেই যে আধঘণ্টা ধরে কসরত চলতো, কসরত চালাতাম, আর শেষ অবধি কিছুই আঁকা হবে না জেনেও যে সীতা জিদ ধরতো ওর সামনেই আঁকতে হবে, তার কারণ, এছাড়া আমাদের পরস্পরের পাশাপাশি বসার, কাছাকাছি কথা বলার, হঠাৎ হেসে উঠে পরস্পরকে ছোঁয়াছুঁয়ির আর কোন পথ ছিল না। ইচ্ছে করলেই পথ করে নেওয়া যেত, কিন্তু পথ করে নেওয়ার দিকে মন যায়নি কোনদিন।

আমার কাছে সীতা যে মালতী নয়, এ-কথা যেমন প্রকাশ করতাম না কোনভাবে, তেমনি আমি আর জর্দাদা দু'জনে ভিন্ন ব্যক্তি সীতার হাবভাব ব্যবহার তা যেন স্বীকার করতো না।

তবু আমি মনে মনে ঠিকই বুঝতাম সীতা মল্লিক আমার চোখে সীতাই, মালতী নয়। আর, ওর চোখ প্রকাশ না করলেও, মন নিশ্চয় বুঝিয়ে দিতো ওর চোখকে যে আমি জর্দাদা নই।

আর একজন বুঝিয়ে দিতো আমাদের সম্পর্ক। যতটা না কথায়, হাসিতে তার চেয়ে অনেক বেশি। গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগাবার সময় মালতী একেবারে গা ঘেঁষে বসতো আমার, আর আড় চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসতো। বুঝতে পারতাম ও কেন এত গা ঘেঁষে বসতে চায়। অর্থাৎ ও এত কাছাকাছি না বসলে, সীতা কাছে আসতে পারে না, মালতীর গা ঘেঁষে বসার ফলে সীতার সঙ্গে হাত ছোঁয়াছুঁয়িটা নির্লজ্জ দেখায় না।

তারপর মালতী হঠাৎ একসময় উঠে সামনে গিয়ে বসতো, আর সীতার

কাঁধ যেখানে আমার বাহুমূল স্পর্শ করেছে সেদিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে বলতো. 'সীতাদি, সরে বসো না একটু।' সীতা শুনতো, মালতীর মুখের হাসিতে বুঝতো এ সাবধানী শুধুই দুষ্টুমিতে ভরা, তবু এই স্পষ্ট কথার লজ্জায় সীতার পিঠ বেঁকে যেতো ধনুকের মত, মাথা এসে ঠেকতে চাইতো মাটিতে।

এমনিভাবে দিন কাটছিলো. কিন্তু তারপর এমন দিন এলো তখন আর দিন কাটতে চায় না। অনেক ভাবলাম, অনেক দিন ধরে ভাবলাম, কিন্তু কূলকিনারা পেলাম না খুঁজে।

শেষে জর্দাদাকে বললাম, সীতার বিয়ে দেবেন না জর্দাদা?

জর্দাদা চমকে চোখ তুললেন। তারপর চোখ ছল ছল করলো জর্দাদার, দীর্ঘশ্বাসে ম্লান হলেন।

—কপালপোড়া মেয়ে। দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বললেন জর্দাদা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার জর্দাদা। যদি আপত্তি না থাকে—

জর্দাদা বললেন. কি আর আপত্তি থাকবে! ওর জীবন শেষ করেই এসেছে ও আমার কাছে। বেচারী!

বললাম. সে কি? সীতা বিধবা?

—না রে ভাই। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জর্দাদা। বললেন. তার চেয়েও বেশী। মেয়েটার কথা ভাবলে বড় কষ্ট হয়. বিধবা হ'লেও তো খানিকটা শান্তি পায় হতভাগী।

আমি অপেক্ষা করলাম। ভাবলাম. সীতার করুণ ইতিহাসের কিছুটা অন্তত বলবেন জর্দাদা। কিন্তু জর্দাদা কিছুই বললেন না। বললেন, 'থাক্। কি হবে ওসব শুনে। শুধু ব্যথা পাবে. দুঃখ হবে ওর জন্যে।' বলে চুপ করে রইলেন।

চুপ করে রইলেন এবং আর কোনদিন কোন উল্লেখ করলেন না সীতার সম্বন্ধে। আমিও আর সীতাকে চিনতে পারলাম না. জানতে পারলাম না সীতা মল্লিকের মত মেয়ের মুখে এমন করুণ বিষণ্ণ ছায়া পড়ে কেন? আর অমন ব্যথা-ছম্-ছম্ সজল চোখে কেনই বা মদির মুগ্ধ দৃষ্টির ঝলসানি দেখা যায় আমার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে।

শুধু এইটুকুই জানলাম. জর্দাদার বাড়ির মত বাড়ি এই কোলকাতা শহরেই থাকতে পারে. যে বাড়িতে সীতা মল্লিকের মত মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায়. যে মেয়ের দু'চোখে শুধুই জল. কিন্তু তবু মনে সবুজ পাতা ধরতে চায়। আর কি আশ্চর্য. জর্দাদার বাড়ির মত বাড়ি না দেখলে মালতীর মত মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায় না. আর মালতীর মত মেয়ের খোঁজ না পেলে জানা যায় না সীতা মল্লিকের মত মেয়ে থাকতে পারে. আর সীতার মত মেয়েকে দু'চোখ মেলে না দেখলে মনে হয় কিছুই যেন দেখা হ'ল না এ পৃথিবীর. আর দু'চোখ ভরে দেখার পর সীতার মত মেয়ের সঙ্গে দু'এক টুকরো কথা না বললে মনে হয় কথার নেই প্রয়োজন. আর কথা বলতে পেয়েও কথার মত কথা বলতে না পেলে মনে হয় জীবনই দুঃসহ।

জ ল র ঙ

মুন্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণিকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, কপাল-কুন্ডলার কথা মনে পড়েছিল। আর ঝর্ণাটা দূর থেকে মনে হয়েছিল, শাল আর শালাই গাছে আড়াল-পড়া কোন পার্বত্য মন্দিরের চূড়ায় রূপোর পাত মোড়া রয়েছে।

ঝর্ণার জলস্রোত, পাথরের গায়ে বাধা পেয়ে যেখান থেকে উছলে পড়ছে, শুধু সেইটুকুই ভোরের সূর্যকিরণে চকচক করছিল পালিশ করা রূপোর গম্বুজের মত, বাকী গতিপথটা ঢাকা পড়েছিল শাল আর শালাই গাছের আড়ালে।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথের দুধারে সাজানো শালের সারিকে দূর থেকে মনে হয়েছিল দীর্ঘাকৃতি ঝাউবন, গুঁড়ির কটিদেশ থেকে ফুলে উঠে শাখা প্রশাখার রাশি শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে হতে এমনই নিখুঁতভাবে চূড়ার বিন্দুতে গিয়ে মিলেছে।

হরীতকীর বন আর খয়ের গাছের ঝোপ এড়িয়ে ঐ শালবনের ফাঁকে ফাঁকে উঁচুনিচু অসমতল পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে যার সঙ্গে চোখোচোখি হল, কে জানতো সেই মেয়েই মুন্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণি।

চোখে চোখ পড়তেই ভীতত্রস্ত ভাব ফুটে উঠলো ওর মুখে। দ্বিতীয়-বার অনুসন্ধানের দৃষ্টি ফেললো ও আমার মুখের ওপর, বুঝে নিলো আগন্তুক ফরেস্ট গার্ড নয়, কেড়ে নেবে না পাতার বোঝাটা, চড়চাপড় লাগাবে না, অরণ্য আইন ভাঙার জন্যে চাইবে না কোন আরণ্যক ঘুষ। মুহূর্ত কয়েক মাত্র। তারপরই পাহাড়ী ঝর্ণার স্রোতে হাত ডুবিয়ে এক আঁজলা জল খেয়ে নিলো ও, পাতার বোঝাটা তুলে নিলো মাথায়। আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তর তর করে নেমে গেল দ্রুত পায়ে।

ও চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কপালকুন্ডলার কথা মনে পড়লো। মনে হল, মুন্ডা ধাওড়ায় এমন মেয়েতো দেখিনি কখনো। আরণ্যক সৌন্দর্যের একটা বিশেষ রূপ আছে জানতাম, কিন্তু তা যে এমন নিখুঁত যৌবন নিয়ে দেখা দিতে পারে, ধারণা ছিল না। কিংবা কে জানে হয়তো পরিবেশ ওকে অত সুন্দর করে তুলেছিল।

কোলিয়ারির চাকরিতে সেটাই আমার প্রথম দিন। তখনও খাদ চিনিনি, টিপলার কাকে বলে জানতাম না, জলে ডোবানো এক নম্বর খাদটা দেখে ভেবেছিলাম কোন প্রাকৃতিক হ্রদ।

ঊর্ধকর্মী আলাপ করিয়ে দিতেই বললাম, কাজ বুঝিয়ে দিন মিশিরজী।

মিশিরজী বললেন, কাজ পরে হবে, পাঁচ নম্বরটা দেখে আসবেন

চলুন। আর প্রভান্স খাতা এগিয়ে দিয়ে বললে, তারও আগে সইটা করে যান, অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেলে বৌ তবু কিছু টাকা পাবে।

বললাম, ও বস্তুটি এখনো সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি ভাই।

মিশিরজী হাসলেন, সংগ্রহ হলেই বা লাভ কি হত। এখানে ম্যানেজার থেকে মুনশী সব ব্যাচেলার, বৌ ছেলে ফেলে এসেছে দেশে।

প্রভান্স কিছু একটা ইংগিত করলে, হ্যাঁ, সব ব্যাচেলার, সাণ্ডা সব।

—সাণ্ডা আবার কি দ্রব্য? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম।

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, বোঝালেন মিশিরজী। 'সাণ্ড' শব্দটার অর্থ 'পুরুষ', তা থেকে 'সাণ্ডা পাল্লা'। সরকারী আইন হয়ে গেছে রাতের শিফ্‌টে মেয়ে রেজাদের কাজ করানো যাবে না। তাই যেসব কুলিদের মেয়ে 'জুড়ি' আছে তারা কাজ করে সকাল কিম্বা বিকেলের শিফ্‌টে। রাত পাল্লায় কাজ করতে হয় না-জুড়ি মজুরদের। অর্থাৎ সাণ্ডদের।

শুনছিলাম মিশিরজীর কথাগুলো, আর ধীরে ধীরে হলেজের ট্রলি লাইন ধরে মন্থর পায়ে খাদে নামছিলাম।

আঁকাবাঁকা বিরাট একটা ব্যর্থ দীঘি। যতদূর চোখ যায় শুধু শাল শালাই, আমলকী আর মহুয়ার বন। তারও ওপারে পুবে পশ্চিমে একটি সুদীর্ঘ পাহাড়ের তরঙ্গ। আর এই শান্ত নিঃশব্দ অরণ্যের মাঝে বেনিয়া সিণ্ডিকেটের লুব্ধ কণ্ঠের চিৎকার ফুটে উঠছে হাজারো শাবল আর গাঁইতির কোলাহলে।

ধাপে ধাপে পৃথিবী যেন নেমে এসেছে নরকের অন্ধকারে। মাটির স্তর নেমে এসেছে অনেকখানি, তারপর একটা সিঁড়ির ধাপের মত পাথর। তারপর কয়লা বলে ভুল হবার মত কালো পাথর। নরকের সিঁড়ি শেষ হয়েছে কালো কয়লার অন্ধকারে। কোথাও মাটি, কোথাও বা পাথরের প্লটে কাজ চলছে। মালকাটারি রেজা-কুলিদের কলগুঞ্জন ভেসে আসছে খাদের গভীর থেকে। মাথা তুলে আকাশের দিকেই যেন তাকাতে হ'ল। লিলিপুটের মত অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়ে পুরুষ। কুলিরা গাঁইতির পর গাঁইতি ফেলছে, ছন্দে বাঁধা ধীর পায়ে চলেছে সারি বাঁধা রেজাদের দল। খাড়াই পথ বেয়ে পিঁপড়ের সারির মত চলেছে তারা, মাথায় পাথর বোঝাই ঝুড়ি, পুরুষদের বাঁকের দুপাশে দড়ির ঝোড়া। খাদের একপাশে মাটি পাথর ফেলে ফেলে নতুন একটা পাহাড় গড়ে তুলছে ওরা।

ভাবলাম, এই পাতাল-গভীরতায় যদি থাকে অরণ্যবাসী পুরুষের শক্তির স্বাক্ষর, তাহলে নতুন গড়া পাহাড়টা সমর্থশরীর মেয়েদের স্বেদ-সাক্ষী। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ সরে যেতে বললেন মিশিরজী।

দু জোড়া ট্রলি-লাইন নেমে গেছে খাদের গভীরে। ওপরের হলেজ থেকে একটা মোটা তার নেমে এসেছে বাঁদিকের লাইনের মাঝখান দিয়ে, খাদ থেকে ফিরে গেছে তারটা ডান দিকের ট্রলি-লাইনের মাঝ বরাবর। রোপওয়ের টানে একটার পর একটা কয়লা-বোঝাই বাকেট উঠে আসছে, খালি বাকেট নেমে চলেছে সারি বেঁধে।

মিশিরজী বললেন, সরে চলুন, ক্লিপ খুলে যায় তো হুড়মুড় করে এসে পড়বে ওগুলো, খুঁজে পাওয়া যাবে না আর আপনাকে।

সরে যেতে গিয়ে পা পিছলে গেল বালিতে, প্রভান্সকে ধরে সামলে নিলাম।

প্রভান্স হেসে বললে, আর ওদের দেখুন, কার্নিসে দাঁড়িয়ে পাথর কাটছে। এতটুকু বে-টাল হলেই.........

—সান্ডা পাল্লার কুলিদের কথাটা ভাবুন একবার। সারা বছর রাতের পর রাত...একে এখানকর বরফ-জমা শীত, তার ওপর অন্ধকারে এমন বিপজ্জনক কাজ!

বললাম, অন্যায়। আইন মেয়ে রেজাদের যতটুকু বাঁচিয়েছে না-জুড়ি কুলিদের মেরেছে তার চেয়ে বেশী।

প্রভান্স বললে, খাদে এখন আর রাত পাল্লার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলায় এখনো......

—রূপমণির মতো তেজী মেয়েই ফণা গুটিয়ে নিলো। আফসোস করলেন মিশিরজী।

বিস্মিত হয়ে বললাম, রূপমণি কে?

—পাঁচ নম্বর খাদে যে নেমেছে একবার, রূপমণি কে তা তাকে চিনিয়ে দিতে হয় না। গায়ের রঙ দেখেই মালুম হবে, আর চোখ! লোকে বলে এক আর্মেনিয়ান ঠিকাদার ওর বাপ, আর মতান্তরে এ কোলিয়ারির প্রথম ম্যানেজার ম্যাককিং সাহেবের ছেলে জোনাথন। বলে হাসলো প্রভান্স।

চিনিয়ে দিতে হয় না বলেই এপাশে ওপাশে তাকিয়ে খুঁজছিলাম রূপমণিকে। নতুন লোকটিকে বিস্মিত চোখে পরীক্ষা করে নিচ্ছিল ওরা, কেউ মাথার ঝুড়ি কাঁধের বাঁক, কেউ বা শাবল গাঁইতি ফেলে রেখে ভাবছিলো নতুন বাবুটি কে বটেক।

মাঝে মাঝে থামছিলেন মিশিরজী, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।—নতুন হাজ্‌রিবাবু তোদের। বড় কড়া লোক, দেরি হলেই আধা-হাজ্‌রি!

—আও, দিনসকাল খাটবে আউর আধা-হাজ্‌রি করবে! ফোঁস করে উঠলো একটি মেয়েলি কণ্ঠ।

বহুক্ষণ থেকেই চোখে পড়ছিল ও! রীতিবিরুদ্ধ একটি খাড়াই পথ বেয়ে ঝুড়ি মাথায় ওপরে উঠছিল আর নেমে আসছিল ও অনেক উঁচু থেকে। এরই ফাঁকে কখন অন্যমনস্ক হয়েছি আর ওর লিলিপুট চেহারা কাছে পৌঁছে গেছে, স্বাভাবিক রূপ নিয়েছে।

পাথরের গা থেকে জল পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে, আর একটা জায়গায় ছোট একটি গর্ত কেটে জল ধরে রেখেছে ওরা। রেজা কুলিরা মাঝে মাঝে তৃষ্ণা দূর করে আসছে সেই জলে। কালি-ঝুলি মাখা এই মেয়েটিকেও একটু আগে এক আঁজলা জল খেয়ে আসতে দেখেছি। ওর হাতের সেই ভঙ্গিমাটুকু ভাল লেগেছিল, মনে হয়েছিল, এমন ভাল লাগার ছবি হয়তো বা আগেও দেখেছি।

কিন্তু চিনতে পারি নি প্রথমটা। আঁচলে মুখ মুছে নিলো ও, তারপর

ঘাড়ের পিছনে দু' হাত রেখে কনুই দুটো পাখনার মত নাড়তে নাড়তে বললে, জঙ্গলে কানে গেলেন তুই?

বললাম, তুই কেন গিয়েছিলি। পাতা কেটে এনেছিস, বলে দোব গার্ডকে।

খিলখিল করে হেসে উঠলো ও, গলায় হারের মত দোলানো টোকেন-চেনটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, খাদানে সব আগে চিনা হয়েছিস হামরা, টিকিট ভুলে আলি হাজ্‌রি কাটবিন না বাবু।

মিশিরজী হেসে উঠলেন হো হো করে। বললেন, বাংলা শিখে নিয়েছে রূপমণি, দেখেছেন?

—তুই রূপমণি? অজ্ঞাতেই মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কয়লা কাটছিল একটা কুলি, এক চোখ ফিরে তাকিয়ে সে হাসলে।—রূপমণি নয়, খাদানের মণি। ধাওড়ার সেরা কুড়ী।

—আধাটা পরী, আধা লুবুড়ি। বললে বছর বারো বয়সের একটা বাচ্চা মেয়ে, মাথার খালি ঝুড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে।

অর্থাৎ অর্ধেক পরী, আর অর্ধেক ডাইনী।

বলেই ছুটে পালালো মেয়েটা, রূপমণি তাড়া করে গেল তাকে।

ফিরে আসার পথে মিশিরজী বললেন, রূপমণিকে আপনি ভুলতে পারবেন না কোনদিন। খাদের রানী ও।

রূপমণি তো দূরের কথা, তার টোকেন নম্বর যে দু'শো সাঁইত্রিশ তাও ভুল হ'ত না।

প্রতিদিনই তো আর দেখা হ'ত না ওর সঙ্গে, তবু এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের জাল-জানালার ওপাশে শুধু হাতখানা দেখেই চিনতে পারতাম।

—সর্দারের নাম?

—গোপী সিং।

—তোর নাম?

—রূপমণি।

—চাকতির নম্বর?

—দু'শো সাঁইত্রিশ।

এ রীতি আর সকলের ক্ষেত্রেই ঘটতো, এমন সওয়াল-জবাবের হাজ্‌রি রূপমণিকে শুধু প্রথম দিনই করতে হয়েছিল।

সাত দিন অন্তর কাজের শিফ্‌ট বদলে যেত ওর। আমারও। তাই মাসে সাত দিন, বড়ো জোর পনেরো দিন দেখা হ'ত ওর সঙ্গে।

খাদের মুখে ছোট্ট একখানা গুম্‌টি ঘর, অ্যাটেনডেন্স ক্লার্কের আপিস। এক কোণে একটা জলের কুঁজো, জাল-জানালার সামনে তে-পায়া একটা ভাঙা টেবিলে একরাশ বড়ো বড়ো হাজ্‌রি খাতা, আর জেলেকনাইট-জেলেটিনের একটা প্যাকিং বাক্স হাজ্‌রেবাবুর কেদারা কুর্সির কাজ করতো।

কুলিকামিনরা হাসাহাসি করে বলতো, বাস্‌কাটো হাটায় দে বাবু, উটা মেজাজ গরম করে দেয় তোর।

দুপুর বারোটায় আর সন্ধ্যে ছ'টায় যখন 'আওয়াজ' হয়, পাথরের গায়ে বোরিং করে ডিনামাইট দিয়ে প্লটের পর প্লট পাথর ফাটানো হয় তখন এই কাঠের বাক্স থেকে সাদা সাদা পাউডার ছড়িয়ে দিতে দেখেছে ওরা। যার ছোঁয়া লেগে পাথরই গরম হয়ে ফেটে গঁুড়ো হয়ে যায়, তার বাক্সে বসলে বাবুর মেজাজ গরম হয়ে উঠবে এ আর বেশী কথা কি!

রূপমণি কিন্তু ওসবের পরোয়া করতো না। সামনে এসে দাঁড়াতো, চোখাচোখি হলেই এক মুখ হেসে মুখে আঁচল চাপা দিতো। কিছুই জিজ্ঞেস করতাম না। গোপী সিং সর্দারের পাতাটা খুলে হাজ্‌রি করে নিতাম ওর। কিন্তু পিছনে ভিড় জমে গেলেও সরতে চাইতো না ও, আজে বাজে কথার পর কথা বলে যেতো।

খাদে নামতাম যেদিন কোন বিশেষ কাজে, সেদিনও মাথার ঝুড়ি ফেলে রেখে কাছে এসে দাঁড়াতো ও। দেখাতো হাটে কি রঙিন কাচের জলচুড়ি কিনেছে, কিংবা কানে গড়িয়েছে কোন রুপোর ঝিকাচিল্পি।

—কেমন হয়েছে বল্‌ বাবু, দাম বেশী লিয়েছে?

কোনদিন হয়তো বলতাম, বাঃ! বেশ মানিয়েছে, খোঁপায় একটা ফিতে বাঁধ এবার।

—আও! ফোঁস করে উঠতো রূপমণি। বলতো, মাথায় ফি'তান বাঁধে ঐ কিস্তান মেয়েরা। মড়িয়াম, সেবাস্তিনা, মেঢ়ী—ওরা ফি'তান বান্ধে।

ওর গলায় সাতনরী পুঁতির হারটা দেখিয়ে বলতাম, তবে এটাকে বিদেয় দিয়ে একটা রুপোর হাঁসুলি বানা।

—উহুঁ। ও বাপ্‌লার পর আমার ঠিগিয়া আদমিটা দেবেক।

—বিয়ে কবে তোর? ঠিগিয়াটাই বা কে?

—পরিয়াগকে দেখিস নাই আপুনি? সান্ডা পাল্লার মালকাটারী বটেক।

শনিচারীর হাটেও মাঝে মাঝে দেখা হ'ত ওর সঙ্গে। কখনো এটা-ওটা কিনতে আসতো, কখনো তরিতরকারি, সিমসিমারি, অর্থাৎ মুর্গী আর ডিম বেচতে আসতো। দুটো ডিম হাতে দিয়ে বলতো, লিয়ে যা বাবু, দাম দিতে হবেক নাই। কোনদিন বা বলতো, তিন সের বিলাইতি আছে বেচে দে বাবু, বিলাসপুরীরা দেখলে লুঠ করে লেবেক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেচে দিতাম টমাটোগুলো, পয়সা আদায় করে দিতাম ঠিক ঠিক।

এমনিভাবে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল রূপমণি। বুঝতাম, আর পাঁচ-জনের চোখে লাগছে, আড়ালে কানাঘুষো করছে অনেকে। ভাবতাম, এবার যদি এসে গায়ে-পড়া ভাব দেখায় কিংবা অমন ভঙ্গিমায় শরীর দুলিয়ে কথা বলে, কড়া করে ধমক দেবো। কিন্তু কাছে এলে আপনা থেকেই কেমন যেন মনটা নরম হয়ে যেতো।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, অনুরোধ থেকে দাবিতে এসে পেঁাচেছে। কিন্তু দাবিটাও উপেক্ষা করতে পারলাম না।

বললে, দুটো টাকা দে বাবু।

—কেন? আজ তো শনিবার, হপ্তার মজুরী পেয়েছিস তো আজ? জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করার আগে পকেটে হাত ঢুকলো।

ঠোঁট বাঁকালে রূপমণি।

—মজুরী? ছ' টাকা পেলেন আমি, সাত টাকা পাঞ্জাবীর সুদ লাগবেক।

চুপ করে থাকতে দেখে রূপমণি বললে, দে বাবু দে, দশ পয়সা সুদ দোব তোকে হপ্তায়।

—পাঞ্জাবীরা কত নেয়? জিজ্ঞেস করলাম।

—হপ্তায় টাকায় দু' আনা লেবে। তিন টাকা লিয়েছিলি পরবের সময়, চল্লিশ টাকা দিয়া হইছে। সুদ বাকী পড়ে সাত টাকা সুদ হইছে।

—খেতে পাস কি তাহলে?

রূপমণির গলা ভার হয়ে এলো, চোখ ছল ছল করে উঠলো। —কি করি বল, টাকা না দিলে পাঞ্জাবীরা বেইজ্জৎ করে। পঞ্চায়েৎকে দুটা মুর্গী আর এক হাঁড়ি মাণ্ডি দিয়ে পাপ ধুয়ে লিয়েছি, আর পাপ করবোন না বাবু।

—না খেয়ে সুদ গুণবি শুধু?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে রূপমণি। —পাঞ্জাবীরা রাজা লোক, টাকা করজ্ করেছি, ধাওড়ার লোক আমাকেই দুষি বলবেক।

হয়তো চেষ্টা করলে দুটো টাকাই দিতে পারতাম, তবু কেন জানি না, একটা টাকা দিয়েই বিদেয় করলাম।

ঠিক পরের সপ্তাহে দশটা পয়সা এনে দিলো রূপমণি।

বললাম, সুদ দিতে হবে না, যখন পারবি ফেরত দিস।

ভাবলাম, হাজ্‌রির কুলি অনুপস্থিত থাকলে বে-হাজ্‌রি কুলিকে সেই টোকেনে কাজ করতে দেয়ার জন্যে ঠিকাদারদের কাছ থেকে তো রীতিমত ঘুষ খাচ্ছি, একটু দয়া দেখালেই বা।

রূপমণি হেসে বললে, যা দিচ্ছি লিয়ে লে তুই, টাকা আর ফেরত হবে নাই।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

—চাকতি নম্বর কাড়ে লিয়েছে সর্দার।

তারপর একে একে ব্যাপারটা বর্ণনা করে গেল রূপমণি। দুপুর বারোটার সময় দুটো ঝুড়ি আর একটা শাবল নিয়ে গোপী সিং তার ডেরায় পৌঁছে দিতে বলেছিল রূপমণিকে। যায়নি রূপমণি। তাই কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছে সে।

বললাম, দোষ তো তোরই, কাজ না করলে চটবে না?

রূপমণি ধমক দিয়ে উঠলো যেন। বললে, এতদিন হ'ল হালচাল বুঝলিন না তুই? এতগুলান কুলি থাকতে রেজাদের ডেরায় যেতে বলে কানে? আর সকল কুড়ীরা যাক্, আমি যাবো নাই।

সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। বললাম, ভাবিস না চাকরি থাকবে তোর। আমি ব্যবস্থা করবো।

ঠিকাদার উপাধ্যায়কে এসে বললাম, আপনার মুন্‌শী গোপী সিং রূপমণির টোকেন কেড়ে নিয়েছে, ওকে কাজে বহাল রাখতে হবে।

উপাধ্যায় হাসলেন। —ওদিকে চোখ দিলে কোলিয়ারির কাজ চলে না বাবুজী। চোর লম্পট জুয়াড়ী, তিন নিয়ে কোলিয়ারি।

তা ব'লে এমন অনাচার সহ্য করে যেতে হবে?

উপাধ্যায় বললেন, বাবুজী গোপী সিংয়ের মত মুন্শি না থাকলে ঠিকাদারী বন্ধ হয়ে যাবে আমার। আর রূপমণিকে বহাল রাখলে গোপী সিং ইস্তফা দেবে।

উপাধ্যায়ের কথা শুনে জ্বালা ধরে গেল সমস্ত শরীরে; কথা যখন দিয়েছি রূপমণিকে, ব্যবস্থা একটা করতে হবেই। কিন্তু উপায় ভাবতে গিয়ে দেখলাম মিথ্যে ভরসা দিয়েছি রূপমণিকে।

শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী সুধীনবাবু হাসলেন।--উপাধ্যায়জী আমাদের প্রেসিডেন্ট।

অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার চোখ কুঁচকে বললেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, শী'ল বি সেফ হিয়ার। আর সারাদিন খেটে যা পায় তার বেশিই পাবে। কাজ আর কি, ঘর দোর সাফ করবে মাঝে মাঝে, আর মালীর ঘরটা খালি পড়ে আছে ওখানেই থাকবে।

বেরিয়ে এসে মনে হ'ল জীবনে এমন অসহায় কখনো মনে হয়নি।

আর একটাই পথ, একটাই মাত্র উপায় আছে। কিন্তু তাও কি সম্ভব?

আর পাঁচজনের চোখ এড়িয়ে মুণ্ডা ধাওড়ায় গিয়ে হাজির হ'লাম। ডেকে তুললাম পরিয়াগকে।

বললাম, কাল সকাল থেকে ওয়াগন লাগবে রেল-সাইডিংয়ে। পুরো দমে কাজ চলবে আজ রাত্তিরে। কিন্তু কাজ বন্ধ রাখতে হবে সাণ্ডা পাল্লায়, যতক্ষণ না রূপমণি কাজে বহাল হয়।

উত্তেজিত করবার যত রকমের কৌশল জানা ছিল সব ক'টা একে একে প্রয়োগ করলাম।

বললাম, পরিয়াগ তুই চেষ্টা করলে হবে, শুধু আমি এর মধ্যে আছি জানতে দিবি না।

পরিয়াগ চুপচাপ শুনলে কথাগুলো, কোন কথা বললে না। শুধু মাথা কাৎ করে সায় দিলো, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

চলে এলাম।

রাত দশটার সময় খবর পেলাম, খাদে কি একটা গোলমাল হয়েছে, কাজ করছে না কেউ। তিরিশটা ওয়াগন ফিরে যাবে কাল সকালে, আবার কবে ওয়াগন মিলবে ঠিক নেই। এদিকে টিপলারেও আর জায়গা নেই কয়লা স্টক করবার।

ছুটোছুটি গুঞ্জন শোনা গেল কিছুক্ষণ। উপাধ্যায় আর সুধীনবাবু উত্তেজিতভাবে কি যেন বলতে বলতে ছুটে গেলেন। তারপর সব চুপচাপ।

রাত বারোটায় ভোঁ বাজলো দূরের অন্য কোলিয়ারিতে। চঞ্চল হয়ে উঠলাম। কোন খবর নেই, কোন শব্দ নেই।

কি ফল হয়েছে জানবার জন্য উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

অন্ধকার রাত। দূরের টিপলারে শুধু গোটা কয়েক আলো জ্বলছে। আর শীতরাতের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস। মাথায় উলের বাঁদুড়ে টুপি আর পায়ে মোজা এ'টে বেরিয়ে এলাম। খবর না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

হাতে টর্চ নিয়ে পিছনের পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম খাদের দিকে। টিলাটার কাছ থেকে বেবি-ক্রেচ অবধি একটা পাহাড়ী সাপ গাছের গুঁড়ির মত মাঝে মাঝে পথ আটকে পড়ে থাকে জেনেও বিচলিত হ'লাম না। ভয়ের চেয়ে আগ্রহ বেশী হ'লে হয়তো সাহস বেড়ে যায়। তাই।

কিন্তু খাদের পাড় থেকে উঁকি মেরে দেখে হতাশ হ'লাম। দিব্যি কাজ চলছে। হ্যাঁ, পরিয়াগও এক মনে গাঁইতির পর গাঁইতি চালিয়ে যাচ্ছে। এত উঁচু থেকে দেখেও পরিয়াগকে চিনতে ভুল হ'ল না।

রোপ-ওয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। খোলার ছাদে বৃষ্টি পড়ার মত ঝিরঝির ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে। মালবোঝাই বাকেটগুলো সারি বেঁধে চলেছে রোপ-ওয়েতে ঝুলতে ঝুলতে।

পরের দিন জানতে পারলাম ব্যাপারটা।

খাস ম্যানেজার ডেকে পাঠিয়ে বললেন, চাকরি তো যাবেই, তার চেয়ে রেজিগনেশন দিয়ে দিন। আর সশরীরে যদি বাঁচতে চান, সরে পড়ুন এখান থেকে।

পরিয়াগকে বললাম, এমন নেমকহারাম তুই? নামটা বলে দিলি?

আমি? বিস্ময়ে কপালে চোখ তুললো পরিয়াগ।—না বাবু, রূপমণি বলে দিয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, সাণ্ডা পাল্লায় আমাদের সামনে এসে রূপমণি বললে, ওর গুণা হয়েছে, গোপী সিং কিছু দোষ করে নাই।

বললাম, তবে? আমাকে কেন বললে ও কথা?

বিষণ্ন হাসি হাসলে পরিয়াগ।—গোপী সিং ওকে নতুন শাড়ি দিয়েছে বাবু, রূপমণি ওর ডেরাতেই থাকবে।

দুপুরের শিফ্‌টে দেখা হ'ল রূপমণির সঙ্গে। নতুন শাড়ি পরে হেলে দুলে এসে দাঁড়ালো সামনে।

বললাম, শরম নেই তোর?

লজ্জায় মাথা নিচু করলে রূপমণি। তারপর ধীরে ধীরে বললে, মুনশীর কত তাকত বাবু, ঠিকাদার মানজার সকলে ওর কথা শুনে। মুন্‌শী চটলে খাবো কি বল্‌?

রাগে ঘৃণায় চলে এলাম কোন উত্তর না দিয়ে।

মিশিরজী পিছন থেকে এসে কখন কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ভাববেন না বাবুজী। লেখাপড়া করেছেন, অন্য কোলিয়ারিতে চাকরি পেয়ে যাবেন।

বললাম, জানি। কিন্তু রূপমণির ব্যাপারটা বুঝলাম না মিশিরজী।

মিশিরজী হাসলেন।—দোষ নেই ওর, ওকে মাফ করবেন আপনি। এ না করলে পরিয়াগকে বাঁচাতে পারতো না ও। ঠিক্ হয়েছিল আঠারো নম্বর প্লটে পরিয়াগকে পাঠিয়ে দিয়ে বিনা ওয়ার্নিংয়ে ডিনামাইট ব্লাস্ট করানোর।

চুপ করে থাকতে দেখে মিশিরজী আবার বললেন, আপনার এত মাথা-ব্যাথা কেন প্রশ্ন করাতেই সাণ্ডারা হাসাহাসি করেছিলো, লজ্জায় মাথা নুয়ে গিয়েছিল পরিয়াগের। তাই পরিয়াগকে লজ্জা থেকে রেহাই দেবার জন্যেই আপনার নাম বলে দিয়েছে রূপমণি।

শুধু প্রভান্স বললে, কে জানে, হয়তো আপনারই দুর্নাম বাঁচাবার জন্যে।

বি বি ক র জ

হঠাৎ যদি আপনার কানের পাশে কেউ সে নাম ধরে ডাক দেয়, যদি কোনদিন তাকে খুঁজে পান, কোন দূরগামী ট্রেনের রাতের কামরায়, কিংবা কোন জনারণ্য শহরের অন্ধ গলিতে, আশ্রয়ের সন্ধানে যদি নিশীথপ্রহরের কড়া নাড়ে সে, অথবা ধরুন, দ্বিপ্রহরের ট্রেনে যেতে যেতে কোন ছোট্ট ইস্টিশানের ধারে প্লাটফর্মের বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কোন মধুম্লান মুখ দেখে হয়তো বা আজকের এই বর্ণনার সঙ্গে মিল দেখতে পেলেনঃ এইটুকু আশা নিয়েই বলছি।

আপনাদের কাছে হয়তো অসম্ভবই মনে হবে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, তাকে চোখে দেখার আগে থেকেই মধু-গুনগুন গুজবের ঢেউ উঠেছিল বাঁশিয়ারার বাতাসে।

মারাং গাড়ার পুল পার হয়ে হরীতকী আর বহরার ঝোপঝাপ। তারই মাঝ দিয়ে সরু সিঁথির মত সাদা মাটির রাস্তা। দু'পাশে আমাদের কোয়ার্টারের সারিকে কনুইয়ের ঘা দিয়ে দিয়ে গিয়ে পেঁীছেছে সাহেবী এলাকায়।

খাড়িয়া আর ভূম্পি, মুণ্ডা আর মাঝিদের ধাওড়াগুলো অনেক দূরে, খাদের ওপাশে। বিলাসপুরীদের ডেরা আরো দু'দশ কদম তফাৎ। তাদের সঙ্গে দেখা হ'ত শুধু হাটে আর হাজরির পাল্লায়, যেমন আমাদের সঙ্গে দেখা হ'ত মোটা মাইনের বাংলোর বাসিন্দেদের। টিলার উঁচু আসনের উপেক্ষিত দিকটায় ছিল আমাদের কোয়ার্টার, আর কোলিয়ারীর আপিস আদালত ডাকঘরকে ঘিরে সীজন্‌ফ্লাওয়ার আর পাতাবাহারে সাজানো বাংলোয় থাকতেন ম্যানেজার থেকে জে-পি-ও অবধি ছোট বড়ো মাঝারি সাহেবরা। ফাল্গুনের শুধু-ফুল ন্যাড়া পলাশের মত ছুটির সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে কেরানীকুলের পাতা ঝরিয়ে কৌলীন্য বজায় রাখতো বাংলোবাহার উঁচু দুনিয়া।

আর এই দুনিয়ারই উত্তরের ঢালু গায়ে জলে ডোবানো এক নম্বর খাদের ধার ঘেঁষে ইঁটের গাঁথনি শুরু হ'ল। গুজবের ওপর গুজব গাঁথা হ'ল।

মারাঠী ম্যানেজারের ফরাসী মেম থাকতেন কোলকাতায়। টিলার ওপর-জগতে নারীত্বের প্রতিনিধি ছিলো শুধু বড়ো মুন্‌শির নেপালী আয়া, ঠিকাদার গোপী সিংয়ের অসূর্যম্পশ্যা গৃহিণী, আর আর্মেনিয়ান জোশেফ সাহেবের পঙ্গু মেয়ে। ঘর ছিল আমাদের। ছিল না ঘরণী। অরণ্যজগতের বিভীষিকা আর কালো কয়লার পাতাল রাজ্যের মাঝখানে আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীতে তফাৎ ছিল না বিবাহিত আর ব্যাচেলারে। তাই গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠলো সবাই।

জানলাম, হ্রদ বলে ভুল হবার মত জলে ডোবানো এক নম্বর খাদের পাশে যে ইঁটের গাঁথনি শেষ হ'ল তা নতুন কোন ডিনামাইটের ডিপো নয়, জেনরেটরের ঘর নয়, এজেণ্ট সাহেবের ডাকবাংলো নয়।

বেবি-ক্রেচ। আর এই বেবি-ক্রেচের নার্স হয়েই আসছে একজন। আসছে এই ঝরাপাতার অরণ্যে। শুধু সবুজের শোভা নিয়েই নয়, লাল ফাগুনের আগুন ছড়িয়ে।

ভূম্পি আর খাড়িয়ারাও শুনলো সে কথা। আর ওঁরাওদের খিস্টানী মেয়ে মরিয়ম জিগ্যেস করলো, বিবিকংরজটা কি বটেক বাবু?

বললাম, বিবিকরজ নয় রে, বেবি-ক্রেচ। কামিনরা যখন খাদে যাবে, কোলের বাচ্চাদের রেখে যাবে এখানে।

খুশী হ'ল মরিয়ম, খুশী হ'লাম আমরা। হাজরির কাজ সেরে খাদে চক্র দিতে গিয়ে প্রায়ই দেখতাম, অসহায় চোখ-তাকানো ছেলেগুলোকে পিঠে জড়িয়ে রেজারা চলেছে ঝুড়ি মাথায়, খাড়াই পথ বেয়ে। আর বোঝার ভারে দু'পাশে চাপ দেয়া স্প্রিঙের মত কুঁচকে গেছে তাদের সমর্থ শরীর। ওভারবার্ডেনের ওপর রোদ্দুর ঝলসানো বালিতে ছেঁড়া চাটাইয়ে পড়ে পড়ে কখনও বা ছেলেগুলো কাঁদতো ক্ষিদেয়। দুটো কাঠিতে জড়ানো একটুকরো নোংরা কাপড় নৌকোর পালের মত সূর্য আড়াল করতো। কখনো হয়তো সে-আড়াল সরে যেতো বাতাসে, কিংবা তাতানো তাওয়া বালির ওপর গড়িয়ে পড়ে কেঁদে উঠতো। মুন্‌শির চোখ আর শরীরের ক্লান্তিকে ফাঁকি দিয়ে কামিন মা কান্না থামাতো, ক্ষিদে মেটাতো শিশুর।

কোলিয়ারী জগতের সেই গ্লানি মুছে নেয়ার জন্যেই যেন এসে পেঁছলো অনুপমা। খবর রটে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

সিণ্ডিকেটের বাস থেকে নামলো অনেকে, এক ঝাঁক হো মুণ্ডা বীড়হড়ের দল। মালপত্র সমেত নামলো মনিহারী দোকানের মালিক গোপীবিলাস, নামলেন মিশিরজী আর উপাধ্যায়, রামগড়ের মিটিং ফেরত। জনকয়েক হাটুরে, কাপড়ের বাণ্ডিল আর মনোহারীর ঝোড়া নিয়ে। সবশেষে নামলো যে তার বাঁদিকের বুকে যুঁই ফুটফুট ছোট্ট একটি মেয়ে। আমরা জনকয়েক মিলে ধরাধরি করে নামালাম প্যারালিসিসে অবশ-অঙ্গ অনুপমার স্বামীকে। ফুলঝুরির মত একমুখ হেসে নমস্কার জানালো অনুপমা। আর সে-ছবি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেল। হাতে নিঃসঙ্গ সাদা শাঁখা, সুন্দর হাসিহাসি মুখে দু'সারি মুক্তোর চমক, চিবুকে মিলিয়ে যাওয়া ক্ষতের দাগ, আর সিঁথিতে সিঁদুর নয়, যেন একটি রক্তপলাশের পাপড়ি।

বনঝোপের পাশ দিয়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ফিরে এলাম আমরা। আর সারা পথ মনের স্তরে স্তরে গুঞ্জন উঠলো শুধুই অনুপমাকে ঘিরে। এসেছে একজন, এসেছে এই ঝরাপাতার অরণ্যে। শুধু সবুজের শোভা নিয়েই নয়, লাল পলাশের আগুন ছড়িয়ে।

সে আগুনের আকর্ষণে প্রায়ই বেবি-ক্রেচে গিয়ে হাজির হতাম। দুপুরের সাইরেন বাজার পর খাদের মুখে হাজরি ঘরের জাল জানালায় গিয়ে বসতে দেরি হয়ে যেত রোজ।

এক নম্বর খাদের জলতরঙ্গ দেখতে দেখতে হঠাৎ থেমে পড়তাম, ফিরে আসতাম বেবি-ক্রেচে। এক মুখ হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতো অনুপমা, চেয়ার এগিয়ে দিতো। কিন্তু চুপ করে বসে দুদণ্ড কথা বলার সময় পেতো না ও।

—বসুন, দুষ্টুগুলোর দুধটা হ'ল কিনা দেখে আসি। বলেই চলে যেতো অনুপমা।

বড়ো হলঘরটায় গোটা কয়েক দোলনা, কয়েকটা ছোটখাট বেবি কট্। মাদুরে বসেও খেলা করতো কালোকুলো ছেলেগুলো।

যাবার সময় দু' একটা দোলনা দুলিয়ে দিয়ে যেত ও, ভাঙা পুতুলের ঝগড়া মেটাতো, কখনো বা অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট মরিয়মকে বলতো কারো ইজের পাল্টে দিতে, এক ডাকে সাড়া না পেলে নিজেই করতো সে-কাজ।

তারপর এক সময় লজেন্স চিবোতে চিবোতে নিজের ফুটফুটে মেয়েটিকে কোলে করে এসে দাঁড়াতো। আমার দিকেও গোটা দুই লজেন্স এগিয়ে দিয়ে বলতো, ওদের জিনিসে ভাগ বসাচ্ছি। জানলে চাকরি যাবে কিন্তু।

মিনিট কয়েক আজেবাজে গল্প করেই উঠে পড়তাম, যদিও ওর কাছ থেকে উঠতে ইচ্ছে হ'ত না। মনে হ'ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর হাসি দেখি, অনর্গল কথা শুনি ওর।

কিন্তু অনুপমা নিজেই একসময় মনে পড়িয়ে দিতো, ডিউটির দেরি হয়ে যাবে।

আর চলে আসার সময় ফিসফিস করে বলতো, একটু সময় পান তো কোয়ার্টারটা হয়ে যাবেন, ওকে দেখে যাবেন একটু, বেচারী, নড়তে চড়তে পারে না!

কোন কোনদিন তাই বেবি-ক্রেচে না গিয়ে চলে যেতাম অনুপমার স্বামীর কাছে। প্যারালিসিসে অবশ শরীরটা একটু বুঝি বা নড়েচড়ে উঠতো, চোখে মুখে দেখা দিত ম্লান হাসি।

ছুটির দিনে অনুপমাও থাকতো কাছে কাছে, তার ছোট্ট মেয়ে মুন্নাও। রান্না করতে করতে ছুটে এসে বসতো দুদণ্ড, কখনো বা আলনা গোছাতে গোছাতেই রাজ্যের খবরাখবর বলে যেতো অনুপমা। কোন্ বাচ্চাটা কি দুষ্টুমি করে, কিংবা মরিয়মটা কি বোকা। অথবা মুন্নু বড় হয়ে কি পড়বে, বিলেত যাবে কি না। এই সব আজে বাজে কথাও শুনতে ভাল লাগতো, দেখতে ভাল লাগতো অনুপমার স্বামীর চোখে খুশি-উজ্জ্বল হাসি।

শুধু ভালো লাগতো না জ্যোতির্ময়বাবুকে, কোলিয়ারীর এলাকায় যাঁর পরিচয় ছিল জে-পি-ও সাহেব। ক্রেচে কোয়ার্টারে প্রায়ই অনুপমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে আসতেন। কুলিকামিনদের সুখ-সুবিধে দেখাই ছিল তাঁর কাজ। আর সেই সূত্রে আসতেন অনুপমার কাছে। কোনদিন বা দেখতাম, বিকেল ঠাণ্ডা হতেই কাছের পাহাড়টার দিকে বেড়াতে চলেছে অনুপমা। সঙ্গে জে-পি-ও সাহেব। মুন্নুকে কখনো অনুপমা কোলে নিতো, কখনো বা জ্যোতির্ময়বাবু। মারাং গাড়ার জলে পা ডুবিয়ে কোনদিন হয়তো বসে থাকতে দেখতাম ওদের, কিংবা মানকি বাবার মাঠের ঘাস-বাগানে।

ইচ্ছে হ'লেও কাছে যেতে পারতাম না সে সময়। কারণ, সত্যি বলতে কি, জে-পি-ও সাহেবকে একটু ভয়ই করতাম আমরা।

তাই যেদিন প্রথমে দেখলাম, অনুপমা একাই চলেছে মুন্নুকে সঙ্গে নিয়ে, খুশী হলাম সেদিন।

কিন্তু মরিয়ম বললে, এর পিছনে নাকি ইতিহাস আছে। বললে জে-পি-ওটা খারাপ লোক আছে রে বাবু। জেনানার ইজ্জতে হাত বাড়ায়।

আর সেই কারণেই নাকি সাবধান করে দিয়েছে অনুপমা। বেবি-ক্রেচের কপাট বন্ধ করে দিয়েছে জে-পি-ওর মুখের ওপর।

শুনে অনুপমার ওপর যত না শ্রদ্ধা হ'ল, আশঙ্কা উঁকি দিলো তার চেয়ে বেশী। গুঞ্জন উঠলো আমাদের অফিসে, আড্ডায়। জে-পি-ও সাহেবের বিষ-নজর থেকে নিশ্চয়ই রেহাই পাবে না অনুপমা। আমরা শুধু দিন গুণলাম, কবে চাকরির বিদায় নোটিশ আসে অনুপমার নামে।

কিন্তু তার বদলে হঠাৎ একদিন দেখলাম, হাজরি ঘরের জাল-জানালায় বসে কুলিকামিনদের চাকতির নম্বর আর ঠিকাদারদের নাম জিজ্ঞেস করতে করতে হঠাৎ দেখলাম, আগের মতই পিঠে ছেলে বেঁধে কাজ করতে এসেছে রেজার দল।

ছুটির সাইরেন বাজার পর দল বেঁধে গিয়ে হাজির হ'ল ওরা ম্যানেজার সাঠে সাহেবের বাংলোয়। বললে, বিবি-করজে ছেলে রাখবে না ওরা। বিবি-করজের গিদ্‌রা-আয়া অনুপমা নাকি নিজের মেয়েকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ওদের বাচ্চাগুলো পড়ে পড়ে কাঁদে। আর নয়তো আফিমের নেশায় ঘুমোয়।

শুনে হাসলাম আমরা। দুদণ্ড রয়ে বসে গল্প করার সময় পায় না যে, সে নাকি ছেলেগুলোকে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়ায়।

ম্যানেজারকে গিয়ে বললাম সকলে।—সব মিছে কথা স্যার। আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসবেন।

ম্যানেজার মাথা নেড়ে বললেন, জে-পি-ওর আগের রিপোর্টও তাই। কিন্তু......

কিন্তু একদিন কাজ বন্ধ থাকলে টিপলার জমে যাবে। আঠারোটা ওয়াগন ফিরে যাবে। কৈফিয়ৎ দাবি করবে কোলকাতার দপ্তর, আর হয়তো ম্যানেজার সাঠে সাহেবের কনফিডেনশিয়াল ফাইলে দুটো বাঁকা মন্তব্য যোগ হবে।

তাই অনুপমাকে ডেকে ম্যানেজার হুকুম দিলেন, তোমার মেয়ের জন্য বেবি-ক্রেচ নয়। ওকে রেখে আসতে হবে কোয়ার্টারে।

হুকুম শুনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে অনুপমা। —আমার স্বামীর প্যারালিসিস, উঠতে পারে না। কে দেখবে আমার মেয়েকে? একা পড়ে পড়ে কাঁদবে যে ও, কি করবো বলুন।

কিন্তু অনুপমার সুখ-সুবিধে দেখা তো ম্যানেজারের কাজ নয়। কোলিয়ারী চালানোই তার কাজ।

সুতরাং চোখের জল মুছে নিয়েই ফিরে আসতে হ'ল অনুপমাকে। শুধু বললে, কুলিকামিনদের কে ভুল বুঝিয়েছে আমি জানি।

মাথা নিচু করে বললাম, আমরাও।

কিন্তু জানলেই তো কিছু করা যায় না। বুঝলাম, আমাদের অনুভূতিই আছে, শক্তি নেই।

অনুপমাকে বললাম, কোন ভয় নেই। মুন্নুর সব দায়িত্ব নিলাম আমরা।

খুশিতে হেসে উঠলো ও, চোখে আঁচল বুলিয়ে বললে, জানতাম।

পালা করে মুন্নুর খোঁজ নিতে যেতাম আমরা। আমি, কম্পাসবাবু, ডাকঘরের অবনী। যে যখন সময় পেতাম, ডিউটিতে যাবার আগে কিংবা দুপুরের অবসরে গিয়ে হাজির হতাম। রুগ্ন অসহায় চোখ মেলে তাকাতেন অনুপমার স্বামী। কথা বলার চেষ্টা করতেন, কিন্তু জিভের জড়তায় জড়িয়ে যেত কথাগুলো। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতো মুন্নু, হাত তুলে কোলে উঠতে চাইতো। হাসতাম, হাসাতাম, চাঁদা করে তার জন্যে লজেন্স আনাতাম রামগড় থেকে, পুতুল, পোশাক।

দুপুরের সাইরেন বাজতো। ছেড়ে আসতে হ'ত তাকে। বেবি-ক্রেচের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতাম, জানালার ধারে দুটি উৎকণ্ঠার চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে অনুপমা। চোখোচোখি হ'ত, হেসে ঘাড় নাড়তাম, মুখ ফুটে বলতাম, দেখে এলাম।

—ভালো করে কপাট বন্ধ করেছেন তো? শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করতো অনুপমা। তারপর উত্তর পেয়েই সরে যেত ও জানালা থেকে।

ভাবতাম, কাজের তাড়ায় এক মুহূর্তও বুঝি দাঁড়াতে পায় না ও।

এমনি নিত্যদিনের রীতির মাঝে হঠাৎ একদিন যতি পড়লো। অনুপমার কোয়ার্টারে পেঁছে দেখলাম কপাট খোলা। মুন্নু নেই। অনুপমার স্বামী কি যেন বলতে চাইলেন, পারলেন না। হাত তুলতে গিয়ে নামিয়ে নিলেন আবার। শুধু দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো তাঁর।

চিৎকার করে ডাকলাম, মুন্নু, মুন্নু। কেউ সাড়া দিলো না খুশির হাসি হেসে। সারা ঘর খুঁজলাম, বাইরেও। আমি, অনুপমা, কম্পাসবাবু, ডাকঘরের অবনী, আরো অনেকে।

পাওয়া গেল দিন কয়েক পরে, সাঁওতাল জেলেরা জলে ডোবানো এক নম্বর খাদে মাছ ধরতে গিয়ে তুলে আনলো মুন্নুকে।

সারা কোলিয়ারীর ভিড় ভেঙে পড়লো মুন্নুর ফেঁপে ওঠা ছোট্ট শবদেহকে ঘিরে।

চোখ তুলে অনুপমা শুধু একবার তাকালো আমার দিকে, কম্পাসবাবুর দিকে, ডাকঘরের অবনীর দিকে। সে চোখ অনুযোগ করলো, কথা দিয়েছিলেন!

আর আমরা চোখ নামালাম দুঃখে আর লজ্জায়। কথা রাখতে পারিনি।

লজ্জায় ক্ষোভে মুখ দেখাতেও ভয় পেতাম। তাই বেবি-ক্রেচের ধার দিয়ে যাবার সংক্ষিপ্ত রাস্তাটা ছেড়ে রোপওয়ের নীচে নীচে ঘুরপথে যেতাম ডিউটির সময়।

হঠাৎ একদিন ফিরে এলাম সেই পুরনো রাস্তায়। এসে দাঁড়ালাম বেবি-ক্রেচের জানালার পাশে। না, দুটি উৎকণ্ঠার চোখ এসে দাঁড়ালো না। মিষ্টি হাসির অভ্যর্থনা জানাতে এলো না কেউ। তবু কিসের নেশায় যেন অপেক্ষা করলাম।

অনুপমা নয়, জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো ওঁরাওদের খৃষ্টানী মেয়ে মরিয়ম। বললে, বিবি-করজের গিদুরা-আয়ু চলে গেছে! সকালের ডিউটিতে যখন হাজরির ঘরে বসেছিলাম, তখনই নাকি চলে গেছে অনুপমা! আর যাবার আগে আমারকথাই নাকি বলেছিল, বার বার আমারই খোঁজ করেছিল অনুপমা। বললে মরিয়ম।

চলে এলাম। দীর্ঘশ্বাস বললো, চলে গেছে, চলে গেছে অনুপমা। এই ঝরাপাতার অরণ্য থেকে সব সবুজের শোভা নিয়ে, সব ফাগুনের আগুন নিয়ে চলে গেছে সে।

আজও বেবি-ক্রেচের ধার দিয়ে যেতে যেতে অনুপমাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি উৎকণ্ঠার চোখ, একমুখ ফুলঝুরির হাসি।

আজও সারা মন অনুশোচনার দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় অনুপমাকে।

হঠাৎ যদি আপনার কানের কাছে কেউ সে-নাম ধরে ডাক দেয়, যদি কোন-দিন তাকে খুঁজে পান, কোন দূরগামী ট্রেনের রাতের কামরায়, কিংবা কোন জনারণ্য শহরের অন্ধগলিতে, যদি চিনতে পারেন তাকে! হাতে তার নিঃসঙ্গ সাদা শাঁখা, ব্যর্থবিষণ্ণ মুখে দুসারি মুক্তোর চমক, চিবুকে মিলিয়ে যাওয়া ক্ষতের দাগ, বাঁ চোখের নীচে ছোট্ট একটি কালো তিল।

যদি খুঁজে পান অনুপমাকে, বলবেন, ভুলিনি, ভুলতে পারিনি আমরা।

বলবেন, আমাদের অনুভূতিই আছে, শক্তি নেই।

বলবেন তাকে, অন্ধ কামনার আগুনে একটি ছোট্ট শিশুর প্রাণ পুড়ে ছাই হ'তে পারে, সে সত্য আমরা জেনেছি।